অপ্রবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

গ্রন্থস্বত্ব : বিহার বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, মজঃফরপুর।

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক :
অরুণকুমার হৈস
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

॥ সেই চির অপ্রবাসী ব্যক্তিত্বের
পুণ্য স্মৃতির প্রতি ॥

অবতরণিকা

বিহারবাসী বাঙালীর গর্বের, আনন্দের এবং সাহিত্য রসের অন্যতম স্রোত-উৎস বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আজ আমাদের মধ্যে নেই। যাঁরা তাঁর রসসুধা পান করেছেন এবং যাঁরা ওঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের সুযোগ লাভ করেছেন, তাঁদের জীবদ্দশা পর্যন্ত তাঁর স্মৃতি মুছবার নয়। তাঁকে নিয়ে আলোচনা তাঁর জীবদ্দশাতে তাঁর ব্যক্তিগত-সংকোচ এবং বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশত যতটা হবার কথা, ততটা হয়নি, সেই অসমাপ্ত কাজ খানিকটা পূরণ করার দায়িত্ব বিহার বিশ্ববিদ্যালয়—স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ যে হাতে নিয়েছে, সেটি বিশেষ পরিতৃপ্তির বিষয়। এই মহৎ কার্যে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় যে যৎসামান্য সহযোগ করতে পেরেছে, এটা আমাদের সৌভাগ্য।

এই প্রকাশন আকারে ক্ষুদ্র হলেও আন্তরিকতায় ছোট নয়। এই প্রচেষ্টাকে আবার সাধুবাদ জানাই এবং এই ছোট পুস্তকটিকে যাঁরা নিজেদের রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

'পুস্তক বিপণি'-কে ধন্যবাদ যে তাঁরা এই প্রচেষ্টাকে রসগ্রাহী পাঠকের সামনে উপস্থিত করা সম্ভব করছেন।

শ্রীশৈলেশকুমার বসু
কার্যনির্বাহী উপাচার্য, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়
মজঃফরপুর।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস্ ডিকেন্সের যে জনপ্রিয়তা তা আজ পর্যন্ত কেউ পাননি। ওঁকে যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রিত করা হল তখন বহু অখ্যাত স্থান—যাকে বলে গ্রামগঞ্জ—থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে দেখতে তাঁর লেখার আবৃত্তি শুনতে এসেছিল। ওঁর নাম হয়ে গিয়েছিল "ইন্ইমিটেবল্"। অথচ ওঁর আমলেই ইংরেজী সাহিত্যের আর এক দিক্‌পাল—থ্যাকারে, প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আজ তাঁর নাম পর্যন্ত জানেন না অনেকে—বর্তমান কালের ইংরেজী লেখকও জানেন কিনা সন্দেহ। অথচ একেবারে হাল আমলের ইংরেজী বইতেও (থ্রিলারেও) প্রায় ডিকেন্সের বা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের উল্লেখ উপমা পাই।

কারণ? থ্যাকারে পৃথিবীতে মন্দ চরিত্রই বেশি দেখেছেন। তাঁর সর্ব-বিখ্যাত বই ভ্যানিটী ফেয়ার—যার মোটো হচ্ছে "ভ্যানিটাস ভ্যানিটাটাম" অর্থাৎ 'ভ্যানিটী ফর ভ্যানিটী, অল ইজ ভ্যানিটী'। (আমি বহু দিনের স্মৃতি থেকে বলছি—ভুলত্রুটি পাঠক নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন)।

আর ডিকেন্স? তিনি ঘৃণ্যতম চরিত্রের মধ্যেও একটু মার্জনার স্থান রেখেছিলেন—যেজন্য অলিভার টুইস্ট-এর বিলসাইক্স্ যখন পালাতে গিয়ে নিজের ফাঁসেই মারা গেল কিম্বা ওল্ড্ কিউরিসিটী শপ-এর কুইলিপের শোচনীয় মৃত্যু হল—তখনও ঐরকম মানুষগুলোর জন্যে যেন একটু করুণার উদ্রেক হয় পাঠকের মনে।

অর্থাৎ ডিকেন্স মানুষকে ভালবাসতেন—দোষে-গুণে মানুষ, এইভাবেই তাদের দেখতেন। সেইভাবেই দেখিয়েছেন।

বিভূতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাফল্যের মূলে এই, মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা।

বিভূতিবাবুকে এককালে হাসির গল্পের লেখক বলেই পাঠক সাধারণ মনে

করতেন—সেজন্যে কিছু ক্ষতিও হয়েছে তাঁর। কিন্তু হাসির গল্পলেখক বলতে যাঁদের মনে করি আমরা—যেমন ত্রৈলোক্য, পরশুরাম—এঁদের হাসির পিছনে হুল বা খোঁচা থাকে। বিভূতিবাবু মানুষকে নিয়ে নির্মল তামাশা করেছেন, চরিত্রগুলি ওঁর প্রিয়, ওঁর আপনজন। সবচেয়ে যে বইতে হাসির হুল্লোড় উঠেছিল—বরযাত্রী—লেখক যেন সেই দলেরই একজন—ওঁদের সঙ্গে এক তামাশায় মেতেছেন। সেই কারণে সেই যে তোৎলা ছেলেটি গণ্‌শা বা গণেশ—তার জন্যেও পুঁটুরাণীর ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

এইরকম মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন বলেই ওঁর অসংখ্য গল্প—যেমন সেই মাতাল বেয়াই দুটি, কি যে ভদ্রলোক খবরের কাগজ দেখে গরম ঠাণ্ডা ঠিক করেন, ভুল ছাপার দরুণ গরমে কম্বল মুড়ি দেন, কিম্বা যে গার্ডটি নিজে মদ খায় (বি. এন. ডবলিউ. আর) আর পাঁচজনকে খাওয়ায় বলে ট্রেন কেবলই লেট হতে থাকে—এরাও ওঁর প্রিয় মানুষ, তার পরে চরিত্র।

ভাবুন তো ওঁর 'কাঞ্চনমূল্যে'র সেই স্বরূপ মণ্ডল চরিত্রটির কথা। একে নিয়ে আরও লেখার জন্যে রাশি রাশি চিঠি এসেছিল। এ কি শুধু হাসির গল্প? এ শুধুই মধুর—মধুর মতোনই মধুর।

এই ধরণের হাসির গল্পের পূর্বাচার্য হচ্ছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায় (দুজনেই মুখুজ্জে !!)। বলবান জামাতা, আত্মতত্ত্ব—সেই মাষ্টারমশাই, 'আই ডোণ্ট নো'র বাংলা মানে করতে গিয়ে যিনি ঠিক বলেও হেরে গেলেন। কী মিষ্টি কী মিষ্টি!

বিভূতিভূষণের রচনার ব্যতিক্রম হচ্ছে (লেখকের খুব প্রিয়) "নীলাঙ্গুরীয়"—এককালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু ওঁর অদ্বিতীয় (বোধকরি বিশ্বসাহিত্যেই অদ্বিতীয়) "স্বর্গাদপি গরীয়সী" আজও অনেকের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে—সে তুলনায় অনেক পিছিয়ে গেছে। তার কারণ উনি নীলাঙ্গুরীয়তে স্বধর্ম লঙ্ঘন করেছেন।

অবশ্যই এখানে উনি বড় একটা এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন, একই সঙ্গে প্রেম ও ঘৃণার সমন্বয়। কিন্তু সেটার পূর্ণ ছবি কি পাই? পাঠক চান দুটো মিশিয়ে প্রেমে পরিণত হল, এখানে তা হয়নি।

বিভূতিভূষণ দেখেছেন অনেক। মানে শুধু "চলিতে চলিতে দেখে যারা / তারা চলিতে চলিতে ভুলে"—সেরকম দেখা নয়। তিনি চারিদিকের মানুষ ঘটনা মায় প্রকৃতিও—লক্ষ্য করেছেন, মনের ডায়েরীতে তা লিখে রেখেছেন। আর তাঁর এই গভীর থেকে গভীরে যাওয়ার ফলশ্রুতি হল সব মানুষের মধ্যেই ভালমন্দ দুইই আছে এবং সেটা মহাকবির ভাষায় "মন্দ যদি তিন চল্লিশ / ভাল তবে সাতান্ন" আর তাই সকলের জন্যেই তাঁর মনেও প্রীতি, সহানুভূতি, ভালোবাসা।

এই দেখা বা লক্ষ্য করার ফলে ওঁর কিছু ক্ষতিও হয়েছে, আমাদের পক্ষে কিছু লাভও হয়েছে।

ওঁর সাহিত্য জীবনের শেষার্ধে উনি ওপরের দেখা শেষ করে মনের মধ্যেটা দেখতে চেয়েছেন, মনের গভীরে ডুবতে চেয়েছেন। এই যে গভীরে ঢোকা—মানুষের চিন্তা ও কামনা কোন পথে চলে তার পরিমাপ করা—এটা, আমার যতদূর মনে হচ্ছে 'নয়ান বৌ' থেকে শুরু হয়েছে। এবং ক্রমেই এই গভীরে সাঁতার দেওয়া তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

অনন্যসাধারণ উপন্যাস গল্প—তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু আমরা সাধারণ পাঠকরা অত ভিতরে ঢুকে পূর্ণ রসাস্বাদন করতে পারি কি?

বিভূতিবাবুর এক জন্মদিনে—হাওড়ার এক অভিনন্দন সভায় প্রাজ্ঞ সাহিত্য-রসিক অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওঁকে সতর্ক করেছিলেন।

একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি। এককালে প্রবাদতুল্য সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "দরিয়া" বলে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন (ওঁর 'সাধের বৌ' 'দরিয়া' এই দুটি উপন্যাসই পেয়েছি ও পড়েছি—আর কিছু পাইনি), চিন্তাশীল উপন্যাস, গভীর উপলব্ধির ফল—কিন্তু পাঠকরা তার মর্ম বোঝেননি। এই অবস্থা বিখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের তিনটি উপন্যাস 'গুহামুখে' 'গুহামধ্যে' 'নারায়ণী'—তারমধ্যে প্রথম দুটি আধ্যাত্মিক রসে জারিত—কিন্তু এতই প্রচ্ছন্ন, তার রস এত গভীরে যে শতকরা একজন পাঠকও তার উপভোগ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

অবশ্য ভগবানকে ধন্যবাদ এবং বিভূতিবাবুর সৌভাগ্য তিনি অত ভিতরে যেতে চাননি। মানুষকে ভালবাসতেন, তাদেরই মনের গভীরে বিচরণ করতে চেয়েছেন। উৎকৃষ্ট রচনা সব, সাহিত্যরসে পূর্ণ, কাহিনীও পূর্ণাঙ্গ—তবু সাধারণ পাঠক প্রতিপদে চিন্তা করে পড়তে চান না—বা, মাপ করবেন—পড়তে পারেন না।

তাই আজও তাঁর রাণু গল্পমালায় গল্পসমগ্র, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' প্রভৃতি বইগুলি—'বরযাত্রী' 'বাসর' প্রভৃতি মধুর রসাত্মক বই সমধিক জনপ্রিয়। রাণু সিরীজের গল্পের মধ্যে সর্ব রসের গল্পই আছে। তার মধ্যে হাসি বেদনার সমন্বয়গুলির কথাই এখনও লোকের মুখে মুখে ঘোরে।

কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করার দুটি উৎকৃষ্ট বই আমরা পেয়েছি—যা লেখা যেকোন লেখকের পক্ষেই গৌরবজনক।

সে দুটি হল 'দুয়ার হতে অদূরে' 'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি'—এ অবিস্মরণীয়—রূপক চিন্তার অমৃত ফল। যা দেখেছেন তা যে কী চোখে দেখেছেন, কত উঁচুতে উঠলে বা কী গভীরে নামলে তবে তাঁর এই বইদুটির স্রষ্টা হওয়া যায়—তা বলা শক্ত, এর বুঝি তুলনাও নেই। মনের মধ্যে মাধুর্যরস চিরদিনই

প্রচুর ছিল—তার সবটা বুঝি এই শেষের দিকে উজাড় করে দিয়েছেন।

আর একটি, একেবারে শেষের দিকের বই, কতকটা ঐ ধরণেরই—'একই পথের দুই প্রান্তে' ভাল বই তবে সাধারণ পাঠক যে মন দিয়ে পড়েছেন তা মনে হয় না।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ একই যুগের দিকপাল এঁরা—এঁদের সঙ্গেই পাল্লা দিতে হয়েছে মুখুজ্জে মশাইকে, তবু তিনি নিজ বৈশিষ্ট্যে অনন্য এবং সমান ধরণের একটি আসন করে নিতে পেরেছেন এবং সে আসনে থাকবেন বলেই মনে করি।

আমার ব্যক্তিগতভাবে পরম সৌভাগ্য—'আমাদের' বলাই উচিত—আমরা ব্যক্তি বিভূতিভূষণকে দেখেছি, তাঁকে নানাভাবে পেয়েছি। বার তিনেক তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকারও কারণ ঘটেছিল। এমন নিঃশব্দ অথচ পরিপূর্ণ আতিথেয়তার তুলনা নেই। প্রতিবারই তিনি আমাকে তাঁর থাকা ও লেখার প্রায় দ্বীপের মতো ঘরটি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র থাকতেন। এছাড়াও মানুষটিকে নানা অন্তরঙ্গভাবে দেখার ও মেশার সুযোগ ঘটেছিল। তাতেও মানুষটিকে ভালভাবে লক্ষ্য করতে পেরেছি—ঐ একটা কথাই মনে হয়েছে—অতুলনীয়, অনন্য।

এক এক সময় মনে প্রশ্ন জাগে—মানুষটি বড় না লেখকটি বড়?

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও হাস্যরস

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালিকে "আত্মবিস্মৃত" জাতি বলেছিলেন, অর্থাৎ যে পূর্বগৌরব, নিজেদের জাতিগত উজ্জ্বল ইতিহাস ভুলে থাকে তাকেই হরপ্রসাদ 'আত্মবিস্মৃত' বলেছিলেন। এই কথাটি একটু ঘুরিয়ে আর একজন রসিক লেখক বলেছেন, বাঙালি "হাস্যবিস্মৃত" জাতি, অর্থাৎ এ-জাতি হাস্য পরিহাস, কৌতুক রঙ্গ হিউমার ও উইটে তত দড় নয়। কথাটা যে একেবারে অলীক তা নয়। সত্যই বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, লঘু কৌতুকরস, এমনকি ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনারও প্রাচুর্য নেই, মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রে যৎকিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ-রঙ্গ-কৌতুকের পরিচয় আছে। আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যথার্থ হাস্যরসকে সাহিত্যে ত্বরান্বিত করেছেন। অবশ্য দীনবন্ধুর নাটক প্রহসনে ঈশ্বরগুপ্তের পদ্য ও ছড়ায় হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গকবিতায়, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে ও উদ্ভট কবিতায়, অমৃতলাল বসুর প্রহসনে কৌতুক ও ব্যঙ্গের লক্ষ্য করা যাবে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ বা পাঁচুঠাকুর), পরশুরাম ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একালের বাংলা সাহিত্যে নকশায়, গল্পে ও উপন্যাসে হাস্যকৌতুকের ফুলঝুরি সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে গত শতাব্দীর টেকচাঁদ ও হুতোমের কথা মনে পড়বে। টেকচাঁদ (প্যারীচাঁদ) ও হুতোমের (কালীপ্রসন্ন সিংহ) কৌতুকরস দু'ধরনের। টেকচাঁদ প্রধানতঃ আখ্যান অবলম্বন করে রঙ্গ কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। হুতোম বিদ্রূপের চাবুক হাঁকিয়েছেন। কিন্তু যথার্থ হাস্যরস শুধু ভাঁড়ামি বা বাক্‌ছল নয়। তার সঙ্গে সহানুভূতি ও ঈষৎ বেদনাবোধ না থাকলে বিশুদ্ধ হাস্যরস জমে উঠতে পারে না। যথার্থ হাস্যরস* বিশুদ্ধ লিরিকের মতোই দুর্লভ। হাস্যরসের এই বিচিত্র ঐশ্বর্য—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ও উপন্যাসে হাসির সঙ্গে বেদনার এমন একটি অঙ্গাঙ্গী মিল ঘটেছে যে, একালে আর কারো রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

শিশু-কিশোরকে অবলম্বন করে তাঁর বিচিত্র গল্প। সঙ্গতির সঙ্গে অসঙ্গতির যৎসামান্য সংঘাত থেকে হাস্যরসের আবির্ভাব হয়। সেটি বিভূতিভূষণের অসংখ্য গল্পে পাওয়া যাবে। আমরা নিত্য কত অসঙ্গত আচরণ করি নিজেরা তার হাস্যকর দিকটি বুঝতে পারি না। হাস্যরসিক লেখক আমাদের সেই অসঙ্গতি দেখিয়ে দেন, যা সহজেই হাস্য ও কৌতুক সৃষ্টি করে। হাস্যরস আবেগের গৃহশত্রু। এইজন্য আবেগের অতিরেক অনেক সময়ে হাস্যরসের উপাদান হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণ আমাদের চারিদিকে প্রসন্ন হাসির আলো ছিটিয়ে দিয়েছেন। হাস্যরস সহজেই মানুষের অন্তরঙ্গ হতে পারে। বিভূতিভূষণের গল্পগুলি তার সার্থক দৃষ্টান্ত। তিনি বেশ কয়েকখানি বড়ো মাপের উপন্যাস লিখেছেন। যেমন 'নীলাঙ্গুরীয়' 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' ইত্যাদি। লিখেছেন ভ্রমণকাহিনী, কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন। এদিক থেকে তাঁর আত্মজীবনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিজের কথা, পরিবারের কথা, জনকজননীর কথা বলতে গিয়ে তিনি একটা স্নেহসিক্ত পারিবারিক জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যার মধ্যমণি হচ্ছেন মা। অবশ্য তিনি কখনো কখনো অন্যরসের রচনাতেও হাত দিয়েছেন। যেমন "নীলাঙ্গুরীয়"—নারীর ঘৃণা ও শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রেমের এ একটি বিচিত্র মানসিকতার দৃষ্টান্ত। চরিত্র নির্মিতিতে তাঁর দক্ষতা অসামান্য। চরিত্রগুলি তথাকথিত উগ্র বাস্তব নয়, ছায়াময় রোমান্টিক নয় অথবা আদর্শলোকের পাণ্ডুর নর-নারী নয়। হাস্যকৌতুক ও তীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণ (যথা নীলাঙ্গুরীয়-এর মীরা)—একই সঙ্গে সমান দক্ষতার সঙ্গে সৃষ্টি করা সহজ ব্যাপার নয়। বিভূতিভূষণের সেই দুর্লভ শক্তি ছিল।

একালে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের সদাপ্রসন্ন হাসি আর পাওয়া যায় না। একালের কথাসাহিত্যিকগণ জীবনযন্ত্রণায় এত পীড়িত, সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্ব চিন্তা করে এত বিষণ্ণ যে, তাঁদের মন থেকে লঘু কৌতুক মুহূর্ত উবে গেছে। হাস্যরস তাঁদের কাছে নিতান্তই লঘু ব্যাপার বলে মনে হয়। এটি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে বিষম দুর্দিন। হাস্যরস শরতের রৌদ্রের মতো লোভনীয় শিশুর কলধ্বনির মতো প্রীতিপদ। এই বিশুদ্ধ হাসি একালের বাংলা গল্প ও উপন্যাসে প্রায় বর্জিত হয়েছে। জীবনের প্রতি উদার প্রসন্নতা না থাকলে সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় না। বিভূতিভূষণ বয়োধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসতেন, শিশু, কিশোর ও স্বল্পবয়সীদের প্রতি তাঁর ছিল স্নেহ ভালোবাসা। এই ভালোবাসা শুধু মানুষ নয় জীবজন্তুর প্রতিও বর্ষিত হয়েছে। হাস্যরস পাত্রাপাত্র বিচার করে না। পোঁটু নামক ছোট ছেলেটি, স্বরূপ নামক গৃহভৃত্যটি, রাণু, গণেশের দল—এরা সব যেন আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। সুকুমার রায় উদ্ভটকে কেন্দ্র করে অসাধারণ রস সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনকেই অবলম্বন করেছেন। তাই তাঁর হাস্যকৌতুক বৃহৎ মানবধর্মেরই

অঙ্গ, দুঃখের বিষয়, একালে আমরা এই মানব বোধ থেকে দূরে সরে গেছি। তাই একালের আধুনিক লেখকগণ নানা বিষয়ে গুণপণার পরিচয় দিলেও হাস্যরসের প্রতি তাঁদের বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। একালের পাঠক-ও কি চিন্তাভারে ন্যুব্জদেহ হয়ে গেল? সন্তোষ ঘোষ, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু এঁরা অসাধারণ কুশলী কথাসাহিত্যিক। কিন্তু সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে এঁরা এত ব্যতিব্যস্ত যে জীবনের লঘু মুহূর্তের প্রতি তাঁদের ফিরে তাকাবার সময় নেই। এটি সাহিত্যের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। হাওড়ার শিবপুরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসতেন, এবং এলেই আমার এবং ডঃ নিমাইসাধন বসুর (বিশ্বভারতীর উপাচার্য) বাড়ীতে একবার না একবার আসতেনই। সেই প্রসন্ন হৃদয়বান আত্মীয়তার মৃদু উত্তাপ এখনও যেন উপলব্ধি করতে পারছি।

বিভূতিভূষণের গল্পে হাস্যরস

অজিতকুমার ঘোষ

বাংলা কথাসাহিত্যের বর্ষিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সুদীর্ঘ জীবনপথপরিক্রমা ক'রে মাত্র কিছুকাল আগে বিদায় নিয়েছেন। হাসি-কান্না মেশানো অভিজ্ঞতার বিচিত্র রসে তাঁর পাত্র সর্বদাই পূর্ণ থাকত। তাঁর হাসি ও কান্না উভয় ধারার মধ্যেই স্নিগ্ধ হৃদয়ের রম্য স্পর্শ লেগে থাকত। বলতে দ্বিধা নেই তাঁর তিরোধানে স্নিগ্ধতা ও রম্যতার অভাব আজ বড় বেশি অনুভব করা যাচ্ছে।

প্রকৃত জীবনরসিক জীবনকে দেখেন সমগ্রভাবে। বিভূতিভূষণের সেই জীবনরসিকের দৃষ্টি ছিল। তাই সব কিছু থেকে তিনি গ্রহণ করতেন, কিছুই বর্জন করতেন না। সকল মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ, কাউকে ঘৃণা করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সারাজীবন অকৃতদার ছিলেন বলেই তাঁর পরিবার ছিল এত সম্প্রসারিত, তাঁর স্নেহমমতা ছিল এমন নিঃস্বার্থ ও নির্বিশেষ। বাৎসল্য রসাত্মক গল্পগুলিতে তিনি যেন আত্মকাহিনী লিখেছেন। রাণু, ছবি ও মিটুর মত সকল শিশুর তিনি যেন মেজকা। তাঁর অন্তর থেকে অবারিত স্নেহ উৎসারিত হ'য়ে সকল শিশুকে যেন অভিসিঞ্চিত ক'রে দেয়। তাঁর দ্বারভাঙ্গার বাড়িতে দাক্ষিণ্য ও আতিথেয়তার যে উদার, উন্মুক্ত ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে তাঁর স্বভাবধর্মের একটি সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তাঁর সেই দাক্ষিণ্য ও আতিথেয়তা নিজের গৃহের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে সকল মানবসমাজের মধ্যে যেন সম্প্রসারিত হয়েছিল। আলো ও আঁধারে মানুষের হাসি কান্নার আবর্তগুলি তিনি প্রীতিপ্রসন্ন ও আগ্রহসিক্ত দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। কখনো তিনি আসক্ত ও জড়িত হ'য়ে পড়েছেন, তখন রসের ধারা করুণ হ'য়ে পড়েছে। আবার কখনো তিনি একটু নিরাসক্ত চিত্তে দূরে আহ্বান করেছেন, তখন হাস্যকৌতুকের কণাগুলি চারদিকে ঠিকরে ঠিকরে পড়েছে।

বিভূতিভূষণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিহারেই কাটিয়ে গেলেন। বিশেষ

ক'রে দ্বারভাঙ্গা-মজঃফরপুর সমাজের লোকজনই তাঁর সবচেয়ে আপন জন। বাঙালী-বিহারীর মিশ্র ভাষা ও সংস্কৃতির ধারার মধ্য দিয়েই এই অঞ্চলের সমাজবিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। বোঝাপড়া সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সত্ত্বেও প্রথা, আচার-আচরণ ও ভাষাগত কিছু কিছু বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের মধ্যে যে-সব হাস্যকর উপাদান রয়েছে বিভূতিভূষণ সেগুলি অবলম্বনে অনেকস্থানে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। আবার বাংলাদেশের শিবপুর অঞ্চলের কিছু বিশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ এবং কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের ছোটখাট ভ্রান্তি অসঙ্গতি ও আতিশয্যের মধ্যে তিনি কৌতুকের অনেক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। প্রকৃত রসিক আপাতরসহীন বস্তুর মধ্যেও রসের সন্ধান পান। বিভূতিভূষণ ছিলেন সে-ধরনের রসিক মানুষ। যা নিতান্তই তুচ্ছ ও সাধারণ তাই তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে তুচ্ছ ও রঙের অবলেপে অতি উপভোগ্য রসবস্তু হ'য়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের গল্পে ঘটনার অতি-নাটকীয়তা, অশান্ত কামনার জ্বালা, প্রবৃত্তির উন্মত্ত ক্রিয়া কিছুই নেই। অর্থাৎ যা মানুষকে সহজেই উত্তপ্ত ও উত্তেজিত করে সে-সব বস্তুর দিকে তিনি দৃষ্টি দেন নি। জীবনের বিকৃতি ও বিপর্যয়, নিষিদ্ধ জীবনের বিস্রস্ত রূপ, নরনারীর লালসামত্ত যৌনলীলা—এসব বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। আমাদের পরিচিত মাটির মধ্য দিয়ে জীবনের যে রমণীয় প্রবাহিণীটি বয়ে চলেছে আলো ও বাতাসের সঙ্গে খেলা করতে করতে, তার তীরে বসে লেখক সেই প্রবাহিণীর লীলা দেখেছেন। তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির মাতামাতি এবং বিচিত্র রঙের বুদ্বুদগুলির ভেসে ওঠা আর মিলিয়ে যাওয়ার অপরূপ লীলায় তিনি তন্ময় হ'য়ে পড়েছেন। বৃহৎ পারিবারিক জীবনের যে রস আজ আমাদের সমাজ থেকে অন্তর্হিত হ'য়ে পড়েছে তারই আস্বাদনা লাভ করি আমরা তাঁর গল্পগুলিতে। বিবাদ ও বিরোধের তিক্ত রস নয়, স্নেহপ্রেম, ভক্তিশ্রদ্ধার অতি মধুর রস। সেই পারিবারিক জীবনে মনুষ্যেতর প্রাণীও অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আছে, তারাও পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, একই স্নেহমমতার বন্ধনে আবদ্ধ। বড়দের লেখক হ'য়েও ছোটদের প্রতি বিভূতিভূষণের মত এমন সস্নেহ দৃষ্টি আর কেউ দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। শিশুদের বিচ্ছিন্ন জগৎ নয়, বড়দের সঙ্গে মিলেমিশে শিশুরা যে-জগৎ রচনা করে সেই জগতের রস ও মাধুর্য তিনি উজাড় ক'রে দিয়েছেন। নিজেকেও তিনি নিরপেক্ষ রাখতে পারেন নি। তাঁর লেখনীর ভিতর দিয়ে বাৎসল্যরস উপচে উপচে পড়েছে। বিভূতিভূষণের আর একটি জগৎ আছে, সেটি হলো বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডার জগৎ। সেখানে গল্পের ঘোড়া চলে লাগামহীন ভাবে, সেখানে সত্যমিথ্যা, উদ্ভট ও আজগুবি সব একাকার হ'য়ে যায়। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা ভুলে গিয়ে শুধু কেবল মজাটুকু ভোগ করাই সেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিভূতিভূষণের গল্পে হাস্যরসের সঞ্চার হয়েছে প্রধানত এই পারিবারিক

জীবনধারা ও আড্ডার পরিবেশ থেকে। পারিবারিক জীবনের শান্তিশৃঙ্খলা ও স্নেহপ্রীতির মধ্যেও এমন সব অসঙ্গতি, আতিশয্য, বিকৃতি ও ভুলভ্রান্তি থাকে যেগুলি হাস্যরসসন্ধানী তির্যক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, এবং তাঁর সেই নিরীক্ষণপদ্ধতি বর্ণনাভঙ্গি, টীকাটিপ্পনী, এবং চরিত্র ও ঘটনার বিশেষ বিশেষ দিক আলোকে প্রতিফলিত করার মধ্যে প্রকাশ পায়। শিশুর বয়স্ক লোকের মত আচরণ করা, আবার বয়স্ক লোকের স্বল্পবুদ্ধি শিশু হ'য়ে যাওয়ার মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে কিংবা স্নেহের লীলার মধ্যে মাঝে মাঝে যে মিথ্যা ও ছলনা মিশে থাকে তাতেও প্রকাশ পায় এক উপভোগ্য কৌতুকজনকতা। মায়ামোহের আতিশয্যের ফলে মানুষের ক্রিয়া ও আচরণ যে বিসদৃশ রূপ নেয় তাও যথেষ্ট কৌতুকের উপাদান জুগিয়ে থাকে। অন্ধ জেদ ও মূঢ় আত্মাভিমান যেমন হাস্যকর, তেমনি হাস্যকর হ'ল অলৌকিক ঘটনার প্রতি অবিচল বিশ্বাস। লেখকের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক, যুক্তিনিষ্ঠ মন বিদ্যমান ছিল। সকল অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার তিনি একটি যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি দিয়েছেন। সেই পরিণতি এসেছে অকস্মাৎ কোনো লঘু উপায়ে। সেজন্য গল্পের পরিণতি অতর্কিত আঘাতে পাঠকের চিত্তকে হাস্যে উদ্বেল করে তোলে।

বন্ধুবান্ধবদের আড্ডার পরিবেশ রচনা করা হয়েছে কয়েকটি গল্পে। আড্ডাধারী বন্ধুগণ সরস ঠাট্টা-ইয়ারকিতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে তারপর অতীতের কোনো ঘটনা কেউ বর্ণনা করেছে, সেই ঘটনার সঙ্গে সময় অথবা ঋতুপ্রকৃতির কোনো অবস্থার দিক দিয়ে বর্তমান পরিবেশের হয়তো কোনো মিল রয়েছে, হয়তো বর্তমান পরিবেশের বর্ষা, অন্ধকার রাত অথবা চৈতালী ঘূর্ণি সেই অতীত ঘটনার বর্ণনাকে প্রাসঙ্গিক ক'রে তুলেছে। অতীতের কোনো ঘটনায় হয়তো বর্ণনার গুণে ঘনীভূত রোমান্স-রস, ভৌতিক রস অথবা অলৌকিক দৈবরস বেশ জমে উঠেছে, কিন্তু বর্ণিত ঘটনার শেষ হয়েছে আকস্মিক 'অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সে', তার ফলে বর্ণিত ঘটনার সব কিছুই অবিশ্বাস্য হ'য়ে যায় এবং সেখানেই গল্পের কৌতুকময়তা। পরিহাসরসিক লেখক গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে আমাদের একটা অন্যতর জগতে তুলে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ ধপাস ক'রে পরিচিত মাটিতে ফেলে দিলেন। বিভূতিভূষণ, অর্থাৎ রাণুর মেজকা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সাহিত্যেও তেমনি বাহ্যত গাম্ভীর্যের ছদ্মরূপ ধারণ ক'রে থাকতেন, কিন্তু তাঁর মনের ভিতরে হাসির রঙীন আলোর কণাগুলি মাতামাতি ক'রে বেড়াত।

বিভূতিভূষণ নিরাসক্তভাবে জীবনের রস সম্ভোগ করেছেন। তিনি তো সারাজীবন অদ্বৈতই রইলেন, কিন্তু দ্বৈতলীলার রস তিনি পরম আগ্রহে আস্বাদ করেছেন। অবশ্য প্রেমের প্রবৃত্তিময়, দেহগত বর্ণনায় তাঁর রুচি নেই। তিনি সেই প্রেমের চিত্রই এঁকেছেন যা উষার রক্তিম আভার মত, অস্ফুট কাকলীর

মত ও দূরাগত পুষ্পগন্ধের মতই স্নিগ্ধ ও মধুর। রোমান্সের লীলার মধ্যে ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিগুলি সন্ধান করে তিনি কৌতুক বোধ করেছেন। নবদম্পতির সলজ্জ অনুরাগের দ্বিধা ও কুণ্ঠা কিরূপ ছেলেমানুষী আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায় তা দেখেও তিনি মজা পেয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ার সুরেশ্বর ফোটোগ্রাফারের দোকানের শো-কেসে একটি ফোটো ও তার অবস্থান সম্পর্কে যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছে এবং সেই ব্যগ্রতা গোপন করবার জন্য যে-সব লুকোচুরির আশ্রয় নিয়েছে তার অসঙ্গতি দেখিয়েও লেখক মৃদু হাস্য উদ্রেক করেছেন। অবশ্য বর্ষাকালের ক্ষণস্থায়ী রৌদ্রপাতের মতই বিভূতিভূষণের রোমান্স বর্ণনা অনেক স্থানেই আলতো ও স্বল্পসময়বদ্ধ। হৈমন্তী গল্পের রোমান্সও সাতদিনে ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং চিরস্থায়ী হয়েছিল নিঃসঙ্গ জীবনের অবসাদ।

বিভূতিভূষণের হাস্যরসের উৎস ও উপাদান নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা করলাম। এখন তাঁর হাস্যরসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাক। যে বিদ্বেষ ও সংশোধনপ্রবৃত্তি থেকে জ্বালাযন্ত্রণাদায়ক ব্যঙ্গরসের উৎপত্তি হয় বিভূতিভূষণের হাস্যরসে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। মানুষের প্রতি তাঁর কোনো ঘৃণাবিদ্বেষ ছিল না, সেজন্য একশ্রেণীর মানুষকে হাসাবার জন্য তিনি আর একশ্রেণীর মানুষকে আঘাত করেন নি। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সম্পর্কে কোনো প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ তাঁর লেখায় প্রকাশ পায় নি। তিনি ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক নিয়মকে স্থাপন করেছেন, কিন্তু কোথাও ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করেন নি। তাঁর কৌতুক অনেক স্থলেই মৃদু, অনুচ্চ, প্রচ্ছন্ন। জায়গায় জায়গায় হয়তো তাঁর দৃষ্টি ঈষৎ বক্র, শ্লেষের পাথরে একটু শান দেওয়া, কিন্তু কোথাও স্পষ্ট ও প্রকটিত নয়। অবশ্য কোনো কোনো জায়গায় হাস্যরসিকের ভূমিকায় তিনি সচেতন ভাবে আসীন, হাসাবার উদ্দেশ্যই সে-সব জায়গায় প্রধান। লেখক ওই সব স্থানে মূর্তিমান হাসির অবতার, তূণ থেকে হাসির সকল অস্ত্রই তিনি প্রয়োগ ক'রে চলেছেন। বরযাত্রী, কুইন অ্যান, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি গল্প এই পর্যায়ে পড়ে। বাংলা ও বিহারের ককনি, দেহাতী, আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষা অনেক কিছু জানা থাকার ফলে তিনি কথাবার্তার মধ্যে অনেক স্থলেই সরসতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। বিভূতিভূষণের যে হাস্যরস তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত এবং যার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের স্নেহ ও বেদনা মিলিত হ'য়ে আছে, বর্ষাধৌত সুচিক্কণ রৌদ্রের মত যা মনোরম তাই হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের দৃষ্টান্ত। তা হিউমারের পর্যায়ে পড়ে—তা আমাদের হাসায় আবার অলক্ষিত মুহূর্তে চিত্ত আর্দ্র ক'রে তোলে।

হাসির হল্লোড়ের দিক দিয়ে বরযাত্রী গল্পটির কথাই প্রথম উল্লেখ করতে হয়। কৌতুক রসের উদ্দামতায় দমফাটা হাসির সশব্দ উচ্ছ্বাসই এখানে পাঠক-চিত্তকে অবিরাম উত্তেজিত করতে থাকে। কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়েছে চরিত্র-

গুলির স্বভাব ও আচরণের উদ্ভটত্ব, কৌতুকোদ্দীপক কথাবার্তা এবং অদ্ভুত ও বিসদৃশ পরিস্থিতি থেকে। পাঁচ বরযাত্রী গল্পের মূল চরিত্র—কবি রাজেন, ছাপরার কে. গুপ্ত, ভোজনরসিক গোরাচাঁদ, সুযোগসন্ধানী ঘোঁৎনা এবং পালের গোদা তোত্‌লা গণশা। এদের মধ্যে গণশার তোত্‌লামিই হাসির খোরাক জুগিয়েছে সব চেয়ে বেশি। বরযাত্রীদের অভিভাবক হ'য়ে যাঁরা এসেছেন সব চেয়ে বিসদৃশ আচরণ করেছেন তাঁরাই। তাঁরা সকলেই মদ খেয়ে বেসামাল। প্রথমেই কন্যাপক্ষের সঙ্গে বরপক্ষের বিষম বিবাদ বাধল কারা অধিক ভদ্র সেই নিয়ে। বরপক্ষ বলে কন্যাপক্ষ অধিক ভদ্র আর কন্যাপক্ষ বলে বরপক্ষ অধিক ভদ্র। এরকম উদার, পরার্থপর বিবাদ শুধু মাতালদের পক্ষেই সম্ভব। তবে মাতাল-শিরোমণি হলেন বরকর্তা স্বয়ং। তিনি প্রথমে অকারণ রেগে বর তুলে নিয়ে যেতে চাইলেন, পরক্ষণেই মাতালজনোচিত মহত্ত্বে কন্যাকর্তাকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, 'তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই'। গল্পের শেষ অংশে উদ্ভট পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পাঁচ বন্ধুর নাকাল হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অপরাধ কিছু না, শুধুমাত্র বাসরঘরে একটু আড়ি পাততে গিয়েছিল। তারা পানাপুকুরে গিয়ে পড়েছে, ঢিল পাটকেল খেয়েছে, ঠাট্টা-বিদ্রূপের আঘাতে জর্জরিত হয়েছে এবং অবশেষে মেয়েদের হাতে শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ উপহার পেয়েছে। সবই কৌতুকজনক বটে, কিন্তু বিনা অপরাধে শাস্তির পরিমাণ একটু বেশি হয়েছে। সেজন্য শেষ পর্যন্ত হাসিতে আর আনন্দ থাকে না।

ঘোড়ার নাম কুইন অ্যান। নাম শুনেই হাসি পায়। গল্পটি হলো সেই সময়ের যখন রায় সাহেব, রায়বাহাদুর হবার লোভে সাহেবদের কিছু পাচাটা লোক প্রভুদের মনোরঞ্জন করবার জন্য যে-কোনো কাজ করতে পারতেন। রায় সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী এ-হেন এক ব্যক্তি। স্তাবক মোসাহেবদের দ্বারা পরিবৃত এই বোকা, আনাড়ী ও বাক্যবীর লোকটিকে হাস্যাস্পদ করার মধ্যে তার প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। ঘোড়ায় চড়া সম্বন্ধে জীবনে একটি মাত্র করুণ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজেকে দক্ষ ঘোড়সওয়ার রূপে জাহির করা এবং কার্যকালে বিপরীত রূপই প্রকাশ পাওয়ার মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে তাই কৌতুকরস সৃষ্টি করেছে। ঘোড়ায় চড়ার অগ্নিপরীক্ষা যখন সত্য সত্যই এসে পড়ল তখন রায় সাহেবের যে শোচনীয় দুর্গতি হলো তা বোধ হয় জন গিলপিনেরও হয় নি। গিলপিনের ঘোড়া তো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল। কিন্তু রায় সাহেবের ঘোড়া ছোটার আগেই তো তিনি কুপোকাত। খেয়ালী ঘোড়াটির স্বভাব ও আচরণ এবং ভয়কম্পিত চিত্তে তাকে বাগে আনার জন্য রায় সাহেবের লোক দেখানো চেষ্টার স্তরগুলি এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে যে কৌতুকের আঘাতে আঘাতে কেবলই বিপর্যস্ত হ'তে হয়।

দ্রব্য না থাকলেও শুধুমাত্র আধার থেকে দ্রব্যের কল্পনা করে সকলে মিলে একজন লোককে কিভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল, সেই দশচক্রে ভূত হবার সরস কাহিনী বর্ণিত হয়েছে দ্রব্যগুণ গল্পে। নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়ও বর্ণনার মুন্সীয়ানায় এবং পরিস্থিতি রচনাকৌশলে কিরূপ সরস হ'য়ে উঠতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পটিতে। গল্পটির ভিতর থেকে বোধ হয় একটি তত্ত্ব বার করা যায় এবং তা হলো এই যে সকলের মুখে বার বার এক কথা শোনা গেলেও এবং কাগজে প্রচারিত হলেও তা সত্য হ'য়ে ওঠে না। এখানে লেখকের রায় জনতার বিরুদ্ধে—যে জনতা নীতি রক্ষার অজুহাতে চরম মিথ্যার কারবারী, যে জনতা দেশহিতের নামে মানুষের চূড়ান্ত অহিত সাধন করে। যত অঘটন ঘটিয়েছে দুটি বোতল, একটি ফিনাইলের বোতল আর একটি শরবতের খালি বোতল। শৈলেনবাবু এ-দুটি বোতল নিয়ে বাড়ি পৌঁছবার আগেই রাষ্ট্র হয়ে গেল সুরাসক্ত শৈলেনবাবু স্বদেশ ও সমাজের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রকাশ্যে মদের বোতল নিয়ে চলেছেন। সমাজে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হলো। কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের পিকেটিং শুরু হলো তাঁর বাড়ির সম্মুখে। ভিত্তিহীন ধারণার এই বিরাট পরিণতি—এর মধ্যে কার্যকারণগত এমন এক অকল্পনীয় অসঙ্গতি আছে যে তা আমাদের কৌতুকবোধ উদ্রেক করে। নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক শৈলেনবাবুকে বিব্রত ও বিপন্ন হ'তে দেখে আমাদের যে স্বল্প হাসি উদ্রিক্ত হয় তার সঙ্গে সহানুভূতি মিশ্রিত হ'য়ে থাকে এবং সেই স্বল্প হাসি নিমেষের মধ্যেই ছিদ্রান্বেষী, পীড়নবিলাসী মানুষগুলির বিরুদ্ধে ঘৃণার বক্র-হাসিতে পরিণত হয়।

বিভূতিভূষণের অনেক গল্পের কৌতুকরস হঠাৎ বিস্ফোরিত হয় গল্পের শেষভাগে ঘটনার কোনো অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সে—প্রত্যাশার বিপরীত কোনো আকস্মিকতায়। শ্যামলরাণী গল্পে বর বেঁকে বসেছে পণ না পেলে বিয়ে করবে না। বেশ সাসপেন্স সৃষ্টির পর জানা গেল শ্যামলী বাছুর তার চাই। কৌতুকের হাসির বিস্ফোরণ ঘটল। কিন্তু তখনও রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ হলো না। রহস্যভেদ হলো একেবারে শেষে—অভাগিনী সুধাময়ী দাসীর পত্রের আবিষ্কারে। বিয়ের কনে বরকে আগে থাকতে চিঠি লিখেছে শ্যামলী বাছুরের জন্য বেঁকে বসতে। এই অভাবনীয় ষড়যন্ত্র কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়ে সকলকে নিঃসন্দেহে অবাক ক'রে দিল।

শীতকালের অন্ধকারে দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে ভূতের গল্প জমে ভালো। অবিশ্বাসীও ভূতে বিশ্বাস ক'রে বসে। অক্ষয় বৈরিগীর ভিটেয় চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অভিনয় ভূতের কাণ্ডকারখানায় কিভাবে লণ্ডভণ্ড হয়েছিল সে গল্প বেশ জমিয়ে এনেছিল। ভৌতিক রসের সঙ্গে কৌতুক রসে শ্রোতাদের মনও বেশ মশগুল হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু একেবারে শেষে অশ্বিনী যখন জানাল, ভূত নয়, তারই দেওয়া সিদ্ধির

প্রভাবে সব এলোমেলো কথা ও আচরণ প্রকাশ পেয়েছিল তখন ভূতের রস এক প্রবলতর কৌতুকরসে অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়েছে। কালিকা গল্পটির মধ্যে রাধারাণী ভয়ঙ্করী কালীমূর্তি ধারণ ক'রে এবং স্বামী কালীপদকে মহাদেবের সাজে সজ্জিত ক'রে উভয়ে নিখুঁত দেবদেবীর ভঙ্গিতে কিভাবে ভয়ঙ্কর ডাকাত ভৈরবকে ভুগিয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। বিভূতিভূষণের গল্পবর্ণনারীতির বৈশিষ্ট্য এই, তিনি কোনো পরিকল্পিত ক্রিয়ার পূর্বপ্রস্তুতি বর্ণনা করেন না, ক্রিয়াটি উপস্থাপিত ক'রে পরিশেষে দু'একটি ইঙ্গিতে তার অস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। সেই ব্যাখ্যা জানবার পর আমাদের কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়। সাসপেন্স এবং আকস্মিকতার জন্যই লেখক এই কৌশল অবলম্বন করেন। এখানেও দেবদেবীর মূর্তি ধারণ করবার পরিকল্পনা ও আয়োজন পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখা হয়েছে।

বিভূতিভূষণের গল্পের একটি বিশিষ্ট রীতি হল গল্পের মধ্যে গল্প গাঁথা। অর্থাৎ মূল গল্পটির কয়েকজন চরিত্র নিয়ে একটি গল্পের অবতারণা ক'রে সেই গল্পের কোনো বিশেষ চরিত্রের মুখ দিয়ে আর একটি অতীতের গল্পের অবতারণা করা। চরিত্রের মুখে বর্ণিত এই দ্বিতীয় গল্পটির রসই হলো মুখ্য। সম্পত্তি নামক গল্পটিতে স্বরূপ মণ্ডল অতীতের খেয়ালী ও দুর্দান্ত জমিদার সমাজের শরীকী বিরোধের একটি কাহিনী শুনিয়েছে। দশ আনা ও ছ' আনার দুই শরীকের জেদ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মপ্রাধান্যবোধ কিরূপ অতিশয়িত ও হাস্যকর পর্যায়ের হ'তে পারে তাই গল্পটিতে দেখানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটি চোরের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে লড়াইটি চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছেছিল। চোর বাঞ্ছারামের শরীরের দুই অংশ নিয়ে তেওয়ারী ও পাঁড়ের মধ্যে যেরকম টানা-হ্যাচড়া চলল তার সঙ্গে শুধু মন্দার পর্বত নিয়ে সুরাসুরের সমুদ্রমন্থনের তুলনা দেওয়া যেতে পারে। শেষকালে পাঁড়েরই জয় হলো বটে, কিন্তু চোর ততক্ষণ জীবন্মৃত। কৌতুকের দ্বিতীয় পর্বটি হল চোরের শাস্তিদানে। হাতী পা দিয়ে পিষে মারবে তাই দেখবার জন্য দশখানা গ্রামের লোক ছুটে এল। তারপর চোর বাঞ্ছারামকে সাজগোজ পরিয়ে, হাতীর উপর চড়িয়ে, ঢাকঢোলের বাজনার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট জমিতে ঘুরিয়ে জমিটি সেই চোরকেই দান করা হল। তিরস্কার পুরস্কারে ঘুরে গেল! কর্তাবাবুদের মেজাজ তো! ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার শুভঙ্কর পরিণতিতে বিপরীত আঘাতে পাঠকচিত্ত কৌতুকহাস্যে উল্লসিত হ'য়ে ওঠে।

ধর্মতলা-টু-কলেজ স্কোয়ার গল্পের নামটিই কৌতুকে উদ্ভাসিত। নববিবাহিত এক দম্পতির সলজ্জ ও নবঅনুরাগে রঙীন কথাগুলি লেখক রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদ করেছেন। অর্থহীন কাকলী, লুকোচুরি, ছলনা, কপট রাগ-অভিমান, সমস্ত জগৎটা ভুলে শুধু নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে থাকা—এ সবের মধ্যে

যে কৌতুককণাগুলি আছে লেখকের প্রসন্ন লেখনী থেকে সেগুলি ঠিকরে ঠিকরে পড়েছে। লেখক নিজেও কৌতুক সৃষ্টিতে কিছুটা অংশগ্রহণ করলেন, কাগজ জুগিয়ে তরুণ দম্পতিকে আত্মগোপন করতে সাহায্য করলেন, কৌতুকের চাপা হাসিতে নিশ্চয়ই তাঁর মুখটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল।

বিভূতিভূষণ যেখানে বাৎসল্যরসের সঙ্গে হাস্যরস মিশিয়েছেন সেখানে সেই হাস্যরস অতি স্নিগ্ধ, করুণ ও হৃদয়রসে আর্দ্র হ'য়ে উঠেছে। এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে লেখকের পরিহাসদীপ্ত বর্ণনাভঙ্গি এবং নানা সরস মন্তব্য থেকে এবং শিশুচরিত্রের বয়স ও তার ক্রিয়া ও আচরণের অসঙ্গতি থেকে। রাণু দ্বিতীয় ভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে তার কাকার আইন-পুস্তকাদি সব পড়ে শেষ করেছে। শুধু তার প্রথম ভাগটিই পড়া হ'য়ে ওঠেনি। প্রথম ভাগ সম্পর্কে তার নিদারুণ অনীহা, মুহুর্মুহু একখানার পর একখানা প্রথম ভাগ হারিয়ে যাওয়া এবং অনবরত একটার পর একটা মিথ্যা দিয়ে মেজকাকে ভোলাবার চেষ্টা এসব মেজকা যখন ছদ্মগাম্ভীর্য নিয়ে বর্ণনা ক'রে চলেছেন তখন তা অত্যন্ত কৌতুকজনক হ'য়ে উঠেছে। প্রথম ভাগের প্রতি বীতস্পৃহ হ'লে কি হয়, গিন্নীপনায় রাণু তার ঠাকুমাকেও হারিয়ে দিতে পারে। তার পাকা পাকা কথা আর রাসভারী চাল প্র[illegible] কৌতুক উদ্রেক করে মাত্র। রাণুর মিথ্যাভাষণ এবং মেজকার বিরক্তি এই দু'য়ের মধ্যে এমন একটি সর্বজয়ী মধুর স্নেহবন্ধন রয়েছে যে তার কাছে সকল মিথ্যা, ছলনা, বিরক্তি, ক্রোধ সব মুহূর্তের মধ্যে জল হ'য়ে গেছে। মেজকা ও তাঁর ভাইঝির হাসি ও খেলার পাশা একদিন অকস্মাৎ শেষ হ'য়ে গেল। বিভূতিভূষণ এখানে দূরস্থিত গল্পকার মাত্র নন, তিনি গল্পের সুখদুঃখময় একটি চরিত্র। সুখের দিনে তিনি হেসেছেন, আর বিদায়ের দিনে তিনি কান্না রোধ করতে পারেন নি। বিদায়ের মেঘে-ঢাকা দিনে শুধুমাত্র কৌতুকের একটি উজ্জ্বল রেখা। হারানো প্রথম ভাগগুলো রাণু শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। শিখে রোজ মেজকাকে চিঠি লিখবে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নারায়ণ চৌধুরী

চারটি সুবিদিত বৈশিষ্ট্যের দণ্ডের উপর কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা শিল্প দাঁড়িয়ে আছে—বাৎসল্যরস, নির্মল হাস্যকৌতুক, কাছেভিতের জায়গা ঘিরে অনবদ্য ভ্রমণরস সৃষ্টিনৈপুণ্য ও সবশেষে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক চিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা। বাৎসল্যরসের প্রমাণ পাই রাণুর ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ পুস্তকত্রয়ীর মধ্যে, নির্মল অর্থাৎ অসূয়ালেশহীন ও তিক্তস্বাদবর্জিত হাস্যরসের পরিচয় বিধৃত আছে বরযাত্রী [illegible]গণশা সিরিজের বইগুলির ভিতর; অখ্যাত জনপদ ও ততোধিক অখ্যাত মানুষজনকে নিয়েও যে চমৎকার স্বাদের ভ্রমণ-কাহিনী লেখা যায় তার নমুনা রয়েছে দুয়ার হতে অদূরে, কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি, স্বর্গাদপি গরীয়সী তিন খণ্ড প্রভৃতি বইয়ের গল্প কাহিনীর মধ্যে আর নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অপূর্ব আলেখ্যায়ন ক্ষমতার অভ্রান্ত নিদর্শন দেখতে পাই তাঁর নীলাঙ্গুরীর উপন্যাসটির মধ্যে।

শেষের উপন্যাসখানার প্রকৃতি প্রথম তিনবর্গের গল্পোপন্যাসের প্রকৃতি থেকে এতই আলাদা যে এটি একই লেখকের লেখা কিনা সে বিষয়ে প্রথমটায় একটু বিভ্রম জাগাও অসম্ভব নয়। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলেই বোঝা যায় সবকটি রচনাই একই লেখকের লেখনীমুখ থেকে নির্গত। সব কটি বইতেই সেই একই রকমের গভীর পর্যবেক্ষণ, অন্তর্দৃষ্টি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটির প্রতিও নিবিড় মনোযোগ, সাধারণ-অসাধারণ সকল প্রকার মানুষের প্রতিই প্রীতি ও অনুরাগ, সংসার ও সমাজের প্রতি মমত্ব, জীবনপ্রেম, ইহমুখীনতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির কমবেশী সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর তাই দিয়েই চেনা যায় রচনার বিষয়বস্তু বা চরিত্রায়ণ যেমনই হোক বা যাই হোক সেসবের পেছনে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন অভিজ্ঞ কথাশিল্পীর পাকা হাতের ছাপ মুদ্রিত। এই সমস্ত রচনা বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একজনাই জন্মেছেন এবং তাঁকে অন্যান্যদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না।

আরও একটু কাছাকাছি দৃষ্টিকোণ থেকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনার মর্মবস্তু অনুধাবন করবার চেষ্টা করলে দেখতে পাওয়া যায়, নামসাদৃশ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কমবেশী সমভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁদের লিখনরীতিতে কতই না পার্থক্য। দুইয়ের জন্ম প্রায় একই সময়—বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর আর মুখোপাধ্যায়ের ওই একই বছরের ২৪শে অক্টোবর, মাত্র একমাস বারো দিনের ছোট বড়র তফাৎ; জন্মের সমকালীনতায় দরুণ তাঁদের উভয়ের ভিতর দৃষ্টিভঙ্গীর অল্পবিস্তর ঐক্য থাকা অসম্ভব ছিল না কিন্তু দেখা যায় ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই বেশী। প্রথমত বন্দ্যোপাধ্যায় ঐকান্তিক প্রকৃতিপ্রেমী শিল্পী এবং তাঁর সেই ঐকান্তিক প্রকৃতিপ্রেম বাংলার গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করেই মুখ্যতঃ আবর্তিত হয়েছে, অন্যপক্ষে মুখোপাধ্যায় প্রকৃতিপ্রেমী হলেও তাঁর দৃষ্টি একান্তভাবে বাংলার পাড়াগাঁয়ের মধ্যেই সংলগ্ন হয়ে থাকেনি, উত্তর বিহারের শহরাঞ্চল ও দেহাতী অঞ্চলকে ঘিরেও তাঁর প্রকৃতিপ্রেম সমভাবে মূর্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় হাস্যরসের উপাদান কম, করুণরস তাঁর হাস্যরসকে ঢেকে দিয়েছে; পক্ষান্তরে মুখোপাধ্যায় মুখ্যতই একজন হাস্যরসস্রষ্টা বিরল বর্গের লেখক। উভয়েই বাৎসল্যরসের শিল্পী কিন্তু সেখানেও দুয়ের বাৎসল্যকে ব্যবহার করার ভঙ্গীতে গভীর তারতম্য আছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ পথের পাঁচালী উপন্যাসের দুই অবিস্মরণীয় শিশু-চরিত্র দুর্গা ও অপুকে উৎকট দারিদ্র্য ও তজ্জনিত চরম ক্ষুধা যন্ত্রণার পৃষ্টপটে স্থাপন করে তাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতির ভিতর একটা গভীর কারুণ্যের বোধের সঞ্চার করে দিয়েছেন, আর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর রাণু সিরিজের বই তিনটিতে কেবলই নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র হাস্যরস কৌতুকের নিরাবিল নির্ঝর বইয়ে দিয়েছেন। এখনকার পরিবেশ ও মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন, কিন্তু তাতে দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালা নেই। দারিদ্র্যের অনুষঙ্গ থাকা না থাকার পার্থক্যের দরুণ দুটি কাহিনী সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন জাতের রচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের ভিতর আকাশপাতাল বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে।

তবে নামগত ধ্বনিসাযুজ্য একেবারে ব্যর্থ যায়নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়ের ভিতর এক জায়গায় গভীর মিল আছে। দুজনাই বিগত পৃথিবীর শিল্পী এবং দুজনারই শিল্পের মূল উপজীব্য গার্হস্থ্যরস। বর্তমান কালীন সমাজ ভাবনা, প্রগতি-চেতনা, সাম্যচিন্তা ও রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যাকে ঘিরে মনন প্রবণতা একালীন সমাজ জীবনের চিত্রায়ণ—এসবের ভুবন থেকে তাঁদের উভয়েরই বেশ কিছুটা দূরে অবস্থান। এই দূরাবস্থান আধুনিককালীন পাঠকের মনে বেশ কিছুটা অতৃপ্তির সঞ্চার করে বটে কিন্তু যখন স্মরণ করি বেঁচে থাকলে আজ তাঁদের বয়স হতো পঁচানব্বুই, তখন

তাঁদের ওই বয়সের বিবেচনাটাই, তাঁদের প্রতি অকরুণ হওয়ার পক্ষে একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের প্রকট বর্ষীয়াণত্বই তাঁদের সমকালীন রুচি ও প্রত্যাশার সুকঠোর পরীক্ষার বাধ্যতা থেকে বাঁচিয়ে দেয়। ভিন্নতর মানসিকতা নিয়ে নতুন কালে বেঁচে থাকার সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও তেমনি আছে। যুগের শাস্তি সর্বদাই বড় নির্মম।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিগত পৃথিবীর মূল্যবোধের প্রতি পক্ষপাতের প্রমাণ দেখতে পাই, তাঁর নীলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের ঘটনায়ন ও চিত্রায়ণের ধারার ভিতর। ব্যারিস্টার গুরুপ্রসাদ রায়ের বালীগঞ্জস্থিত লেক ক্রেশেন্টের বাড়ির সবটাই ইঙ্গবঙ্গীয় আদব-কায়দা দিয়ে মোড়া। ব্যারিস্টার "জি. পি. রে."-র আদবকায়দা ধরণ ধারণ উৎকট সাহেবিয়ানার দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাঁর পত্নী অপর্ণাদেবীর চালচলন আমাদের দেশী রীতিকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি উচ্চ বিলিতি শিক্ষায় শিক্ষিতা হলেও এবং তাঁর বিশুদ্ধ ইংরিজি উচ্চারণ মেমসাহেবদের হার মানালেও তিনি ঘরে ঠাকুর পুজো করেন এবং দেওয়ালে বিলম্বিত রবি বর্মার আঁকা কমলা মূর্তির দিকে ভক্তিগদগদ চিত্তে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, নিজের লরেটোতে পড়া ছোট মেয়ে, তরু পাছে বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে একেবারেই হিন্দু ধর্মের শিকড়চ্যুত হয়ে পড়ে সেই কারণে তাকে প্রতিদিন সকালে লক্ষ্মীপাঠশালায় "শিবস্তোত্র" শেখাতে পাঠান। বিলিতিয়ানা ও দিশিয়ানার কী অপূর্ব সহাবস্থান, কী অদ্ভুত জগাখিচুড়ী। বিলিতিয়ানা খারাপ কিন্তু এই জগাখিচুড়ি যে আরও বেশী নিন্দনীয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বধূরূপে ব্যারিস্টার গৃহে আনীতা মুর্শিদাবাদ রাজবাড়ীর কন্যা অপর্ণাদেবীকে একজন মহীয়সী মহিলারূপে আঁকতে গিয়ে প্রকারান্তরে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকেই আদর্শায়িত করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বাংলার সমাজজীবন থেকে যে বনেদিয়ানার ঐতিহ্য চলে গিয়েছে এবং যা অপগত হওয়াই ভাল তার প্রতি বিভূতিভূষণের মমত্ব চাপা থাকেনি।

কিন্তু এই বিচ্যুতি সত্ত্বেও বলব, বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসটিতে অসামান্য মনস্তত্ত্ব-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যারিস্টারের জ্যেষ্ঠা কন্যা মীরা আর তরুর গৃহশিক্ষক শৈলেনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ও সুচিক্কণ মন-দেওয়া-নেওয়ার খেলার আলো-ছায়ার লীলা দেখান হয়েছে তা প্রথম শ্রেণীর শিল্পচাতুর্যের দ্যোতক। মীরা আজন্ম সুখলালিতা, উচ্চকোটির জীবনযাত্রায় অভ্যস্তা এক ধনী পরিবারের দুহিতা আর শৈলেন এক দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত যুবক, বি. এ. পাশ করার পর জীবিকার তাড়নায় এঁদের গৃহে গার্জেন-টিউটরের চাকুরি নিয়ে এসেছে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক স্থিতির (স্ট্যাটাস) দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু এমনতর ব্যবধান সত্ত্বেও ওই একজোড়া যুবক-যুবতীর মধ্যে সংঘাত ও অনুরাগের

আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে যে-সংযতশালীন পারস্পরিক ভালবাসার ছবি দেখানো হয়েছে, এক কথায় তার আবেদন অপ্রতিরোধ্য। দুটি সংবেদনশীল হৃদয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে, হয়ত তাঁদের নিজেদেরও অলক্ষিতে এই যে প্রায় ধরাছোঁয়ার অতীত ভালবাসার জোয়ার ভাঁটার খেলার রূপায়ণ—এটি আরও বেশী মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই কারণে যে, এই পারস্পরিক রাগ-বিরাগের টানাপোড়েনের দ্বন্দ্বে দুটি ব্যক্তিত্বের মর্যাদাই অক্ষুণ্ণ রয়েছে, কোথাও তাদের ব্যক্তিগত সম্ভ্রম এতটুকু টাল খায়নি। প্রণয়ের আঁকাবাঁকা গতির চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে এটা যে কত বড় মুন্সিয়ানার পরিচায়ক তা বলে শেষ করা যায় না। সাধে কি কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের একটি সেরা উপন্যাস বলেছিলেন। এমন যাঁর সুদক্ষ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূক্ষ্ম তন্তুবয়নের কারিকুরি তিনি আজীবন গণশা আর বরযাত্রীর কুশীলবদের মামুলী চরিত্রাঙ্কণ করেই কলমের শক্তিক্ষয় করবেন ভাবতেও কষ্ট হয়।

নীলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের দুটি ভাগ মীরার উপাখ্যান ও সৌদামিনীর উপাখ্যান। কিন্তু দুই অংশের স্বাদে-গন্ধে-মেজাজে আসমান-জমিন ফারাক। প্রথম উপাখ্যানের আবেদন, বুদ্ধিপ্রধান, মননশীল, বিদগ্ধ, দ্বিতীয়টির, আটপৌরে, ঘরোয়া, গ্রামীণ। প্রতিতুলনায় প্রথম আখ্যানের আবেদন অনেক বেশী খাদু। মীরা ও শৈলেনের পারস্পরিক সম্পর্কের ছকটি জায়গায় জায়গায় শরৎচন্দ্রের বড়দিদি উপন্যাসের মাধবী ও সুরেনের সম্পর্কের ছাঁচটিকে মনে করিয়ে দেয় বটে, তবে এই কাহিনীতে মনস্তত্ত্বের খেলা আরও বেশী সূক্ষ্ম, আরও বেশী সুকুমার। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আর কোন বই না লিখে যদি শুধু এই বইটিই কেবল লিখতেন তাহলেও তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকত।

বিভূতিভূষণের শিশুসাহিত্য

রামবহাল তেওয়ারী

বাংলায় কথাসাহিত্যিকের অভাব নেই। অভাব নেই ছোটগল্পকারেরও। গল্পকারদের বেশ কয়েকজন শিশুসাহিত্যিকরূপেও পরিচিত। আর পুরোপুরি শিশুসাহিত্যই লেখেন—এমন লেখকের সংখ্যাও খুব কম নয়। যদি শিশুরাই শিশুদের নিয়ে লিখত ও পড়ত—তাহলে শিশুসাহিত্য অভিধাটি সুনির্দিষ্ট ও সার্থক হত। কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। শিশুরা যে লেখে না, তা নয়, আর লেখে নিজেদের নিয়েও। তার পাঠকও তারাই। কিন্তু তার উপর নির্ভর করে এই সাহিত্য শাখাটির নির্মাণ হয়নি। আর হলেও তাকে যথার্থ সাহিত্য বলা যেত কি না, তাতে সংশয় আছে। সে যাই হোক, প্রচলিত শিশুসাহিত্যের লেখক শিশু না-হলেও, তার বিষয় শিশুর জগৎ এবং পাঠক প্রধানতঃ শিশুসমাজই। অবশ্য তার ব্যতিক্রমও আছে।

বাংলা শিশুসাহিত্যে লেখক বা কবির অবস্থান নেপথ্যে। ছোটদের ছোটগল্পে গল্পকার যেন পর্দার আড়াল থেকে তাঁর কাজ সারেন। এইভাবে দূরত্ব বজায় রেখে ইচ্ছামতো সৃজন করা চলে স্বতন্ত্র জগৎটিকে। প্রয়োজনমতো কল্পনার পাখায় ভর করে ওড়াও সহজ হয়। রগড় সৃষ্টি করে হাসানো যায়, কাঁদানো যায় আবার করুণ পরিণতি টেনে বিমর্ষ ও বিচলিতও করা যায় পাঠক-সমাজকে। তবে প্রধানতঃ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুদের জগৎকে শিল্পরূপ দিলে তার স্বরূপ-স্বাদ ভিন্নতর হয়। কারণ তা সব শিশুর কাছেই পরিচিতের মতো আপন-আপন ঠেকে। লেখকের উপস্থিতি কাহিনীকে ঘরোয়া বিশ্বাস্য ও বিচিত্র করে তোলে। তা আরও উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে হাস্যরসের জোরকে। বাংলায় এই প্রকৃতির ছোটগল্পের নিতান্তই অভাব ছিল। সে অভাব পূরণ করেছেন বহুলাংশে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৮৭)। বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিশুসাহিত্যও তাই। তবে শিশুজগতের বিচিত্র ছবি, তাদের মনের সূক্ষ্ম ও জটিল রহস্য যে-

ভাবে শিল্পরূপ লাভ করেছে তাতে তা বড়দেরও সুখপাঠ্য সাহিত্যে পর্যবসিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর রাণু পর্যায়ের গল্প, গণশা-ঘোঁৎনা প্রভৃতির বরযাত্রী দলকে নিয়ে লেখা গল্প, দৈনন্দিন গল্পমালা ও শৈলেনের বাল্য প্রসঙ্গের গল্পগুলির কথা মনে পড়ে। 'পোস্থুর চিঠি' ও 'এই জগৎই ওদের চোখে' গল্প সংকলন দুইটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশুদের উপযোগী গল্প সংকলন হিসাবে একটি অপরটির পরিপূরক বলা চলে।

বিভূতিভূষণ সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনের দুঃখবোধকে খোলামেলা মনে স্বীকার করে নিয়ে, আলাপে-প্রলাপে, হাস্য পরিহাসে হাল্‌কা ও আনন্দময় করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। জীবনের রঙ্গরসিকতার রঙের ছোঁয়া তাঁর রচনায়, বিশেষ করে ছোটগল্পেও লেগেছে। করুণরসের সঙ্গেও তাঁর বোঝাপড়া হয়েছে। শিশুমনস্তত্ত্ব অতি নিপুণ ও আকর্ষণীয় রূপ লাভ করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে বিভূতিভূষণের শিশুমনের গহনে সঞ্চরণের দুর্লভ শক্তির ফলে। ব্যক্তিটি মান-সম্মান, বিদ্যা-বুদ্ধি, বয়স-অভিজ্ঞতার অধিকারী হলেও তার জন্য গুমোর ছিল না বিন্দুমাত্র। তাই বাইরের সমস্ত আবরণের আড়ালে তাঁর কচি-কাঁচা সাঁচা শিশুমনটি সযত্নে সরলতা ও বিশ্বাস্যতা নিয়ে বেঁচে ছিল। পরিণত বিভূতিভূষণের মধ্যেও শিশু-বিভূতিভূষণের প্রাণ-মন ও তার প্রতিক্রিয়া যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি গুরুত্ববাহী। এইসব কারণে বাংলা ছোটগল্পের এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ একক ও অনন্য। তাঁর গল্পগুলিকে আরও উপাদেয় এবং হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে তাঁর সৌন্দর্যপিয়াসু কবিসত্তা এবং সূক্ষ্ম জীবনদর্শন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> তাঁর "গল্পগুলি প্রধানতঃ হাস্যরস মূলক' ; তবে 'হাস্যরসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে যে কবি সুলভ সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিকের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। কাজেই বিভূতিভূষণের স্থান কেবল হাস্যরসিকদের মধ্যেই নহে। তাঁহার রচনায় কাব্যধর্মে উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতা ছোটগল্পের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়াছে।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা / ১৩০২ / পৃ. ৪১৬)।

কবির দেশেই জন্ম বাঙালি বিভূতিভূষণের। সুতরাং কবিচিত্ততা এবং দার্শনিক সুলভ জীবন-ভঙ্গীর পরিচয় তাঁর রচনায় থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনা বিদ্যালয়জীবনে। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অবিচার' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২২)। স্নাতক স্তরের প্রথমবর্ষের ছাত্র তখন। কিন্তু বিভূতিভূষণের জীবনের অধিকাংশ সময় বা পুরো সাহিত্য-জীবন কাটে বিহারে। বাংলা থেকে বিহারে গিয়ে পরিবেশ-পরিজন বদলে যাওয়ায় তাঁর সৃজনধারাও এক-প্রকার স্তব্ধ হয়ে যায়। সেকথা জানা যায় হরিশংকরকে লেখা তাঁর পত্র থেকে। লেখা বন্ধ হবার নানা কারণ উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—

> "আরও একটা কারণ ছিল...। অর্থাৎ সাহিত্য বা আলোচনার কেন্দ্র থেকে দূরত্ব, বাংলা থেকে এই ক্ষেত্রে তিনশ মাইলের ব্যবধান, গঙ্গার মতই একটি মহানদী মাঝখানে।—আমি বাংলার জীবন থেকেই বিচ্ছিন্ন, লিখব কি নিয়ে।" ('হরিশংকরকে লেখা', দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৬৫।)

সুতরাং লেখা বন্ধ থাকল। বিহারের অপেক্ষাকৃত রুক্ষ-শুষ্ক প্রকৃতি, মানুষজন, ও পরিবেশ এবং নতুন জীবনচর্যার সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে, ধাতস্থ হতে সময় লাগরে বৈকি! যে নবীন ফুলগাছটি সবেমাত্র ফুল দিতে শুরু করেছিল, তাকে ভিন্নতর জল-বায়ু-মাটির পরিবেশে নিয়ে গিয়ে রোপণ করা হল। নতুন মাটিতে শিকড় চালিয়ে রস আহরণ করে আত্মরক্ষা ও রসদ সংগ্রহ করে ফুল ফোটাতে তার সময় তো লাগবেই। আবার ফুল ফুটলে তার রূপ, রস, বর্ণ ও গন্ধ ভিন্নতর হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং বিভূতিভূষণের কলমে যখন আবার লেখা বের হল—তার প্রকৃতি আর পুরোপুরি আগের মতো থাকল না। তাতে একদিকে যেমন পূর্বজীবনের জন্য সূক্ষ্ম-প্রচ্ছন্ন বিরহের সুর বেজেছে, তেমনি বর্তমান পরিবেশের ছাপ, সর্বোপরি নিজেদের বিরাট পরিবারের অসমবয়সী সদস্যদের চরিত্র ও প্রবণতায় বিচিত্র সান্নিধ্য প্রতিফলিত। এ-সবের সমবেত, সজীব ও সক্রিয় অনুভূতিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টিশীল মন। সেকথাও জেনেছি আমরা তাঁর কাছেই। বলেছেন—

> "আমি যে বেঁচে আছি সাহিত্য জীবনে তার আরো একটা কারণ এই যে, আমাদের পরিবারটি ছিল বেশ বড়। আমরা আট ভাই, তথৈব সন্তানাদির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে পরিবার; ছেলেমেয়েয়, শিশুতে-কিশোরে বড় বলাই ঠিক হবে। এতে করে এই হল যে, যে মন বাংলার খাস বাঙালি-জীবন থেকে বৈচিত্র্য আহরণ করতে পারল না, সে এদিকেই বিচিত্র জগৎ নিয়ে রইল পড়ে।" (পূর্ববৎ)

এই 'বিচিত্র জগৎ'ই রসদ জুগিয়েছে বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের। আর তাকে ভাবে ভাষায় ও স্বাদে বিচিত্রতর করেছে বিহারের পরিবেশ-প্রকৃতি। তাই চরিত্রবদল ঘটে গেছে তাঁর রচনার। সূচনাপর্বের গুরুগম্ভীর বা সিরিয়াস্ নয়, সহানুভূতি-ঋদ্ধ স্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটার উজ্জ্বলতা বা হিউমার হয়ে উঠল লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। তাঁর ছোটদের জন্য লেখা ছোটগল্পের সুরও তাই।

বিভূতিভূষণের 'শিশুসাহিত্য' নামধেয় ছোটগল্পগুলিতে যে-সব শিশু চরিত্র এসেছে, তাদের চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা-চাঞ্চল্য, অস্ফুট কথা ও মারাত্মক অনুকরণ প্রবৃত্তি—আমাদের কাছে পুরোপুরি অপরিচিত না হলেও, তা আমাদের কখনো হাসায়, কখনো বিপন্ন ও বিরন্ন করে, কখনো বা বিস্ময়ে হতবাক্ আবার কখনো বা আনন্দে মশগুল করে তোলে। ভুলিয়ে দেয় আমাদের অহং ও স্বাতন্ত্র্য-বোধকে। এমনই বিচিত্র এই শিশুর জগৎ। শিশু বা কিশোর পাঠকরা যে

তার মধ্যে নিজেকে অন্ত-নিজর খুঁজে পাবে—আত্মহারা হয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠবে, আবার পরক্ষণেই রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠবে তাতে আর বিচিত্র কি!

শিশুদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, গর্ব, ঈর্ষা, অনুকরণ প্রবৃত্তি, অকপট বিশ্বাস-প্রবণতা—ইত্যাদি—সমস্ত কিছুর মধ্যেই কত সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য আছে, আছে মিলও—যা আমরা এর আগে দেখিনি। আবার সব শিশু শিশুই, তবু এসব ব্যাপারে এক শিশুর সঙ্গে অন্য শিশুর যে কত প্রভেদ—তাও সুন্দরভাবে ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সামনে—বিভিন্ন গল্পে, কখনো বা একই গল্পের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একই শিশুর মধ্যে প্রভেদ ঘটে যায়। কখনো বা বয়স বাড়লেও শিশুর মনের প্রবণতা একই থেকে যায়। এ সমস্ত দিকই সুন্দর মনোরমভাবে রূপায়িত হয়েছে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে। শিশু-চরিত্রের এইরূপ বাস্তবোচিত অনবদ্য বিচার-বিশ্লেষণ ও রূপায়ণ বিভূতিভূষণের পক্ষেই সম্ভব। কারণ তাঁর গল্পের উৎস ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও আত্মীয়-স্বজনদের ঘনিষ্ঠসান্নিধ্য। 'রাণুর প্রথম ভাগে'র রাণু, 'দাঁতের আলো'র ছবি, মৈয়া ও বাবুল, 'বাদল' গল্পের বাদল, রেখা, আভা, 'তেজারতি' গল্পের কৌশল ও বাবু, 'স্বয়ংবরার' ডলি ও 'মাসি' গল্পের মিটু—এরা সবাই, বিভূতিভূষণের ভাইপো ও ভাইঝি। আছে আরও কেউ কেউ। 'মাসী' গল্পের তুলতুল লেখকের ভাই মণিভূষণের শ্যালিকা। বিভূতিভূষণেরা আট ভাই হলেন—শশিভূষণ, বিভূতিভূষণ, হরিভূষণ, ইন্দুভূষণ, অরবিন্দভূষণ, মণিভূষণ, অবনীভূষণ ও বিনয়ভূষণ। গল্পের বক্তা 'মেজকাকা' লেখক স্বয়ং। ভাইপো ও ভাইঝিদের সঙ্গে সঙ্গে দাদা এবং ভাইরাও মাঝে মাঝে গল্পে এসে গেছে। অর্থাৎ চরিত্রগুলি বেশির ভাগই বাস্তব। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের একটি মূল্যবান উক্তি হল—

> "ভাই-পো-ভাইঝিদের বাপ-মা থাকা সত্ত্বেও লেখকই [বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়] ছিলেন তাদের অভিভাবক, এদের সঙ্গে লেখকের স্নেহ মধুর সম্পর্ক ছিল, তারই প্রতিচ্ছবি এই গল্পগুলি থেকে পাওয়া যায়।—আমি দ্বারভাঙ্গায় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে নিজেই এর কিছু পরিচয় পেয়েছি। এইসব গল্পে লেখক শিশু ভাইপো-ভাইঝিদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অবিকলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন; তবে গল্পগুলির বিষয়বস্তু সবটাই সত্য নয়; তার মধ্যে অনেকখানিই কল্পনা ও অতিরঞ্জন আছে।...লেখক শুধু তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলেমেয়েদেরই মেজকাকা নন, তাঁর অনুজদের পুত্র-কন্যারাও (দু-একজন বাদে) তাঁকে 'মেজকাকা' বলেই সম্বোধন করত। সংশ্লিষ্ট গল্পগুলির মধ্যেও এর ইঙ্গিত আছে। (এই জগৎই ওদের চোখে / ১৯৮৩ / পৃ. গ-ঘ)।

বিভূতিভূষণের গল্পে অপরূপ মধুর গার্হস্থ্যরস হাস্যরসের ছটায় যেমন উদ্ভাসিত

তেমনটি অন্যত্র দেখা যায় না। গোমড়া-গম্ভীর নয়, সহজ সুরে বাঁধা, আনন্দে ভরা জীবনই মানুষ চায়। তাই গল্পে জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে বিভূতিভূষণ হাস্যরসে ডুবিয়ে নিয়েছেন তাঁর তুলি। তাতেই নিরূপিত, নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের স্বাদ ও প্রকৃতি। সে হাস্যরসের মূলে রয়েছে সহানুভূতি ও সমবেদনা। তাই দেখা দিয়েছে হিউমার। উইট ও স্যাটায়ার গল্পে মাঝে মাঝে দেখা দিলেও তা বিভূতিভূষণের প্রকৃতিসম্মত নয়। তিনি সদয় রোমান্টিক হৃদয়বৃত্তির মানুষ। তাই তাঁর হাসির গল্পের উৎস গহন-গভীর চিত্তের স্নিগ্ধ মধুর হাস্যরঞ্জিত।

শিশুর জগৎ সদাতরঙ্গময়, রহস্যঘন আশ্চর্য ও স্পর্শকাতর। অনেক অমূলক ভাবনা ও আজগুবি কল্পনা বেশ সহজে গুরুত্ব লাভ করে শিশুর কাছে। বড়দের কাছে যা নিরর্থক ও আজগুবি, শিশুদের কাছে তা মহামূল্যবান। তাদের চিন্তা ও আচরণের অসঙ্গতি আমাদের স্মিতহাস্যের উদ্রেক ঘটায়। তাদের জগৎ পুরোপুরি মায়াময়। সম্ভব-অসম্ভবের কোনো ভেদরেখা সেখানে নেই। তাই বিভূতিভূষণের হাস্যপ্রধান শিশুদের গল্প অকৃত্রিম হাসির ফোয়ারায় উদ্বেল। 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পটি এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই গল্পই সমজাতীয় অন্যান্য গল্পের মূল উৎস বলা চলে। শিশু হলেও রাণু নিজেকে বড়ো-সড়ো ভাবে। ছোটভাইয়ের উপর মনের আনন্দে খবরদারি করে। কিন্তু প্রথম ভাগ পড়তে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। তার নানা ছল-চাতুরীর সাহায্যে পড়ার অনিচ্ছাটিকে চরিতার্থ করার কৌশল পাঠকের কাছে অহেতুক হাসির কারণ হয়েছে। তা সহজ ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে মেজকাকার উপস্থিতিতে। সে সহজেই প্রথম ভাগের বদলে দ্বিতীয় ভাগ এমন কি কাকার ডাক্তারি বই পড়বে, কিন্তু প্রথম ভাগ কিছুতেই নয়। সে পড়বে না কিন্তু মেজকাকা পড়াবেনই। তাই তার লুকোচুরি ও ছলনার অন্ত নেই। শেষে বিদায়ের বেলায় মেজকাকা ও রাণুর মধ্যে পরস্পর ধরা দেওয়ার মুহূর্তটি যেভাবে এসেছে, তাতে সমস্ত ব্যাপারটিই করুণরসে আর্দ্র হয়ে উঠেছে। হাসির হালকা হাওয়ায় চোখের জলের আবেদন হৃদয়ের মর্মমূলে তীরের মতো বেজেছে। এক লহমায়—মেজকাকার তাড়া, প্রথম ভাগ ছিঁড়ে বা গোপন করে, হারিয়ে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে রাণুর দিনের পর দিন পালানোর মতো কষ্ট ও অশান্তি শিশুমনের পক্ষে দুর্বিষহ বোঝা। মেজকাকা যখন বিরসবদনে বলেন—"আড়াইটি বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণু 'অজ-আম'র পাতা শেষ করিয়া 'অচল-অধমে'র পাতায় আসিয়া অচল হইয়া বসিয়াছে।" তখন তাঁর ধৈর্য, বাৎসল্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সঙ্গে অসহায়তাও ফুটে ওঠে। ফুটে ওঠে রাণুর বিরাগ ও হতাশা, যখন সে জানতে চায়—"আচ্ছা মেজকা, একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না? আমার একটুও

বলে দিতে হবে না। এই শোন না।—'ঐক-য়ে য-ফলা—।" মেজকাকা তখন রেগে বলে ওঠেন—"ওই ডেঁপোমি ছাড় দিকিন, ওইজন্তেই তোমার কিছু হয় না। নাও পড়।"—পড়াশোনা কিন্তু যেখানকার সেখানেই থাকে। তা নিয়ে মেজকাকার দুঃখ ও আপশোসের অন্ত নেই। রাণু বড়ো হয়েছে এবং সে পড়তে জানে। সেকথা জানাতেও সে কসুর করে না। বলে—"পড়তে তো জানি মেজকা, খালি পেরথোম ভাগটাই জানি না, বড় হয়েছি কি না! বাড়ির আর কোন্ লোকটা পেরথোম ভাগ পড়ে মেজকা, দেখাও তো।"

ছোট রাণুর ভিতরে ভিতরে বড়ো হয়ে ওঠা কি মর্মান্তিক তা মেজকাকা হাড়ে হাড়ে টের পান। তার অসহায় অবস্থাটা নির্বিকারভাবে গ্রহণ করা ছাড়া তো উপায় থাকে না। শিশুর জগৎ ও বড়োর জগৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ প্রবল কিন্তু মিলনের বাধা প্রবলতর। গল্পের শেষে রাণু যখন চোখের জলে ভাসা মুখখানি তুলে দশবারোখানি প্রথমভাগের বাণ্ডিল দেখিয়ে বলে, "পেরথোম ভাগগুলো হারাইনি মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।—সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি মেজকা, খুব লক্ষ্মী হয়ে পড়ে পড়ে এবার শিখে ফেলব। তারপরে তোমায় রোজ রোজ চিঠি লিখব। তুমি কিছু ভেবো না মেজকা।" তখন গোটা গল্পটাই—প্রতিটি ঘটনা, বর্ণনা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে একটি স্নিগ্ধ বিষাদে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে ওঠে। তখন রাণুর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা মেজকাকার সঙ্গে সঙ্গে পরিণতবুদ্ধি পাঠকের কাছেও কেবল কৌতুকাবহ হয়েই থাকে না। কৌতুক অতিক্রম করে গভীর বিষণ্ণ ব্যঞ্জনায় পৌঁছে যায়। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীও তাই মনে করেন। তিনি বলেছেন—

> "তার চরম প্রমাণ পাই গল্প শেষের হাস্য-করুণ পরিণাম বোধে—এগল্পের ফলশ্রুতি কেবল হাস্যরসাত্মক নয়, তার মুখে হাসি, চোখে জল।...বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায় নিজের গল্পশরীরে নিজেব্যথিত হয়ে, অপরের মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন সহৃদয়তা-স্নিগ্ধ সকরুণ স্মিত-হাসি। রাণুর প্রথমভাগে মেজকাকা চরিত্রের পরিণামী ভূমিকায় তার সংশয়হীন প্রমাণ।" (বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার / ১৯৮২ / পৃ. ৬৪২)।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে হাস্য-করুণের এই সমন্বয় অর্থাৎ কারুণ্য ও পরিহাসের মিলনকে রাজশেখর বসু ('পরশুরাম') "দুগ্ধবৎ স্নিগ্ধ" বলেছেন। (কথাসাহিত্য / জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ / পৃ. ৬৪৩)। বলতে কি বাংলা ছোটগল্পে এই 'দুগ্ধবৎ স্নিগ্ধ' রসটি বিভূতিভূষণেরই দান। যা সর্বাধিক মেলে তাঁর শিশুমনস্তত্ত্বমূলক গল্পগুলিতে। আর সেই জন্যই এ-গল্পগুলি এমন সার্থক এবং এত জনপ্রিয়।

এবার শিশু চরিত্রের অন্য একটি প্রবণতার কথায় আসা যাক। মালি গল্পের

মিটু তুলতুলের চেয়ে বড়ো। মেজকাকার জলযোগের সময় সামনে রসে প্রলোভন সমন্ন করে সে কাকাকে জানায়—হ্যাংলাপনার জন্ত সে তুলতুলকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে পেতে চায় বাহাদুরি ও খাবারের ভাগ। মেজকাকা—তুলতুল ছোট তাই তার হ্যাংলামি সমর্থন করে তাকে খাবারের ভাগ দিতে চান। মিটু বড়ো তাই তার সংযত থাকাই উচিত সাব্যস্ত করেন। তুলতুলকে ডেকে আনতে বলেন। কিন্তু মিটু ডাকতে না গিয়ে তুলতুলের রেকাবির খাবারের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "আমিও তো বড় হইনি।" আবার মেজকাকার কানে কানে বলে—'আমি তো কচি ছেলে মেজকাকা, বড় নয় তো।" এক্ষেত্রে ছোট হওয়াতেই তার লাভ। তুলতুল সম্পর্কে তার মাসি হলেও, বয়সে ছোট এবং শাড়ি পরে না, তাই তাকে সে 'মাসি' বলবে না, কিছুতেই বলবে না। আবার সে 'মাসি' না-বললে তুলতুল খাবেই না—সে এক মহা সমস্যা। সেই মিটু 'হাতেখড়ি' গল্পে মেলে ধরেছে তার বিচিত্র বিশ্বাসের জগৎ। ছোট ভাইটির কাছে 'দাদা' সম্বোধন শোনার জন্য সে রীতিমতো বড়ো হয়ে উঠতে চায়। 'হাতেখড়ি' হবার আগেই লেখা ও পড়া শুরু করে দেয়। হাতে খড়ির পর তার বিদ্যা ও সরস্বতীকে নিয়ে মহা সমস্যা দেখা দিল। সরস্বতীর 'হাতেখড়ি' হয়নি শুনে ও তার পরিণাম চিন্তা করে তার কতই না আপশোস! আর হাতেখড়ি না হয়ে সরস্বতীর বিদ্যাই বা হল কেমন করে? "ঠিকইতো 'হাতেখড়ি না হইলে বিদ্যা থাকিয়াও যে নাই!" অতএব সরস্বতীর 'হাতেখড়ি' দেওয়া চাই। পুরুত ঠাকুরের কাছে সরস্বতী ঠাকুর হাতেখড়ি নেবেন না। মেজকাকাও রাজি হলেন না। প্রস্তাব শুনে বললেন—"আমার অত ছোট কাজের ফুরসৎ নেই। ডেঁপো কোথাকার।" কিন্তু সরস্বতীর হাতেখড়ি না দিলেই নয়। সুতরাং সব আঁট-ঘাট বেঁধে সরস্বতীকে হাতেখড়ি দিল সে নিজে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে দক্ষিণা হিসাবে পেল বকুনি ও কানমলা।

এই বিশ্বাসের জগৎ আরও নানাভাবে রূপ লাভ করেছে বিভিন্ন গল্পে। পীতু গল্পে পাঁচ বছরের ছবির গুরু প্রায় সমবয়সী পীতুই। ছবির কাছে পীতুর সব কথাই অকাট্য বেদবাক্য। যা পীতু জানে ও বোঝে তা মেজকাকাও জানেন না, বোঝেন না। হাতীর ওড়ার প্রসঙ্গে যদি মেজকাকা বলেন,—"হাতীর তো পাখা হয় না ছবি।" ছবি উত্তর দেয়—"পীতু বলেছে স্বর্গের হাতীদের হয়, তুমি পীতুর চেয়ে বেশি জান? পীতু আমার চেয়েও বড়, মশাই, অনে—ক জানে।" অবশ্য পড়াশোনায় পীতু ছোট। বলে, "ওর মা বলে, তোর কিছু হবে না, পীতু'—মার কথা মিথ্যে হয় না মশাই, পীতু নিজে বলেছে।"—আসলে সব জিনিষ সম্বন্ধেই পীতুর একটি স্বাধীন মতামত আছে। বড়োদের সঙ্গে মেলে না বলেই তার কদর বা গুরুত্ব কানে যায় না। লেখক

বলেছেন—“আমার দীক্ষা ছবির কাছে।” শিশুর জগৎ কেমন করে তাঁকে টানে, প্ররোচিত ও পরিচালিত করে, ভরিয়ে দেয় হৃদয়-মনের প্রতিটি রন্ধ্র। আর সঙ্গে সহজেই মিশে যায় তাঁর শৈশব-ভাবনা ও শৈশব-স্মৃতি। তাঁর শিশু-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় ‘বর্ষায়’ গল্পে শৈলেনের মুখে। সে বলছে—

“সাত-আট বছর বয়েসের একটা মস্ত সুবিধে এই যে, সে সময় বয়স আর অবস্থা সম্বন্ধে কোনো চৈতন্য থাকে না। সুতরাং যাকে মনে ধরে নির্বিবাদে তার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া যায়।”

মেজকাকার কাছে সমস্ত জীবনটাই পরতে পরতে বিস্ময়ে আকীর্ণ। তাই খোড়া থেকে পরম কৌতূহলভরে চেয়ে থাকেন তার দিকে। ‘স্মৃতিমাত্র’ গল্প থেকে আরও জানা যায়—

“সুপ্ত চেতনার ঘুম ভেঙ্গে আমাদের জগতে ধীরে ধীরে জেগে ওঠা—কবে ঠোঁটের কোণে হঠাৎ একটু হাসি ফুটে সঙ্গে সঙ্গেই গেল মিলিয়ে, কবে সেটুকু একটু স্থায়িত্ব পেলে, কখন হাসিতে অশ্রুতে মাখামাখি হয়ে একটি ক্ষণিক শরৎ-মধ্যাহ্ন হল রচিত—তারপর ফুটল উষার কাকলি—জীবনকে অনুভব করছে শিশু, অনুভব করবার তন্তুগুলি ধীরে ধীরে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ গন্ধের মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়ছে—আলো দেখলে চোখে আলো ফোটে, অন্ধকারে আতঙ্ক; মিষ্টি ডাকে হাসি ফোটে, ধমকের ভান করলেই ঠোঁট ফোলে, ভুরু দুটি কুঁচকে ওঠে, নীল চোখ দুটি নীল পদ্মের মতোই জলে ভাসতে থাকে।...কত শিশু এল, কিন্তু দেখে দেখেও অন্ত পাওয়া যায় না রহস্যের। যেন একখানা বই, কিন্তু কী সে মায়া-রচনা, যত পড়ো ততই নূতন।”

এমনই মায়াময় শিশুর জগৎ। সে মায়ায় ‘মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ এ জগৎ।’ বিভূতিভূষণ শিশুর আকর্ষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে ‘স্মৃতিমাত্র’ গল্পেই—

“শিশু ধীরে ধীরে নব-নব মায়া বিস্তার করতে থাকে; কবে দুটি দাঁত হোল, তার নূতন হাসি, কবে পা হোল, তার আনন্দে মাতাল হয়ে চলা, তারপর ক্রমে আরও কত নূতনের মিছিল—অমোঘ আকর্ষণে সবাইকে টানে শিশুর দিকে, কাজ ভুলিয়ে দেয়, আরাম ভুলিয়ে দেয়।”

এমনই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি বিভূতিভূষণের। শিশুর জগৎ তার সমস্ত আকর্ষণ নিয়ে—রহস্য নিয়ে হাতছানি দেয় আর বিভূতিভূষণ তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দিয়ে, মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে শিল্পিত করে তোলেন। হৃদয়ের স্পর্শ ও সৃজনী-প্রতিভায় জীবন্ত করে তোলেন সেই অনাবিল, অনুপম শুভ্র-লীলাময় শিশুর জগৎকে। জীবনকে দেখা ও তাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ পুরোপুরি ভারতীয় বা প্রাচীন ঘেঁষা। অন্ততঃ শিশুর মনস্তাত্ত্বিক রহস্য চিত্রণে তিনি বিদেশী টীকাভাষ্যকে আমল দেননি। সমসাময়িক

অপরাপর গল্পরচয়িতাদের থেকে এখানেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে রয়েছে তাঁর শিশুচিত্ততা, শিশুর মতোই চোখ-কান-মন খুলে তিনি জগৎকে দেখতে অভ্যস্ত। তাতেই তাঁর সুখ, তাতেই তাঁর শান্তি, তাতেই তৃপ্তি। তাই 'পীতু' গল্পে তিনি সবজান্তা পীতুর শিষ্যা ছবির কাছে জগৎকে শিশুর চোখে দেখা, মানা ও উপভোগ করার দীক্ষা নেন। বলেন—

"পীতুও এক ধরণের মায়াবাদী। আমার দৃষ্টিতে আসুক সেই মায়া যাহা পীতুর চক্ষে বুলান আছে। আপনারা বলিবেন, ছবির শিষ্য বলিয়াই আমার এ-ধরণের অভিরুচি; ছবি দিন দিন ওদের কল্পলোকের কাহিনী শুনাইয়া, দৃশ্যজগতের নিত্যনূতন ব্যাখ্যা দিয়া আমাকে, আপনাদের চক্ষে যাহা সত্য, তাহা হইতে স্খলিত করিতেছে। সম্ভব। কিন্তু এই সত্যচ্যুতিতে আমার দুঃখ নাই। এ আমার পরম বিলাস; তাই প্রতিদিনের আপনাদের এই গতানুগতিক জীবনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বারবার পড়া একই কাহিনীর মত জীবন যখন ঠেকে নিতান্ত বিস্বাদ, অনুচ্চাবচ সমতলের মত বৈচিত্র্যহীন, ছবিকে কাছে ডাকিয়া লই, ধানবাদের পীতুর কথা পাড়ি। দেখিতে দেখিতে নীল পাহাড়ের স্তবকে স্তবকে, অসমতল ভূমির তরঙ্গলীলায়, শিশু-শালের বনে আর শরৎকালের স্বচ্ছ-জলে ভরা সাহেব-বাঁধের দীঘিতে ধানবাদ জাগিয়া উঠে। ওসবের মধ্যে যদি থাকেই কিছু কঠোরতা—তো এই তিনশত মাইলের দূরত্বে তাহা যায় গলিয়া মিলাইয়া। অনির্দেশ-সঞ্চরমান দুইটি শিশু পাহাড়ে ঘেরা এবং পাহাড়কেও অতিক্রান্ত করা সমস্ত জায়গাটিকে করিয়া তোলে একটি স্বপ্নপুরী।"

বিভূতিভূষণের এই স্বীকারোক্তি তাঁর শিশুপ্রাণময়তা এবং শিশুর মনস্তত্ত্ব-সাগরে সগৌরব অবগাহনের দলিল স্বরূপ। শিশুর কাজলপরা চোখে এই রূঢ় বাস্তবের জগৎ হয়ে ওঠে 'স্বপ্নপুরী'। আর তাতে বসবাস লেখকের 'পরম বিলাস'। এই বিলাসেই তাঁর জীবন ছিল সহজ, সুন্দর, সরস ও সতেজ। তাঁর জীবন-যাপন, সৃজন-মনন এবং পরিতোষের মূলেও ছিল এই 'বিলাস'। এইখানেই সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বাংলা ছোটগল্পের শিশু মনস্তাত্ত্বিক শাখাটিতে তাঁর এই বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট। সুস্পষ্ট পারিবারিক রসের উপভোগ্যতাও। সে রস দানা বেঁধেছে পরিবার-পরিজন, গৃহভৃত্য, মেজকাকা (লেখক) এবং সর্বোপরি শিশুদের ভাব-ভাবনা, বিশ্বাস ও কল্পনার স্বাতন্ত্র্য ও কলকাকলিকে আশ্রয় করে। তাই বাংলা সাহিত্যের এই শাখায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই নব সংযোজনকে আরও সার্থক ও সুফলপ্রসূ করে তুলবেন তাঁর যথার্থ উত্তরসূরিসমাজ। আমরা সেই প্রত্যাশায় আছি।

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের মানচিত্র

চিত্তরঞ্জন লাহা

পৃথক প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে বিহারবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের দান কোনোক্রমেই অবহেলার যোগ্য নয় এবং এ বাবদে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহঙ্কার আদৌ অতিশয়োক্তি নয়।[১] বাংলা সাহিত্যে বিহারের দানের এই দিকটির তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন অগ্রজ অধ্যাপক প্রয়াত নন্দদুলাল রায়।[২] কিন্তু বিহারের দানপাত্র এখানেই সমাপ্ত বা সম্পূর্ণ নয়। বাংলা সাহিত্যে বিহারের শুধু দান নয়, গৌরবময় যোগদানও আছে। বিভূতি-ভূষণকে কেন্দ্র করে সেই হৃদ্য যোগাযোগের কিছুটা অংশ আলোকিত করাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের মাটি ও মানুষ রমণীয় ও বরণীয় হয়ে আছে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই।[৩] রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলা ও বিহার আজ প্রতিবেশীরূপে পরিচিত হলেও বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রে রাজ্যদুটির অবস্থান অনেকটা 'এক উঠোন দুই বাড়ি'র সমতুল্য।

কথাসাহিত্যের চালচিত্র নির্মাণে বিহারবাসী বাঙালী সাহিত্যিকেরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার মাটিকেই কাজে লাগিয়েছেন। সেই মৃত্তিকাসংলগ্ন বিহারবাসী মানুষজন সেই সুবাদেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। পরিণামে বিস্তৃত হয়েছে বাংলার মানসিক ভূখণ্ড, বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে সেখানের মানুষের মিছিলে, শোভা সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভাণ্ডার।

শরৎচন্দ্র বা বনফুলের রচনায় ভাগলপুরের মাটি ও মানুষ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় বিহারের অরণ্যভূমি এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় মিথিলার মাটি ও মানুষ বাংলার সাহিত্য স্বর্গের অক্ষয় অধিকার লাভ করেছে।

মিথিলার সঙ্গে বাংলার সেতুবন্ধনের আদিস্থপতি বিদ্যাপতি, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এ বাবদে সর্বাধুনিক বাস্তুকার। তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস

'স্বর্গাদপি গরীয়সী'তে বাংলার সঙ্গে মিথিলার তৎকালীন সমাজের যে অন্তরঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত তার মূল্য ও মহিমা অসামান্য। মিথিলা বিভূতিভূষণের কাছে, সাক্ষাৎ 'মা জানকীর দেশ' এবং অবশ্যই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

এক দেশের ফল অপর দেশের মাটিতে গিয়ে রূপে রসে স্বাদে কিছু না কিছু পরিবর্তন অবশ্যই লাভ করে থাকে। আসলে এটা লাভ না লোকসান সে প্রসঙ্গ পৃথক কিন্তু সে পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী স্বীকার্য শুধু সেইটুকুই। প্রকৃতিজগতের এই সংবাদটি প্রাণীজগতেরও সত্য। জন্মগত পরিবেশের প্রভাবে জাতিগত পরিচয়ের ধর্মান্তর না ঘটলেও জন্মান্তর ঘটে। জন্মসূত্রে লব্ধ প্রিয়-পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্নতাই 'বিদেশ'। মানুষের জীবনে ভূগোলের প্রভাব যে কত গভীর ও নিবিড় নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাটিতে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণ সেকথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন এবং সেই সূত্রেই তাঁর আন্তরিক উচ্চারণ "বাঙলা আমার চেয়ে বেশি করে বিনয় ঝার বাঙলা; মিথিলা ওর চেয়ে বেশি করে আমার মিথিলা।" স্মরণীয় যে, 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি'তে উল্লিখিত মুর্শিদাবাদের মৈথিলী ব্রাহ্মণ এই বিনয় ঝা চাকরির সন্ধানে মূলভূমি দ্বারভাঙ্গায় এসে প্রবাস-যন্ত্রণা অনুভব করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বাংলার নিজ-ভূমে দাঁড়িয়ে প্রাণবায়ু ফিরে পেয়েছিল। আঞ্চলিকতাবাদের উগ্র প্রবক্তাদের একথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে যে, মানুষ জন্মসূত্রে বা কর্মসূত্রে কোনো অঞ্চলবিশেষে দীর্ঘকাল বাস করার ফলে সেই অঞ্চলের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রমেই অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে এবং যে কোনো কারণে সেই মায়াবন্ধন ছিন্ন করায় দুঃসহ লগ্নটি যখন দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় তখন অনিবার্য কারণেই মাতৃবিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করে। বিভূতিভূষণ মিথিলার মাটিতে দীর্ঘদিন বসবাসকারী বাঙ্গালী পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন যাঁরা, বোধকরি তাঁদের অজ্ঞাতসারেই, এই অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে পড়েছেন। ভাগলপুর, সাহরসা অঞ্চলের বহু বাঙ্গালী পরিবার মূল ভূমির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বাসভূমিকেই যথার্থ মাতৃভূমি বলে মেনে নিয়েছেন। 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি'তে লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় এই রূপান্তরের একটি অপরূপ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। মূলতঃ বাঙ্গালী পরিবারের ছেলে মোটরে বাঙ্গালী দেখে মাকে এসে জানিয়েছে—"মাইগে, বাঙ্গালিয়া সবকে দেখলি! তিন গোটে ছলেই গে। পুছলকেই—'বঙলা বোলিতে পারো?' হম কহলিয়েই—'হুঁ হামি পারে। সচ্চে গে, তোহর কিরিয়া।" এই রূপান্তরের পথে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালী ভদ্রলোক যখন নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "দেবেন্দর নাথ—উর সাথে মুকুর্জিভি আছে" তখন কিঞ্চিৎ কৌতুকরসে আক্রান্ত হলেও শিশুর মুখে ঠাকুরের প্রসাদ যখন 'ভগবানজীর পরসাদি' হয়ে দেখা দেয় তখন স্পষ্ট অনুমান করতে পারি যে, এই রূপান্তর সার্বিক এবং সম্পূর্ণ। কিন্তু রা পালটালেও কপাল বদলায় না। ট্র্যাজেডিটা

এখানেই। বিভূতিভূষণ সেই ট্রাজেডিকেও তুলে ধরেছেন 'ডোমিসাইল্ড' গল্পে। একদা বাঙালী অথচ পুরুষানুক্রমে বিহারবাসী বলে যারা মনেপ্রাণে বিহারী, বিহারের সংস্কার-সংস্কৃতির সঙ্গে যারা এক এবং অভিন্ন আইনের কূটকচালিতে তাদের আজও পৃথগন্ন করে রাখার ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে। 'ডোমিসাইল্ড' গল্পে বিহারবাসী বাঙালীর এই দুর্ভাগ্যের রেখাচিত্র। পুরুষানুক্রমে বিহারের অধিবাসী ললিতমোহন ডোমিসাইলের একটি সামান্য শর্ত-বিচ্যুতির ফলে ডেপুটির চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসে বিহারের—বিশেষতঃ মিথিলাঞ্চলের মাটি ও মানুষের রাজকীয় সমারোহ, ঐশ্বর্যময় মিছিল। তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বাংলার সঙ্গে মিথিলার সাংস্কৃতিক স্মৃতিবন্ধন। বাংলার কন্যা গিরিবালা বধূবেশে এসেছে 'মা জানকীর দেশে,' ভালোবেসেছে এখানের মাটি ও মানুষকে। বধূবরণ অনুষ্ঠানের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাংলা ও মিথিলার সংস্কার-সংস্কৃতির পার্থক্যটুকু কৌতুক কটাক্ষ সহযোগে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বধূবরণ অনুষ্ঠানে বঙ্গললনারা উলু ও শঙ্খধ্বনি দিয়েছে, মিথিলার পুরাঙ্গনাগণ চিরাচরিত প্রথায় গীতের মালা গেঁথেছে। স্বাভাবিকভাবেই একের রীতিপদ্ধতি অপরের কাছে বিসদৃশ ঠেকেছে। বাঙালী কন্যা বলেছে, "ই: হসৈছি কিয়্যা? আঁহা লোকৈন্—আহে-মাহে কি গবৈৎ যাইছি (ইস্ হাসছ কি? তোমরাই বা আগড়ম বাগড়ম কি গাইছ?)?" মৈথিল কন্যা উত্তরে বলেছে, "ই ত মনুখ্যক্ গীত ছিয়েই হে, আঁহা লোকৈন গিদড় ক্ঁকা কি হুকি পাড়ৈৎছি? (এ তো মানুষের গান গো, তোমরা শিয়ালের ডাক কি তুলেছ?)" স্মরণীয় যে, নারীকণ্ঠগীতি বিহারের বিবাহ অনুষ্ঠানের এক অপরিহার্য ও আনন্দময় অঙ্গ। এই আত্মজৈবনিক উপন্যাসটিতে তৎকালীন পাণ্ডুলের সমাজচিত্রের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা আছে, আছে তৎকালীন দ্বারভাঙ্গার ঐশ্বর্য ও বৈশিষ্ট্যের অনুরাগদীপ্ত পরিচয়। লেখক বঙ্গসরস্বতীর আরাধনা করলেও সেই দেবীর পাদপীঠ যে মিথিলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে তার পরিচয় বারংবার পাই। হিন্দী ও বাংলায় একই শব্দের পৃথক অর্থকে কেন্দ্র করে যে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন লেখক ক্ষেত্রবিশেষে তা অনর্থক কলহেরও কারক হয়ে দাঁড়ায়। 'নয়কী দুলহীন' গিরিবালার মুখে 'ঘুমব' কথাটি শুনে মিথিলার কন্যারা ভ্রমণ করার ইচ্ছার অর্থে গ্রহণ করে কপট গাম্ভীর্য প্রকাশ করেছে।

শুধু মিথিলার মাটি বা মানুষ নয় মৈথিল ভাষার প্রতিও লেখকের আকর্ষণ দুর্মর ও দুর্বার। এই ভাষাটির প্রতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের প্রমাণ সুপ্রচুর।[৪] বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে মৈথিলী এবং বাংলা একই বৃন্তের দুটি ফুল —রূপে রসে গন্ধে অবিকল ও অপরূপ। বিভূতিভূষণের আন্তরিক অনুভব ও

অকপট উচ্চারণ "...মৈথিল ভাষা শোনাও তো সঙ্গীত শোনাই। বাংলার সহোদরা,—ঐরকম নরম, ঐরকম মিষ্টি; শুধু সহোদরাই নয়, সংস্কৃত মায়ের যমজ মেয়ে দুটি; এক মুখ, এক চোখ, এক গড়ন, এক চলন।" 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি'তে পুরাণ কথা, জীবন কথা, সমাজ কথা ইত্যাদি অনেক কথাই আছে—কিন্তু সর্বোপরি আছে অফুরাণ ভালোবাসা ও ভালোলাগার কথা। পত্রলেখক এই প্রাঙ্গণের পদপ্রান্তে চিরপ্রণত।

আমাদের এক বাস্তুকার কবি হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে জলের করুণ আর্তি এবং মাঠের কান্না শুনে আনমনা হয়ে পড়েছিলেন, তাই হাটে হাটে ঘোরাই তাঁর সার হল' হাট করা আর হল না। বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গে কথাটা মনে পড়ার কারণ আছে। বিভূতিভূষণও যেখানেই যান না কেন মনটাকে বন্ধক রেখে যান বাস্তুভূমির কাছে। মিথিলার মাটির প্রতি তাঁর মধুর মমতার ও অপরূপ আকর্ষণের আত্ম-স্বীকারোক্তি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতির প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন। কুশীপ্রাঙ্গণের পথ পরিক্রমায় মেহসী-বনগাঁও এলাকার মাটিতে পা রেখে এক বুক ভালোবাসা এবং দুচোখ ভরা ভালোলাগা নিয়ে তিনি বলেছেন, "...জায়গাটার আমাদের ওদিকের সঙ্গে একটা মস্ত বড় মিল আছে। থাকবারই কথা, কেননা দুটোই তো মিথিলা, আর একেবারে নিজ-মিথিলা। কিন্তু এর মধ্যে অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গা থেকে বেরিয়ে এই এখানে এসে পৌঁছানোর মধ্যে যে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে, অনেক ছাপ পড়েছে মনে—মানভূম, পঞ্চকোট পাহাড়ের গোড়ায় গৌরাঙ্গসেবা-সঙ্ঘের সেই উৎসব সমারোহ, তারপর শিবপুর কলকাতার অতি ক্ষিপ্র জীবন, কয়েকটা দিনের মধ্যে কয়েকটা মাসকে যেন কুলিয়ে নেওয়া কোনরকমে, তারপর ভাগলপুর, জামালপুর —একটা চরখিবাজির মতন ঘুরে সাহারসায় এসে বসেছি। অবশ্য আবার মিথিলাতেই, কিন্তু কুশী যে তার সব চিহ্ন লোপ করে দিয়েছে ওদিকটায়। ঘরছাড়া বাঙালীর মন, এই সমস্ত অভিযানের মধ্যে অন্তরে অন্তরে যে ঘরকেই এসেছি খুঁজে;—সেই গাছপালা আমবাগান, সেই সবুজে ঢাকা ভিজে মাটি, সেই মাঠের পর গ্রাম, গ্রামের পর মাঠ, সেই পল্লীদেবতা বড়ঠাকুরের আস্তানা, সেই মিষ্টি নরম মুখ, সেই মিষ্টি ভাষা।......আমি জাতিস্মরই হয়েছি এক হিসেবে। মাঝখানে এই দুটো মাস ধরে আমার একটা মৃত্যু ঘটেছিল—অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির তীব্রতার অনুপাতে সব ঘর ছাড়াদেরই ঘটে,—আবার আমি নিজের পরিবেশে, নিজের জীবনে ফিরে এসেছি।" যে সমস্ত বঙ্গভাষী মানুষ নিছক রুজিরোজগারের ধান্দায় এ প্রান্তে এসেছেন এবং কাঙ্ক্ষিত ধন সংগ্রহ করে কোলকাতার কোনো অভিজাত এলাকার ফ্ল্যাটে পরম নিশ্চিন্ত অবসর জীবন যাপন করার স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা বিভূতিভূষণের এই স্বীকারোক্তির মর্মরহস্যের সন্ধান পাবেন না; কিন্তু যাঁরা পুরুষানুক্রমে এখানেই বাস করে আছেন, যাঁরা

এখানের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে গিয়েছেন বিভূতিভূষণের উক্তি ও অনুভবের সঙ্গে নিজ নিজ অনুভূতির সাযুজ্য স্বীকার করতে তাঁরা অবশ্যই বাধ্য হবেন। যদি কোনো কারণে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কোনো মানুষ কোনোদিন বাধ্য হয় তথাকথিত মূল ভূমিতে আশ্রয় নিতে তাহলে আশ্রয়হীনতার দুঃখ সে যে মর্মে মর্মে অনুভব করবে সে কথা শপথ করে বলা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন, "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। কথাটি এক গভীর সত্যের একপিঠ মাত্র, ও পিঠটা হল—বন্যের কাছে বনই সুন্দর, শিশুর কাছে মাতৃক্রোড়।

বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে খুব স্বাভাবিক কারণেই বিহারের মাটি ও মানুষ, তার প্রকৃতি ও সংস্কৃতি এক উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়'-তে পূর্ণিয়ার সঙ্গে রাঁচিরও চালচিত্র আছে এবং সেই চালচিত্রের দৃশ্যসজ্জায় লেখকের শিল্পবোধের সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠার পর্যাপ্ত পরিচয়ও আছে। 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপটেও বিহার, প্রারম্ভিক অকুস্থল ঝাঝা ও শিমূলতলার মধ্যবর্তী স্থান। স্থানীয় মানুষ সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, সংস্কার—মায় মুখের ভাষাটুকুও সুন্দর ও সজীব হয়ে ধরা পড়েছে এখানে। লেখকের পর্যবেক্ষণ শক্তির নিপুণতায় এবং তথ্যচিত্রণের সততায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত হতে হয়। বাংলার মেয়েরা জলভরা কলসী নেয় কাঁখে, এখানের মেয়েরা নেয় মাথায়—ইত্যাদি অতিসাধারণ তথ্য ও দৃশ্যগুলিও লেখকের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করেনি।

বিহারের লোকায়ত মানুষের মুখের ভাষা এবং বুকের আনন্দব্যথাকে বাংলা কথাসাহিত্য চিরদিনই সস্নেহ কৌতুকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। এই প্রশ্রয়পাত্রে তাদের কণ্ঠসঙ্গীতটিকেও সযত্নে তুলে রাখার প্রয়াস করা হয়েছে। ভূতের মুখে রামনাম যত অবিশ্বাস্যই হোক না কেন পরশুরামের প্রশ্রয়পুষ্ট বিহারের ভূতের মুখে শ্রুত ভোজপুরী সঙ্গীতটির উপভোগ্যতায় এবং তার সুরমূর্ছনায় ব্যঞ্জিত জন্মান্তরের স্মৃতিবেদনার আন্তরিকতায় কিছুতেই অবিশ্বাস করা চলে না। এই প্রশ্রয়দাতাদের তালিকায় বিভূতিভূষণের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর 'রাণুর প্রথম ভাগ' গ্রন্থের 'গজভুক্ত' গল্পে নন্দর "বাড়ির দারোয়ান রামবৃছ দুবে বর্ষাজনিত ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে দক্ষিণ হস্তের উপর হাত চাপিয়া ও বাম চক্ষুটা প্রাণপণে বুজিয়া হাঁ—আঁ—আঁ করিয়া সবেমাত্র তাহার ছাপরেয়ে মল্লারের তান উঠাইতে যাইতেছিল" —কিন্তু শচীনাথের হঠাৎ আগমনে গানটি তার গাওয়া হল না এবং পাঠকও একটি ভোজপুরী সঙ্গীত শ্রবণের সুযোগ পেলেন না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিভূতিভূষণের রচনায় মৈথিল চিত্র ও চরিত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও বাঙ্গালী বাবুদের দ্বাররক্ষক নির্বাচনে তিনি কিন্তু ভোজপুরকে প্রাথমিকতা দিয়েছেন। স্বীকার্য যে, এই নির্বাচন রীতিটি বিভূতিভূষণের নিজস্ব নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই এটা প্রথাসিদ্ধরূপে চলে আসছে। যাই হোক,

'গজভুক্ত' গল্পের রামবৃহ্ যে প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল 'বিয়ের ফুল' গল্পের পশ্চিমা চাকর তা আশাতীতরূপেই পূর্ণ করেছে। তার গানটি এই রকম—

"কলকতিযাকে লোগনিকে নহি পতিয়ইহ
সমুরহু সমুরহু সখি বাটঘাট যাইহ।"

"অর্থাৎ হে সখি, কলিকাতার লোককে প্রত্যয় নাই, অতএব পথঘাট চলিবে খুব সামলাইয়া।" বাংলা হিন্দী মিশিয়ে নিজের নাম ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে গায়ক বলেছে, "হামার নাম রামটহলবা আসে, হামায় ঠকিয়ে কাপড লিতে আসে তুম?" আকস্মিক উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষ মাতৃভাষারই শরণাপন্ন হয় এবং গোপাল ভাঁড ও নিয়মটিব যথাযথ প্রয়োগ করে নির্ভুল উত্তর ও নিশ্চিত ফললাভ করেছিলেন। বিভূতিবাবুর গল্পেও দেখি আকস্মিক উত্তেজনার মুহূর্তে রামটহল মাতৃভাষায় সরব হয়েছে। "রামতনুর উদ্যত ঘুষির নিম্ন হইতে তডিতের ন্যায় সরিয়া গিয়া মাঝ রাস্তায় বৃষ্টি মাথায় করিয়া রামটহলবা আর্তস্বরে ডাকিয়া উঠিল, "খুন ভইল, দৌড হো, ডাকু পডল বা।" একটি কৌতুকপ্রদ তথ্য এই যে, এই-সব চরিত্রের পৌরুষদীপ্ত চেহারার অন্তরালে প্রায় অবিশ্বাস্য ভীরুতাকে অবলম্বন করে হাস্যরসসৃষ্টিতে মিথিলার বিভূতিভূষণের উৎসাহ এবং উৎকর্ষ ভাগলপুরের শরৎচন্দ্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, রাণুর প্রথম ভাগের চালচিত্রট মিথিলার নয়, বাংলার। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "মাটি এবং মন লইয়া দেশ। বাংলাদেশের মাটি বড ভিজা এবং মন বড অশ্রুসিক্ত।" সেই অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলে হাসির নক্শা কাটাই লেখকের লক্ষ্য। তিনি যে ব্যর্থ হননি সে কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, বলার কথা শুধু এই যে, যেখানে চালচিত্রট মূলতঃ এবং প্রধানতঃ বাংলার সেখানেও বিভূতিভূষণ বিহারের চিত্র বা চরিত্রকে পরিহার করেননি।

রাণুর দ্বিতীয়ভাগের বেশ কয়েকটি গল্পের চালচিত্রে বিহারকেই প্রত্যক্ষ করি। এই অঞ্চলের মায়ের প্রতি শিশুর প্রিয় সম্বোধন পদটি ("মৈয়া") স্নেহের ভাইঝির প্রতি প্রয়োগ করে লেখক প্রমাণ করেছেন যে এ ভাষার সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে তাঁর 'শ্রুতি পরিপূরিত' এবং ক্ষেত্রবিশেষ কণ্ঠও সরব এবং সোচ্চার।

'শিক্ষা সঙ্কট' গল্পের পটভূমিকা বি. এন. ডব্লিউ. আর-এর একটি ছোট্ট স্টেশন। সেখানে বাঙালীর সংখ্যা নগণ্য এবং যাঁরা আছেন তাঁরা মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। এখানে মাটির আকর্ষণে অন্তঃপুরিকাদের চরিত্রেও অভাবিত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বাঙালী মহিলারাও তামাকু সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং শুধুমাত্র এই বস্তুটির অভাবেই বাংলা মুলুকে গিয়ে তিনদিনও তাঁদের পক্ষে থাকা সম্ভব হয় না। 'ভূমিকম্প' গল্পটির পটভূমিকায় বিহারের ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ স্মৃতি। আসলে রাণুর কথামালার বহু ফুলের (এবং সেইসঙ্গে কাঁটারও) বিলাসভূমি বাংলা নয়, বিহার।

বিহারের রীতিনীতি, সংস্কার বিশ্বাস, আচার আচরণ, আশা আকাঙ্ক্ষার এক বর্ণাঢ্য লিপিচিত্র বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে। বিহারের দুটি রাজপুত পরিবারের বনেদিয়ানার উৎকট প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে তাঁর 'কুইট ইণ্ডিয়া' গল্পটি। গল্পটি একই সঙ্গে রসসাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাস। সে ইতিহাস অদ্যাপি মধ্যযুগীয় আকাঙ্ক্ষা ও অহংকার নিয়ে বিহারের মাটিতে প্রবলভাবে বিরাজমান। 'বিপন্ন' গল্পে বাংলার প্রতি বিহারের শ্রদ্ধাটুকু আমাদের অহংবোধকে অবশ্যই তৃপ্ত করে। 'মাতৃপূজা', 'বন্য ও বন্যা', 'সত্যাগ্রহী', 'উমেশকো বোহীন', 'গণেশ জননী', 'শহুরে', 'জামাইষষ্ঠী' ইত্যাদি গল্পের ঠিকানা বিহারের মানচিত্রে। শেষোক্ত গল্পে রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর মুখে উচ্চারিত সংলাপ ("আসমানকে বিজলি বাতু?")—এর ভাষা মৈথিল নয়, ভোজপুরী। প্রারম্ভে বলেছি বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের মানচিত্রে এবং তাঁর মনের ভূগোলে মিথিলার মাটি ও মানুষের বর্ণাঢ্য মিছিল। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রতিবেশী ভাষাঞ্চলটিও তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে থাকেনি। ছাপরার মাটি ও মানুষ মাঝে মাঝেই মুখ তুলে তাকিয়েছে মা জানকীর দেশের সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে। প্রসঙ্গতঃ তাঁর 'বরযাত্রী' ও 'বাসর' গল্পগুলির কথা স্মরণীয়। গল্পগুলির মালিকানা স্বত্ব যে ছয় বন্ধুর হাতে তাঁদের অন্যতম কে. গুপ্তের বাড়ি ছাপরায়। 'বরযাত্রী' গল্পে গণশা কে. গুপ্তকে ছাতুর দেশের লোক বলে উপহাস করেছে। 'অবশেষে' গণশার ছেলের মুখেভাতে কে গুপ্তের দেওয়া জাঙ্গিয়া দেখে গণশার বৌ পুঁটুরানী পরিহাস করে বলেছে—'দিব্যি ছাপরেয়ে ছাপরেয়ে হয়েছে'।

কেন এ কে জানে!

সরোজ দত্ত

লেখক হিসেবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ১৩২২ সালের আষাঢ় মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত "অবিচার" গল্পটির মধ্য দিয়ে, আর জীবনের একেবারে শেষদিকে, ১৩৯৩-এর কয়েকটি কয়েকটি শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত ছোট গল্প তাঁর সাহিত্য প্রয়াসের শেষ নিদর্শন। এই সময়কার আরও কিছু রচনার কথাও আমাদের জানা আছে, যে-সব রচনা এখনও অপ্রকাশিত। ৭০-৭২ বছরব্যাপী এই নিরন্তর সাহিত্যসাধনার সম্ভবতঃ দ্বিতীয় কোনো নজীর নেই। আবার জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩-তে প্রকাশিত তাঁব সর্বশেষ উপন্যাস "সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে"র কথা যদি মনে রাখি, তা হলেও অবাক হতে হয়—৯২ বছর বয়সে পৃথিবীর কোনো ঔপন্যাসিক কোনো উপন্যাস লেখেননি। এইরকম আরো অনেক দিক থেকেই বিভূতিভূষণ একক। এমন কোনো নজীরও কি আছে যে, কোনো লেখকের জীবিত অবস্থাতেই তাঁর সাহিত্যকর্ম দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার বিষয় হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে শুধু নয়, কয়েকজন গবেষক সফলও হয়েছেন? কেউ এককভাবে বিভূতিভূষণের সাহিত্যকৃতিকে তাঁর বিষয় করেছেন, আবার কারো গবেষণাপত্রে বিভূতিভূষণ অধিকার ক'রে আছেন মুখ্য অংশ। কেউ কেউ আজও গবেষণা ক'রে চলেছেন বিভূতিভূষণের রচনা অবলম্বন ক'রে। তাঁর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাপত্রগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে নীচের বিবরণ থেকে—

(১) বিভূতিভূষণ সম্পর্কে গবেষণায় ইতিমধ্যেই যাঁরা সাফল্যলাভ করেছেন :

বিষয় : ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
গবেষক : ড. অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
তত্ত্বাবধায়ক : ড. বেলা সেনগুপ্ত।
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয় : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য।
গবেষক : ড. শিপ্রা চৌধুরী।
তত্ত্বাবধায়ক : ড. সরোজকুমার বসু।
রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয় : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় বিহার।
গবেষক : ড. সুজলা চট্টোপাধ্যায়।
তত্ত্বাবধায়ক : ড. মঞ্জুলী ঘোষ।
বিহার বিশ্ববিদ্যালয়।

(২) যাঁদের সফল গবেষণাপত্রে বিভূতিভূষণ অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত :
বিষয় : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে উত্তর বিহার।
গবেষক : ড. বিপিন মিশ্র।
তত্ত্বাবধায়ক : ড. অরুণা মাধব।
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয় : বাংলা হাস্যরসের চার শিল্পী (কেদারনাথ, রাজশেখর, পরিমল গোস্বামী ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)।
গবেষক : ড. শান্তিপ্রিয় সমাদ্দার।
তত্ত্বাবধায়ক : ড. নির্মলকুমার দাশ।
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩) এখনও গবেষণা-রত :
বিষয় : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে হাস্যরস।
গবেষক : শ্রীবাদল মণ্ডল।
তত্ত্বাবধায়ক : ড. অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

এর বাইরে, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র তত্ত্বাবধানে, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাফল্যলাভ করেছে বিভূতিভূষণ সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্র; আর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দত্ত-র Dissertation-এর বিষয় "বিভূতিভূষণের ছোটগল্প"। এঁদের সবার কথা-ই বিভূতিভূষণ জেনে গিয়েছেন। শোনা গিয়েছে আরো দু'জন বর্তমানে বিভূতিভূষণকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন— তাঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানা নেই।

বিভূতিভূষণ সম্পর্কিত সফল গবেষণাপত্রগুলির মধ্যে এ পর্যন্ত একটিই মাত্র

গ্রন্থরূপ লাভ করেছে। বাকিগুলি প্রকাশিত হ'লে বিভূতিভূষণকে নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হবে। যদিও গবেষণা জগতের বাইরে বিভূতিভূষণ সম্পর্কিত কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থের কথা আমাদের জানা নেই, তবে তাঁকে নিয়ে, তাঁর জীবিতকালে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাগুলি অলভ্য না হলেও দুষ্প্রাপ্য ব'লে সেগুলির প্রয়োজনীয় বিবরণ জানিয়ে রাখি—

কথাসাহিত্য [কলকাতা], জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ / সম্পাদক: সুমথনাথ ঘোষ ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

সূচী—

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় —রাজশেখর বসু
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (ক)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
সুরসিক বিভূতিভূষণ —বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সাহিত্যসুহৃদ শ্রীবিভূতিভূষণ
মুখোপাধ্যায়ের করকমলে (ক) —নরেন্দ্র দেব
বিভূতি প্রসঙ্গে —অপূর্বমণি দত্ত
কথাশিল্পী (ক)—সুশীলকুমার দে
বিভূতির প্রতি (ক)—কালিদাস রায়
কোন হাস্যরসিক —বাণী রায়
বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে —বনফুল
প্রণয়ের ধারাপাত শিখায়েছ
প্রথম কিশোরে —অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় —লীলা মজুমদার
বিভূতিভূষণ —প্রবোধকুমার সান্যাল
সংবর্ধনা — নলিনীকান্ত সরকার
সহৃদয় বিভূতিভূষণ —নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (ক)—সুনির্মল বসু
বিভূতিভূষণ —মনোজ বসু
বিভূতিভূষণের নীলাঙ্গুরীয় —কল্যাণী প্রামাণিক
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
কথাশিল্পীর করকমলে —কৃষ্ণধন দে
বিভূতিভূষণের শিল্পদৃষ্টি —জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বিভূতি মুখুজ্জের গল্প —নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে —তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণের সরস গল্প —প্রমথনাথ বিশী

সাহিত্যে হাস্যরস ও বিভূতিভূষণ—উমা দেবী
জীবনরসিক বিভূতিভূষণ —ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যক্তিগত —গজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু (ক)—সজনীকান্ত দাস
নূতন পথিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—আশাপূর্ণা দেবী
হাস্যরসিক বিভূতিভূষণ —মন্মথনাথ ঘোষ
'তুয়ার থেকে সুদূরে' —সন্তোষকুমার দে
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

শাশ্বত বাণী [মজঃফরপুর] পৌষ ১৩৮৮/সম্পাদক : প্রলয় মজুমদার।
সূচী—
আমাদের মেজকাকা —অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—[শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়]
বিভূতিভূষণের শিল্পশৈলী কায়কল্প ও ভাষা
—ডঃ অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
যেটুকু দেখেছি যেটুকু জেনেছি —উর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়
নাম বিভ্রাট —কল্যাণী মজুমদার
বৈদেহী বিভূতিভূষণ —মণিপদ্ম
আমার মেজদাদু —অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় :
মানস গঠন ও মনোধর্ম —সরোজকুমার বসু
সাক্ষাৎকার —কুমারেশ ঘোষ
বিভূতিভূষণ—রাণু কাহিনীর আলোকে—শিউলী ভট্টাচার্য
ব্যক্তি বিভূতিভূষণ পরমাত্মীয়
বিভূতিভূষণ মানুষ বিভূতিভূষণ—রামকৃষ্ণ রায়
পোস্থর চিঠি—মূল্যায়ন প্রচেষ্টা—মনীষা দত্ত
সৌহার্দ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি (ক)—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
ওরা চলে গেলে [বিভূতিভূষণকে নিবেদিত একটি কবিতা]
—গৌরাঙ্গ সিকদার
আমাদের মেজকাকা —শঙ্কর পালিত
ইতিবৃত্ত বিভূতিভূষণ —সমীর রায়চৌধুরী
[এই বিশেষ সংখ্যাটিতে বিভূতিভূষণকে লেখা কেদারনাথের ১১টি, মোহিত-

লালের ৬টি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-র ৩টি সম্পূর্ণ ও কয়েকটি আংশিক এবং কেদারনাথকে লেখা বিভূতিভূষণের ১টি চিঠি সঙ্কলিত; সঙ্কলন করেছেন শ্রীপ্রলয় মজুমদার]।

সৌরভ [সমস্তিপুর] ১৩৯২ / সম্পাদক : আশিস সেন।
সূচী—
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, একটি নাম—গীতা দাশগুপ্ত
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য
দধীচি স্মরণে—ডা. শান্তসুন্দর নন্দী
বেলা শেষের ছায়া—সরোজ দত্ত
বাৎসল্যরসের শিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ—[সাক্ষাৎকার] সমরজিৎ বিশ্বাস
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যশৈলী—ড. মঞ্জুলী ঘোষ
নারী প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ—[সাক্ষাৎকার] শঙ্কর ভট্টাচার্য

লেখক-লেখিকাদের নামগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সরোজকুমার বসু, মণিপদ্ম প্রমুখের সঙ্গে বিভূতিভূষণের সমকালীন এবং উত্তরকালীন এমন অনেকেই আছেন যাঁরা রীতিমতো বিশিষ্ট। এর অধিকাংশ রচনাই ব্যক্তি বিভূতিভূষণ সম্পর্কে, তাঁর সাহিত্যসম্ভারকে ছুঁয়েই, প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন; আর সেইসূত্রে কখনো হয়তো আছে লেখক বিভূতিভূষণ সম্পর্কে কিছু দিক্‌দর্শী চকিত মন্তব্য। ঠিক সেই কারণেই, এই লেখাগুলির সাহায্য নিয়ে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ সম্পর্কে যেমন কোনো পরিপূর্ণ ধারণা গ'ড়ে ওঠে না; তেমনি নিজস্ব কোনো ধারণাকে যাচাই ক'রে নেবার সুযোগও থাকে না পাঠকের। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সমালোচকেরা এক্ষেত্রে পাঠকের সহায় হ'তে পারতেন।

বিভূতিভূষণের রচনা সম্ভার সত্যিই বিপুল। তাঁর গ্রন্থপঞ্জীটি বেশ স্ফীত—এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১১২। এদের মধ্যে ১৩৯৩তেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ৫টি গ্রন্থ। মিত্র ঘোষ প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনাবলীর ১০ম খণ্ড (শ্রাবণ ১৩৯৩); মডেল পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে "জামাইষষ্ঠী" আর "তিল তাল তালশাঁস" নামে ২টি গল্প সঙ্কলন, এবং তাঁর গল্প সমগ্র-র প্রথম খণ্ড—৩টিরই প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৯৩; আর দে'জ পাবলিশিং প্রকাশ করেছেন তাঁর একটি উপন্যাস—"সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩)। এ-গুলির মধ্যে রচনাবলী ১০ম খণ্ড, গল্প সমগ্র-র ১ম খণ্ড এবং জামাইষষ্ঠী পুনর্মুদ্রণের বিভাগে পড়ে; কিন্তু তিল তাল তালশাঁস তাঁর সদ্যঅতীতে প্রকাশিত কয়েকটি গল্পের সঙ্কলন এবং উপন্যাসটিরও এটি প্রথম প্রকাশ। মনে

করাটা নিশ্চয়ই ভুল নয় যে প্রকাশকেরা তাঁর কথা শুধু ভাবেন নয় বেশ ভালোরকমই ভাবেন এবং প্রকাশকেরা নিশ্চয়ই পাঠক নিরপেক্ষ নন। কথাসাহিত্য (পৌষ ১৩৯৪) পত্রিকায় মনোজ বসু-র স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র-র একটি উক্তি স্মরণে রাখা ভালো—"আমাদের দেশের পাঠকরা ছোটগল্প পড়েন তবে মনে হয় ওগুলোকে ওঁরা পাদপূরণের মধ্যে ধরেন। নইলে গল্প সংগ্রহগুলি তেমন বিক্রী হয় না কেন? রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিন—একালে একমাত্র বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখোপাধ্যায় (তাও মুখোপাধ্যায় তুলনায় কম) মশাই ছাড়া খুব একটা বিক্রী কোনটারই হয় না। এমন কি ছোটগল্পের অসাধারণ অনন্য শিল্পী বনফুলের গল্পের বইও আজকাল কাউকে খোঁজ করতে দেখি না।" (পৃ. ৩৭১)। সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র যে মিত্র-ঘোষ প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত এটা অনেকেই জানেন।

দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে বিভূতিভূষণের স্বীকৃতির আরো একটা দিক আছে। ঘরোয়া আসর থেকে শুরু করে, সরকারী উদ্যোগে বা বিখ্যাত সব প্রতিষ্ঠান থেকে অজস্র সম্মান-সংবর্ধনা বিভূতিভূষণ পেয়েছেন। হাওড়া সংস্কৃতি পরিষদ থেকে আরম্ভ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বাঙলা একাডেমি (পশ্চিমবঙ্গ) বা শরৎ সমিতির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনার আসরেও তিনি সমাদৃত। আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারের তিনি অন্যতম প্রাপক। শরৎ সমিতির দেওয়া শরৎ পুরস্কার তিনিই প্রথম পেয়েছেন, যেমন তারাচরণ বসু স্মৃতি পুরস্কারও তাঁকেই প্রথম দেওয়া হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী থেকে তাঁকে সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট. এবং বিশ্বভারতী থেকে 'দেশিকোত্তম' পাওয়া তাঁর শেষ জীবনের ঘটনা। অন্যদিকে, তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি হিসাবে বিহার রাজ্য সরকার তাঁকে নিয়মিত একটি সম্মান দক্ষিণা দিতেন। বিহারের বাঙলা একাডেমির তিনি প্রথম চেয়ারম্যান (অবৈতনিক)। তাঁর ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিহারের ৯০টি সংস্থা মিলিতভাবে ১৩৮৪-র অক্টোবর মাসে তাঁকে যে সংবর্ধনা জানায়, ঘটনা হিসেবে সেটা বোধহয় অভূতপূর্ব। আরও একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা বিভূতিভূষণের জীবনে আছে। তা হ'ল বিভিন্ন সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪বার স্বীকৃতি জানিয়েছেন বিভূতিভূষণকে। ১৯৫৭-তে তাঁকে শরৎ স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানানো হয় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে; ১৯৬৫-তে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি দিয়েছিলেন শরৎস্মৃতি বক্তৃতা; ১৯৭৩-এ তিনি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান জগত্তারিণী পদক এবং ১৯৭৫-এ তাঁর ডাক আসে ডি. এল. রায় রীডারশিপ বক্তৃতা দেবার

জন্য ঐ ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই।

একজন দীর্ঘায়ু রসস্রষ্টার পক্ষে বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কার পাওয়া, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিলাভ কিছু অভাবিত ঘটনা নয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক খেতাবও তিনি পেতে পারেন। সেদিক থেকে শরৎ স্মৃতি পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক, তারাচরণ বসু স্মৃতি পুরস্কার, হরনাথ বসু পদক (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৮৬), শরৎ পুরস্কার (শরৎ সমিতি)—এসব কিছুই আমরা তাঁর রসসৃষ্টিক্ষমতার স্বীকৃতি হিসেবেই ধ'রে নিয়ে থাকি। এভাবে ভাবলে বিভূতিভূষণের পাওয়াটা মোটেই তুচ্ছ নয়। আবার তাঁকেই যখন কোনো স্মৃতিবক্তৃতা বা রীডারশিপ বক্তৃতার জন্য আহ্বান জানানো হয় কিম্বা তাঁর জীবিতকালেই যখন দেশের ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয় (পাটনা, রাঁচী, রবীন্দ্রভারতী, বিহার, ভাগলপুর ও ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) তাঁর রচনাসমূহকে গবেষণাযোগ্য বিষয়রূপে অনুমোদন করেন, তখন তার মধ্যে অতিরিক্ত কিছু এসে যায়। বোঝা যায়, আমরা তাঁর রচনারসসম্ভোগেই আর তৃপ্ত নই শুধু, তাঁর ভাবনা-চিন্তার শরিকও আমরা হ'তে চাই, আবিষ্কার করতে চাই তাঁর জীবনবোধের কেন্দ্রবিন্দুটিকে এবং বুঝতে চাই সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর 'মিশন'।

এভাবে তৈরী হ'তে গিয়েই একটা অভাবিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'তে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তিনি যতই লাভ করুন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁকে যতই গুরুত্ব দিয়ে থাকুক এমনকি, বিশেষতঃ তাঁর ছোটগল্পে আজও অন্য অনেকের তুলনায় পাঠক যতই সাড়া দিন না কেন, সাধারণভাবে বাঙলা সাহিত্য সমালোচকেরা কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বেশ কুণ্ঠিত। এইজন্য দেখা যায় সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারানুসারী আলোচনায় বিভূতিভূষণের কথা তেমন ভাবে আসে না, কখনো কখনো তাঁর নামটির তাৎপর্যহীন উল্লেখ থাকে মাত্র, কখনো তা-ও নয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় "প্রথম মহাযুদ্ধের পরের ও তিরিশের সুফল" উক্তিটিকে কোন্ তাৎপর্যে আমরা গ্রহণ করব? অনেকগুলি অবিস্মরণীয় শিশুচরিত্রের স্রষ্টা আদৌ স্থান পেলেন না "বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায়"! বাঙলা সাহিত্যের হাস্যরস স্রষ্টাদের অন্যতম প্রধান হওয়া সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারাবাহিক আলোচনাতে অনুক্ত থেকে গেল তাঁর নামটি! "নীলাঙ্গুরীয়" বা "স্বর্গাদপি গরীয়সী"'র বাইরে যে আরো অনেকগুলি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন বাঙলা উপন্যাসের আলোচকেরা তাদের কোনো একটিকেও গ্রাহ্য করলেন না! তাঁর প্রায় ৭০০ গল্পের মধ্যে বরযাত্রী আর রাণু পর্যায়ের গল্পগুলির সঙ্গে দ্রব্যগুণ, মধুলিড়, কবি কুন্তনলালের মেঘদূত, পোষ্টুর চিঠি-র মতো কিছু বেছে নেওয়া গল্পের নাম আমরা প্রায়ই শুনি বটে কিন্তু এসবের বাইরে যে গল্পসমষ্টি আছে সে-সব গল্পের কথাও সমালোচকেরা বড একটা বলেন না। বিভূতিভূষণের ৪টি

ভ্রমণকাহিনী নিয়েই যে মনোজ্ঞ আলোচনা হ'তে পারে, বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে আমরা তার অভাব বোধ করি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও কিছু প্রশ্ন এসে পড়ে। উপন্যাসের ইতিহাসে যিনি একরকম অ-স্পৃশ্য তাঁর উপন্যাস সাহিত্যই গবেষণাযোগ্য হ'য়ে ওঠে কি ক'রে? ঠিক একইভাবে গবেষক যখন বিভূতিভূষণের গল্পে হাস্যরসের বিশ্লেষণে মনোযোগী তখন হাস্যরসের আলোচনায় তিনি উপেক্ষিত রইলেন! হয়তো খুব সহজেই নাকচ ক'রে দেওয়া যায় এসব জল্পনা কল্পনা—বলা যেতে পারে, ওসব বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারেই পণ্ডিতি ব্যাপার। তা হ'লে আজও যাঁরা বিভূতিভূষণের রচনা আগ্রহ নিয়ে পড়েন তাঁদেরও কি আমরা এভাবে দূরে সরিয়ে রাখব? প্রতিষ্ঠানগুলি বিভূতিভূষণকে স্বীকার করলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি তাঁকে মর্যাদা দিলেন এবং সাধারণ পাঠককুলেরও তিনি আপনজন হ'তে পারলেন; শুধু সমালোচকদের বৈদগ্ধের কাছেই ম্লান হ'য়ে গেলেন তিনি!

১৩৫০ সালের মাঘ মাসে, ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস থেকে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের জবানবন্দী সঙ্কলন ক'রে "কেন লিখি" নামে একটি বই প্রকাশিত হয়; সম্পাদক ছিলেন—অনিলকুমার সিংহ। এই বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীরা হলেন: অন্নদাশঙ্কর রায়, আবুল মনসুর আহমদ, অমিয় চক্রবর্তী, গোপাল হালদার, জীবনানন্দ দাশ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মনোজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত ও শাহাদাৎ হোসেন। সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত লেখাটিতে বিভূতিভূষণ নিজের দু'টি প্রবণতার কথা বলেছিলেন। এক, অলস অবসরে বহুজনের সঙ্গে এক ধরণের মানসিক আত্মীয়তা স্থাপন করতে চান তিনি লেখার মধ্য দিয়ে; দুই, তাঁর নিজস্ব একটা 'মিশন' বা অভিসন্ধিকেও ধ'রে দিতে চান ঐ লেখার মধ্যেই। অভিসন্ধিটি ব্যাখ্যা ক'রে তিনি লিখেছেন—"হাসি অশ্রু দিয়া গড়া এই পৃথিবী, কিন্তু ডাঙ্গার তুলনায় লোনাজলেরই মত অশ্রুর ভাগটাই বেশি বলিয়া ইচ্ছা করে হাসির দিকটা একটু একটু করিয়া রঙ ফলাইয়া ধরি সবার সামনে। আবার এক এক সময় মনে হয়, অশ্রুই বা মন্দ কি? সে অশ্রু বেদনার মাধুর্য নিঙড়ানো—নখ-দর্পণের মসি-বিন্দুর মত যে অশ্রুতে জীবন তার ছোটবড় রূপে হয় প্রতিবিম্বিত। বড় অপরূপ এই জীবন—ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া বিরাট এখানে ক্রমাগতই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে,...পৃথিবী আজ হয়তো ছোট, কিন্তু এর destiny বা চরম ভাগ্য যে ছোট নয় তার ইঙ্গিত এর মধ্যেই আছে...এই বলায় আকুতি আমার স্বধর্ম।"

এই স্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় তাঁর লেখাতেই থাকবে আর বিদগ্ধ সমালোচকেরা সে-কথা বুঝিয়ে দেবেন, নির্দেশ করবেন দেশে-কালে সেই 'স্বধর্মে'-র প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু, বুঝিয়ে দেবেন কোথাও তিনি স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন কিনা। প্রত্যাশিত যে, তাঁরাই ব্যাখ্যা করবেন বিভূতিভূষণের "ক্ষুদ্র" আর "বিরাট"-এর ধারণাটিকে, কতখানি গ্রাহ্য সেই ধারণা। পৃথিবীর destiny বলতেই বা বিভূতিভূষণ কি বোঝেন? অথচ, খুব সহজ ঔদাসীন্যে বাতিল হ'য়ে গেল এ-সব প্রশ্ন, একরকম বৃথা-ই গেল বিভূতিভূষণের আকুতি। না হ'লে "নীলাঙ্গুরীয়" উপন্যাসে মীরা-শৈলেনের বৃত্তান্তের পাশেই ছিল সৌদামিনীর সর্বনাশের আখ্যায়িকা, এবং কাব্যে উপেক্ষিতা না হ'লেও সমালোচকের সহৃদয় দৃষ্টির বাইরেই সে থেকে গেল। "নব সন্ন্যাস" উপন্যাসে মাস্টারমশাই যদি বিভূতিভূষণের "বিরাট"-এর আদর্শের ধারক, তা হ'লে চম্পা-র মধ্যে কি আছে ক্ষুদ্রতাকে নির্জিত করে বিরাটত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা? বহু-উল্লেখিত গল্পগুলির বাইরে বিভূতিভূষণের প্রচুরসংখ্যক গল্প আছে যেখানে তাঁর ঐ আকুতি অনতিউচ্ছ্বাসে তরঙ্গিত। 'অকাল বোধন', 'নবোঢ়ার পত্র', 'প্রশ্ন', 'চিত্ত ও চিত্র', 'হৈমন্তী'র মত গল্পগুলি যেমন তাঁর ঐ আকুতি প্রকাশের একটি দিক, ঠিক তেমনি আরেকটি দিক নির্দেশ করে 'গিন্নী মা' বা 'মিশ্র ডায়েরী'র মতো গল্পগুলি। 'মুনাফা', 'ধার্মিক' 'প্রভু' 'দেবতা' থেকে শুরু ক'রে 'সার্টিফিকেট' 'ফার্স্ট বয়' 'হনিমুন' 'মোতীর ফল', 'ক্ষণিকা', 'ছোড়দি রহস্য', 'লঘুপাক'-এর অন্যান্য গল্পগুলি বিভূতিভূষণের ঐ আকুতিপ্রকাশের বিচিত্র বর্ণিকাভঙ্গ। শিল্পরূপগত দিক থেকে বিভূতিভূষণের ভ্রমণকাহিনীগুলির আলোচনা যেমন সম্ভব, তেমনি সমানভাবেই সেগুলি বিভূতিভূষণের 'মিশন' বা অভিসন্ধি বোঝবার পক্ষে আমাদের সহায়ক। আর এর সবকিছু মিলিয়েই পাওয়া সম্ভব স্বধর্মে বিভূতিভূষণের নিষ্ঠার পরিচয়। অথচ, কি এক নেপথ্যবিধানে সেই প্রয়াসটুকু বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে দেখা গেল না! এবং যতদিন তা অসম্পূর্ণ থাকবে ততদিন বিভূতিভূষণকে আমাদের দেওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার হিসেবে গরমিল থেকেই যাবে; যদিও, উপরে বিবৃত বিভূতিভূষণের প্রাপ্তির তালিকা থেকে কারো মনে হ'তেই পারে তাঁর পাওনাটা তিনি আমাদের কাছ থেকে পুরোপুরিই পেয়ে গিয়েছেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

(১৩৩১—১৩৪৪)

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

১.

'ভালোবাসায়, হাস্যরসে আমার বিরোধের বেদনা। এদের (শিশুদের) মধ্যে এসে প্রকাশ-অক্ষমতার।'—আমার সাহিত্যজীবন, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

শুধু কথার পিঠে কথা সাজিয়ে জীবনের যাথার্থ্য থেকে নির্বাসিত কোন লেখকের কথা এটি নয়। এটি এক সত্যসন্ধ জীবন-প্রেমিকের আন্তর অনুভূতি। যাকে লেখক বিরোধ বলে দেখছেন সেটি একটি বৃহত্তর ঐক্যে, একটি সুগভীর তাৎপর্যে অন্বিত হয়ে আছে।

ক্ষণস্থায়ী মোহকে কালজয়ী করে দেখা, বিষণ্ণবিধুর মন নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি—অন্তরে-বাইরে গরমিলকেই প্রকট করে বলে এই শতাব্দীর অগ্রজ লেখক সংকোচ প্রকাশ করেছেন। আমরা বলি, এই বেদনাবোধ এক সংস্কৃতিমান মানুষের। জৈব স্তরের ক্ষণস্থায়িত্ব, ভঙ্গুরতা, দীনতা এবং তুচ্ছতাকে মানুষ তার সংস্কৃতির সাধনার সাহায্যে অমর, দৃঢ়, উন্নত এবং মহিমময় করে তোলার তপস্যা করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। লেখক সেই তাপসদেরই একজন। কবি কীটস গ্রীসীয় 'আর্ন'-এর ওপর আঁকা ছবিতে ক্ষণমূর্তির চিরমূর্তি দেখেছেন। দিবসান্তে ঝরে-যাওয়া ফুল, অল্পস্থায়ী জীবন-যৌবনকে শিল্পে-সাহিত্যে চিরমূর্তি দেওয়া হয়। এখানে মানুষের রূপ সংস্কৃতির। বিপরীত দিকে, মানুষ যেখানে কেবলমাত্র জীব সেখানে সে অন্ত্যতনের শিকার। ক্ষণস্থায়িত্বের দাসমাত্র। এখানে মানুষের রূপ জৈব।

একদিকে মানুষের সাধনা, অন্যদিকে তার জীব স্বভাব—এই দুই-এ মাখামাখি হয়ে আছে—সব সময়ে স্পষ্ট হয়ে আছে—সব সময়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না; কিন্তু সাধক শিল্পীর বেদনা এই বিরোধের পীড়ন থেকেই।

সৃষ্টির সর্বস্তরেই বিরোধ-বৈপরীত্য—আমরা যতি মেনেই গতি পাই; প্রতিটি সৃষ্টি ধ্বংসেরই পরিণাম।

বিভূতিভূষণ বলেছেন, শিশুদের ক্ষেত্রে তিনি 'প্রকাশ-অক্ষম'। অর্থাৎ, বলার যা ছিল তা তিনি বলতে পারেননি। অভিপ্রায় ও চিত্রণের অসামঞ্জস্যের কথা এখানে। আমরা তাঁর প্রকাশিত সাহিত্য থেকে চিত্রণটি বুঝে নিই, কারণ সেটি আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। আমাদের বোঝা আমাদেরই দৃষ্টি ও বুদ্ধির তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু অভিপ্রায়? ভাষায় প্রকাশিত তাঁর সৃজনধর্মী রচনার মধ্যে দিয়েই তাঁর অভিপ্রায় বোঝার চেষ্টা করতে পারি। এর আদৌ কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। লেখক কী বলতে চেয়েছেন—এর চেয়ে কী বলেছেন, কেমন করে বলেছেন—এর দিকে দৃষ্টি দিলে কিছু ভালো ফল আমরা পেতে পারি। শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রকাশ ক্ষেত্রেই তাঁর পরিচয়—সেই প্রকাশের নানারূপতার মধ্যে অবশ্যই একটি ঐক্য আছে। অনেক বিচ্ছিন্ন বিরুদ্ধ রূপ সেই অখণ্ড লেখক সত্তারই অভিক্ষেপ (projection)। এই ঐক্যবিন্দুতে পৌঁছানো প্রভূত শ্রমসাপেক্ষ। লেখকের সমগ্র রচনার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা দরকার; অথবা তাঁর বেশ কিছু রচনার উপাদান, শ্রেণীকরণ, ভাষাপ্রয়োগ, চরিত্রের ভাবনা ও কার্য, ঘটনার যুক্তি বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত করলে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। খণ্ডাংশ নিয়ে বিচার করলে অসম্পূর্ণতা থাকেই। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের সংখ্যা নির্ণীত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তাঁর বহু গল্প এককালে পড়েছি, এখন হাতের কাছে নেই। প্রায় দেড় শ গল্প হাতের কাছে আছে; তার সবগুলির আবার প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি।

কোন একটি বিশেষ গল্পগ্রন্থ ধরে বিচার করাটাই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ছিল; কিন্তু তাতেও কয়েকটি বিপত্তি দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ, গল্পগুলি কালানুক্রমিকভাবে সংকলিত হয়নি; দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত 'অভিনব সংস্করণ' আছে তাতেও অনেক গল্প নতুনভাবে গৃহীত কিংবা বর্জিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সংস্করণের কিছু গল্প স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। তৃতীয়ত, সবগুলির প্রকাশকাল 'রচনাবলী'র সম্পাদক দিতে পারেননি।

যে সমস্ত গল্পের প্রকাশকাল পাওয়া গেছে সেগুলোকে আমরা কালানুক্রমিক সাজিয়ে নিয়েছি, অবশ্যই ১৩৪৪ সাল পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে সর্বেক্ষণের কথা ওঠে না। ১৩৪৪ সালের আগে রচিত কিছু গল্প রচনাবলীতে না এসে থাকতে পারে; আবার তারিখহীন কিছু গল্প ১৩৪৪-এর আগেই রচিত হতে পারে। তবে সান্ত্বনা এইটুকুই যে এই নির্ধারিত কালসীমায় রচিত কোন উল্লেখযোগ্য গল্পকে আমাদের এই আলোচনার বাইরে রাখা হয়নি।

এই সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলির বিচার করতে চাই। মাপকাঠির কথা কিছু আগেই বলে এসেছি।

২.

ছোটগল্পের পসরা নিয়েই সাহিত্যের হাটে তিনি প্রথমে আসেন। বাঙলা ১৩২২ সালে (১৯১৫ খ্রী.) 'প্রবাসী'র গল্পপ্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম গল্প 'অবিচার' পুরস্কৃত হয়।

'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ১৩৪৪ সালের বৈশাখে হলেও এই সময়ের অনেক আগে থেকেই তাঁর বহু উৎকৃষ্ট ছোটগল্প বাঙালি পাঠকের কাছে পরিবেশিত হয়েছে। প্রধান বাহন ছিল 'প্রবাসী' পত্রিকা। 'বিচিত্রা' ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকাও মাঝে মাঝে যোগ দিয়েছে।

১৩৩১ সালের প্রবাসীর ফাল্গুন সংখ্যায় 'নবোঢ়ার পত্র' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির নায়িকা শৈল রাণুরই মতো প্রথম ভাগের পাতায় আটকে-যাওয়া একটি মেয়ে। শ্বশুরবাড়ি থেকে সই-এর কাছে রাণুরই বানান-রীতির পূর্বস্মৃরিত্ব করে চিঠি লিখে দাম্পত্য-জীবনের হর্ষ-বেদনা জানিয়েছে। কিশোরী নববধূর প্রতি শ্বশুরবাড়ির মেয়েদের হৃদয়হীন আচরণ, স্বামীর সোহাগ, প্রতিনায়িকার অমোচ্য মনোবেদনা, দাম্পত্য প্রেমে পথের কাঁটা, দুই কিশোরীর মূঢ় ভাবাবেগ অসামান্য নিষ্ঠায় এবং যাথার্থ্যে বর্ণিত হয়েছে। লক্ষণীয়, 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পের (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৬) রাণু এই নবোঢ়া শৈলেরই (১৩৩১) যেন পিতৃগৃহস্থিত প্রতিরূপ। 'কলতলার কাব্য' (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩১) আরও কয়েকমাস আগেই প্রকাশিত হয়েছে। টিটাগড়ের এক শ্রমিক পল্লীতে বালিয়া জেলার মঝৌলির লছিয়াকে তার স্বামী ঐ জেলারই গজরাজপুরের সুনরা বহুদিনের সন্ধানের পর খুঁজে পেয়েছে। লছিয়া স্বামীকে চিনতে পারেনি; কিন্তু সুনরা ঠিকই চিনেছিল। প্রথমে সে আত্মপরিচয় দেয়নি। জল নেওয়ার অছিলায় কলতলায় সে তার চপলা আর কলহপ্রিয়া স্ত্রীর আচরণ উপভোগ করছিল; কিন্তু একদিন তাকে বাধ্য হয়েই আত্মপরিচয় দিতে হয়েছিল। গল্পটিতে মিলনের সরস বর্ণনাই আছে, প্রসঙ্গত বিচ্ছিন্নতার কথা এসেছে। প্রথমদিকে পাঠকের মনে মুক্ত প্রেমের কথাই আসবে; কিন্তু নাটকীয় মোচড়ে সেটি দেখা গেল আসলে বিবাহিত প্রেম! 'বিয়ের ফুল' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২) রামতনুর বিবাহ-প্রয়াস নিয়ে কৌতুকরসসম্পৃক্ত গল্প। সাত-সাত জায়গায় পুঁটী-খেঁদীদের দেখে অতৃপ্ত রামতনু তার বৌদির পিসির স্কলারশিপ পাওয়া মেয়ের জন্য প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করল। তার বিড়ম্বিত অভিসার আর তার থেকে বিপত্তি কৌতুকের উপাদান হয়ে উঠেছে। শেষে দেখা গেল সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। রামতনুর বিয়ের ফুল তখনো ফোটেনি। নবীন যৌবনের ভ্রান্তি ও উন্মাদনা এবং

পরিণামে হতাশা এই গল্পের বিষয়বস্তু। 'অকাল বোধন' (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩২) গল্পে নবদম্পতির উন্মাদন। উচ্ছ্বাস যৌবনের প্রান্তদেশে আসা এক মহিলার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এঁর স্বামী 'বেদান্তদর্পণ' আর সাধু-গুরুর সান্নিধ্যে যে আনন্দ পান স্ত্রীর সান্নিধ্যে তা পান না। একটি বৈপরীত্য সংস্থাপন করে ঘন বেদনার ছাপ দেওয়া হয়েছে। এখানে ফিকে হয়ে যাওয়া দাম্পত্য প্রেমের এক করুণ কাহিনী। 'পৃথ্বীরাজ' (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৫) গল্পটি ডানপিটে পাঠবিমুখ অল্পবয়েসে লালিত কুলীনতনয় রসিককে নিয়ে। বয়সে সে কিশোরই হবে। সে যুগের বিধিমত তারও বিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী অমলার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বীররসের চর্চার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ' কাব্য তার বীররসের বিভাবের কাজ করেছে। সাজা-পৃথ্বীরাজ একদিন সত্য পৃথ্বীরাজ হয়ে তার স্ত্রীকে সংযুক্তার মতো করেই হরণ করে নিয়ে এল। ঘোড়া করে পৃথ্বীরাজের মতোই হরণের প্ল্যান সে করেছিল; কিন্তু অমলারই পরামর্শে মোটর গাড়ি করেই হরণ পর্ব শেষ হল। এখানে প্রেম বিবাহিত অথবা দাম্পত্য। আবেগে উতরোল।

'রাণুর প্রথম ভাগ' (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৬)-এর রানু 'অচল'-এ অচলা থেকে গিয়েছিল। তার বড়ো ইচ্ছা ছিল সে বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের ঐক্য-বাক্য-মাণিক্যে অধিকার পায়; কিন্তু যে ছেলে ধরতে পারে না কেউটে সে ধরে কী করে। সবে আট পেরিয়েছে। কথায় আর ব্যবহারে একেবারে পাকা গিন্নি। সে যে বাড়ির বড়ো মেয়ে। রেখা, বাদল, মিটু সবাই তার চেয়ে ছোট। তার বাবা গৌরীদান করে পুণ্য অর্জন করলেন। রাণু শ্বশুরবাড়ি গেল এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে সে 'মেজকা'কে চিঠি দেবে আর প্রথম ভাগ সে নিষ্ঠাভরে শেষ করবে। গল্পটি পুরস্কৃত হয়েছিল। এখানে এক পাঠবিমুখ কিশোরীর ছলনা, তার অকিঞ্চিৎকর জীবন, অল্পবয়সে তাকে পরঘরে করে দেওয়ার যন্ত্রণা কেমন স্বচ্ছন্দ শিল্পরূপ লাভ করেছে। বাঙ্‌লা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প হিসেবে এটিকে বরণ করে নেওয়া যায়। 'গজভুক্ত—' (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৬) গল্পে স্ত্রীর আবদার রাখতে গিয়ে নিঃস্ব শচীনাথ মেসের সহবাসীদের খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে। তার অসামাজিকতা স্ত্রীর মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্যই। 'আশা' (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৬) গল্পে অলৌকিক অনুভূতি বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি পেয়েছে। নায়ক রোগী—তার দৃষ্টিভ্রান্তি তার কাছে বাস্তব। ডাক্তারের যুক্তিতে সে তার বাস্তবের কল্পলোক থেকে সরে আসেনি। 'একরাত্রি' (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৭) গল্পে এক রসসিক্ত নায়কের মোহভঙ্গ হয়েছে। রেলের কামরায় যে সঙ্গীহীন মেয়েটিকে দেখে তার পরোপকার বাসনা প্রবল হয়েছে, পৌরুষ জেগে উঠেছে, একটি নাটকীয় মোচড়ে দেখা গেল সে নারীবেশী গুম্ফধারী পুরুষ। নাম তার অছিমুদ্দীন। গৌরকিশোর ঘোষ

অনেক পরে এই জাতের একটি গল্প লিখেছিলেন। রাতের মায়ায় পিছন থেকে এক মহিলাকে দেখে অন্য এক রসিক নায়কের কাব্য উৎসারিত হয়েছিল। মুখ ঘোরাতে দেখা গেল তিনি বৃদ্ধা। অজাযুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে, প্রভাতে মেঘ-ডম্বরে আর দাম্পত্যকলহে—প্রাচীনদের মতে—'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'—হাঁকডাক খুব হলেও কাজের কাজ তেমন হয় না। 'হারজিত' (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৭) গল্পটি চতুর্থটিকে নিয়ে। শেখরের শাণিত বচনবাণ, অরুণার ঘাট স্বীকার উপভোগ্য করে বলা হয়েছে। বিভূতিভূষণ শিশুদের নিয়ে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প লিখেছেন। শিশুর আচরণ নিয়ে এত সহৃদয় রচনা বাঙলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। 'দাঁতের আলো', 'ননীচোরা', 'মাসী', 'পীতু', 'বাদল' এই পর্যায়ের গল্প। 'মেজকা'র বাইরের আপাত-কাঠিন্য ভেদ করে প্রীতির ফল্গুধারা বয়েছে সর্বত্র আর সেই ধারায় তিনি পাঠককেও স্নান করিয়েছেন। 'বাদল' (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩৮) এক অমেয় শিশুর গল্প। শিশু মনস্তত্ত্বের বই পড়ে তার আচরণের গতিবিধি বুঝতে যাওয়া বা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। শিশু যেন মোনালিসার স্মিত হাসি—চিররহস্যে ভরা। সে তো প্রাণের সমবয়সী, বয়স্ক মানুষের বিধি-নিষেধের পাঠ সে নেয়নি—প্রাণের উদ্দামতাকে সে কোথাও খণ্ডিত করেনি। 'শোকসংবাদ' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯) সংবাদ-লোলুপ দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের বিড়ম্বনার গল্প। 'শিক্ষাসংকট' (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৯) গল্পে এক আধুনিকার হাতে দৈবচক্রে ঈষৎ প্রাচীনপন্থীর নাকালের কথা আছে। দাম্পত্য মাধুর্যের ছোঁয়া আছে এখানে। 'মধুলিড' (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৯)-এর গৌরীকান্ত পুষ্পভুক্। মধুলিড নামটি তাঁর পক্ষে সুভাষণ। গোবর্ধনবাবুর বাগানে কুমড়োর ফুলে তাঁর প্রবল আসক্তি দেখে আগেই অনুমান করা গিয়েছিল এই বাড়াবাড়ি পুষ্প-প্রীতির মূলে কী থাকতে পারে। পরে অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে কেয়া ফুলের চপ, নীলপদ্মের ডালনা, কলকে ফুলের শুক্তনি, শিউলির ঘণ্ট, চন্দ্রমল্লিকার গুড়অম্বল তাঁর রসনেন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দেয়। ঐসব ফুল তাঁর চক্ষুরিন্দ্রিয়কে মোটেই তৃপ্তি দেয় না। ফুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নন্দনতাত্ত্বিক বিকর্ষণের নয়, ভোজন-তাত্ত্বিক আকর্ষণের। 'বরযাত্রী' (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০) ত্রিলোচনের বিয়ের রাতে অন্য পাঁচ বন্ধু গণশা, ঘোঁৎনা, রাজেন, গোরাচাঁদ এবং কে. গুপ্তের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার গল্প। এদের নিয়ে ব. ভ. ম.-এর বেশ কয়েকটি গল্প আছে। আলাদা করে গল্পগুলি এক একটি মণিখণ্ড, আবার এইসব মণিকে সুতোয় গেঁথে দিলে মণিমালা—যেটি ছয়জন নির্মল হৃদয় বন্ধুর আন্তরদ্যুতি বিচ্ছুরিত করে। মনে হতে পারে এই গল্পগুলি 'বরযাত্রী' গল্পেরই নানামুখী বিস্তার—চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং ঘটনা পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে বলে। এই পর্যায়ে 'বর ও নফর' (১৩৪৩), 'স্বয়ংবর' (১৩৪৫), 'পাকাদেখা' (১৩৪৬), 'ঘর-

জামাই', 'সাপের চেয়েও সাংঘাতিক', 'পুঁটুরাণী' (১৩৫০), 'বাবরি' 'টনসিল' (১৩৬১), এবং 'অবশেষে' (১৩৭৮) গল্পগুলিকে রাখা চলে। এ-সব গল্পে চরিত্রের ক্রম-উন্মোচন নেই, বরং চরিত্রগুলি বিশিষ্ট ও স্থির। ঘটনার বৈচিত্র্যেই স্বাদু হয়ে উঠেছে। ছয় বন্ধুর বহিরঙ্গ জীবন-কথা ঐতিহাসিকের নিষ্ঠায় সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে বিবৃত হয়েছে। 'জালিয়াত' (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪০) এক কিশোরী বধূর বাপের বাড়ির প্রতি সহজাত আকর্ষণ এবং একটু জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া নিয়ে মিষ্টি গল্প। 'রংলাল' (বিচিত্রা, কার্তিক, ১৩৪১) একটি কুকুরের নাম। মিথিলার কোন কুঠিয়ালের অধীনে 'ছোটা সাহাব' বা 'বড়বাবু'-র কাজ নিয়ে হ্যাট-কোটধারী বাঙালি বাবু গিয়েছেন। রংলাল তাঁর দিকে শুধু চেয়েই থাকে, তার অন্যান্য অনেক আচরণেও বাবু সন্দেহ করেন তিনিই বুঝি উপহাসের এবং এবং কৃপার পাত্র। তিনি সংকুচিত থাকেন। পরের বার তিনি ভারতীয় পোষাকে এসেছেন এবং রংলাল তাঁকে অকৃত্রিম অভ্যর্থনা জানিয়েছে। এক অবোলা পশুর নিরুচ্চার ধিক্কারের ধাক্কায় বাঙালি বাবুর উগ্র সাহেবিয়ানার দেওয়াল ধ্বসে গেছে—তিনি স্বাভাবিক হয়েছেন। 'ভূমিকম্প' (বঙ্গশ্রী, মাঘ, ১৩৪১) গল্পে বঙ্কিম নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শীর স্থানে বসিয়ে বন্ধুদের কাছে ভূমিকম্পের বীভৎস তাণ্ডবের ছবি দিয়েছে, একটি নাটকীয় বাঁকে দেখা গেল সবটাই অতিরঞ্জন। সকলের টান-টান অনুভূতি হঠাৎ হালকা হয়ে গেল। 'দাঁতের আলো' (বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৪১) শিশুর স্বর্গীয় হাসি নিয়ে গল্প। 'খাঁটির মর্যাদা' (বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৪২) গল্পের বন্ধু নকলকে বা অভিনয়কে একেবারেই পছন্দ করে না। কিন্তু বৌ-এর প্যাঁচে পড়ে অভিনয় দেখতে হয়। বৌ-এর নকল অভিমানে তার তীব্র আপত্তি; কিন্তু সেটি যদি খাঁটি হয় তবে ক্রুদ্ধ বৌ-এর কাছে নাজেহাল হতেও তার আপত্তি নেই। এখানে দাম্পত্য জীবনের রঙ কিছুটা উগ্রই। 'বিপন্ন' (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪২) এক তরুণ নবনিযুক্ত বাঙালি অধ্যাপক আর তাঁর নববিবাহিত ছাত্রকে নিয়ে গল্প। পূর্বপরিচয় ছিল না তাই ছাত্রটি স্টেশনারি দোকানে নিঃসংকোচে তার স্ত্রীর লাবণ্য ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির প্রসাধন-সামগ্রী নিয়ে অপরিচিত অধ্যাপকের কাছ থেকে দীর্ঘ পাঠ নিয়েছে। বাঙালির রুচির ওপর তার শ্রদ্ধা আছে। পরে ক্লাসে অধ্যাপক ও ছাত্র একই সঙ্গে বিপন্ন বোধ করেছেন। বিপন্ন লজ্জিত ছাত্র ক্লাসরুমের বাইরে পালিয়ে গিয়ে বিপন্ন অধ্যাপককে রেহাই দিয়েছে। 'তাপস' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩) এক তরুণ পড়ুয়ার মনে ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার এবং অভিভাবকের সদিচ্ছার প্রতিলিপি। 'প্রশ্ন' (বিচিত্রা, মাঘ, ১৩৪৩) ভিন্ন স্বাদের গল্প। ব. ভ. ম.-র কৌতুককোমল ভঙ্গি এখানে নেই। প্রাচীন ভারতবর্ষের পটভূমিকায় একটি প্রেমের গল্প। তাপস সুজাতক কবিতার নির্বার

মুক্তি থেকে জ্ঞানের বন্ধনে এসেছে। বনহরিণী চারুদত্তার ছন্দে দীক্ষিত হয়ে আবার সে মুক্তি চাইছে। যেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'রই আর একটি শিল্পায়িত রূপ। ভাষাতেও কোথাও কোথাও রবীন্দ্রপ্রভাব আছে। 'স্বয়ংবরা'তে (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৪) রাণুর বিয়ের উৎসবের উচ্ছল আনন্দ-বন্যার মধ্যে ঈর্ষামলিন কিশোরীর বেদনাকে সহৃদয় অন্তরঙ্গতায় উজ্জ্বল করা হয়েছে। শনিবারের চিঠির ১৩৪৬-এর শ্রাবণ সংখ্যায় 'স্বয়ংবরা' নাম নিয়ে রূপে-রসে ভিন্ন একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। 'বর্ষায়' (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৪) গল্পে একটি আট বছরের শিশুর একতরফা অসম আকর্ষণের কথা এসেছে। 'মুরারি ডাক্তারের ঠিকেদারি' (বঙ্গশ্রী, কার্তিক, ১৩৪৪) বিচিত্র লোকচরিত্র নিয়ে। 'কস্মৈ হবিষা বিধেম' (প্রভাতী, বার্ষিক, ১৩৪৪) প্রচলিত ধর্মভাবনার অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে কৌতুকের আবহ তৈরী করেছে। এ-গুলি ছাড়া আরও কিছু গল্প মনে হয় এই কালসীমায় (১৩৩১-১৩৪৪) রচিত। এগুলির তারিখ দিতে পারছি না এখনই। 'নোংরা' গল্পে পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় এম. এ. পাঠার্থী হাবুল কেন জানি না নোংরা মেয়ে নৃত্যকালীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে। 'কাব্যের মূলতত্ত্ব' যে গণিত সেটি আমরা এখন গঠনতাত্ত্বিক সমালোচকদের কাছে শুনি; কিন্তু শৈলেন তাঁদের গণিতশিক্ষকের কাছে বহুদিন আগেই শুনেছিলেন। 'নিবাসিত' অ্যান্টিগোনাস ওরফে মদনা ডি. এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের এক অভিনেতা। মদের ঝোঁকে সে পালিয়ে এসেছে ব্ল্যাক আউটের রাতে—রঙ্গমঞ্চ থেকে। তাকে নিয়ে পাড়ায় জল্পনার শেষ নেই। অবশেষে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়েছে নাটকীয় মোচড়ের ফলেই। 'কৈকালার দাদা'র কাছ থেকে বিনা টিকিটের যাত্রীরা কিছু অব্যর্থ শিক্ষা পেতে পারেন। 'ননীচোরা' গল্পটিতে শিশুর আচরণের মধ্যে দিয়ে ভক্তির একটি আবহ তৈরি হয়েছে। 'দ্রব্যগুণ' বুঝিয়ে দেয় নামে অনেক কিছু আসে যায়। বোতল-শব্দটি সন্ধ্যার পরে যে অর্থ নেয় সেটি স্বরাজ-কামীদের বাঞ্ছনীয় নয়। 'শ্যামল-রাণী' গাই সুধার মানবেতর সখী। তাকে নিয়ে তার কিছু ছেলেমানুষী।

৩

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে ছোটগল্পের উপাদান, শ্রেণীকরণ ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ঐক্যবিন্দু সন্ধানের কথা বলেছি। সেই ঐক্যবিন্দু এবং তার থেকে লেখক-ব্যক্তিত্বের নানাচারী বিচ্ছুরণ তাঁকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে।

বিভূতিভূষণের প্রথম দিকের (১৩৩১-৪৪) ছোটগল্পগুলিতে ছয়টি সাধারণ উপাদান আছে: ক. অল্পশিক্ষিত এবং দেহে-মনে অপরিণত কিশোরী বধূ; খ. দাম্পত্য-জীবনের নানা রঙ—প্রেম এখানে বিবাহিত। সামাজিক নীতি-চেতনা (Social ethos) মেনেই; গ. বিবাহ বাসনা; ঘ. অসম ও অসম্ভাবিত

প্রেম ; ঙ. শিশুজীবনের যথেচ্ছাব্রত আর তার অলৌকিক জগৎ ; চ. বিচিত্র লোকচরিত্র। এই সময়-সীমায় রচিত বলে যে চৌত্রিশটি ছোটগল্পকে এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে নিয়েছি তার সবগুলিতেই উপরে বলা এক বা একাধিক উপাদান পাওয়া যাবে। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'জালিয়াত' এবং 'শ্যামল-রাণী' গল্পে প্রথম উপাদানটি স্পষ্টলক্ষ্য। এখানে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের কথা আসেনি—কিশোরী বধূর ভাবাবেগ প্রধান হয়েছে। 'নবোঢ়ার পত্র', 'কলতলার কাব্য', 'অকাল বোধন', 'খাঁটির মর্যাদা', 'পৃথ্বীরাজ', 'গজভুক্ত—', 'হারজিত' এবং 'বিপন্ন' গল্পে দ্বিতীয় উপাদানটি আছে। প্রেম এখানে বিবাহিত ও বিশ্বস্ত। সামাজিক নীতিচেতনা আহত হয় না। 'বরযাত্রী', 'স্বয়ংবরা', 'বিয়ের ফুল', 'নোংরা' গল্পে বিবাহোন্মুখতা, বিবাহ বাসনা এসেছে। দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ এখানে। 'প্রশ্ন', 'আশা' 'তাপস' এবং 'বর্ষায়' অসম্ভাবিত ও অসম প্রেম। চারটি গল্পেই একটি সূক্ষ্ম মানসক্রিয়া বহির্বাস্তবকে স্বীকার করেনি। অর্থাৎ চতুর্থ উপাদানটি প্রধান। 'প্রশ্ন' গল্পে তৃতীয় এবং চতুর্থ উপাদানটি মিশে আছে। 'বাদল', 'দাঁতের আলো' এবং 'ননীচোরা' গল্পে পঞ্চম উপাদান আছে। 'মধুলিড', 'রংলাল' 'ভূমিকম্প', 'মুরারি গুপ্তের ঠিকেদারি', 'কস্মৈ হবিষা বিধেম', 'একরাত্রি', নির্বাসিত', 'কাব্যের মূলতত্ত্ব' 'কৈকালার দাদা', 'শোক সংবাদ', 'শিক্ষাসংকট' এবং 'দ্রব্যগুণ' বয়স্ক মানুষের নানা চরিত্রের রসোজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। মানুষের স্বনির্মিত জগৎ আর তার মধ্যে বাড়াবাড়ি বা অসঙ্গতি এই গল্পগুলিকে পৃথক স্থান দিয়েছে।

বিভূতিভূষণের এই পর্বের প্রায় সমস্ত গল্পেই হাস্যরসের স্রোত আছে—কোথাও প্রবল, কোথাও মৃদু, কোথাও বা ফল্গুধারার মতো অন্তঃসলিলা।

তাঁর গল্পের কিশোরী বধূ, প্রেমিক বা দম্পতি, কিশোর এবং শিশু বাঙালির যৌথ পরিবারের এবং অনাধুনিক। এই পর্বে তাঁর গল্পে বাঙালির বিলীয়মান জীবনের ছবি ধরা আছে। শিল্পী যুগের মধ্যে দিয়েই যুগ অতিক্রম করেছেন।

পাত্র-পাত্রী সকলে নিজের জগতে রয়েছে হতাশা, অপরিণতি, প্রীতি, নিজস্ব আদর্শলোক, উৎকট আকর্ষণ বা ঝোঁক, খেয়ালিপনা, লোভ ইত্যাদি সেই জগৎ তৈরি করেছে। বাইরের অভিঘাতে তাদের খুব একটা পরিবর্তন হয় না—অনেকটা তাঁরই কে-গুপ্তের দলের মত। বিভূতিভূষণ সহৃদয় হয়ে সেই অচঞ্চল ভাবলোককে পাঠকের ভূয়োদর্শিতার সামনে এনে তার অসঙ্গতিকে স্পষ্ট করে রসদীক্ষা দিয়েছেন। সমস্ত হৃদ্‌বৃত্তি এক অমিশ্র আবেগে সংহত হয়েছে।

আগের ঐ ছয়টি উপাদানকে আমরা দুইটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি। দাম্পত্য প্রেম, বিবাহোন্মুখতা, অসম্ভাবিত প্রেম নর-নারীর সম্পর্ককেন্দ্রিক অর্থাৎ যৌন। এখানে যৌন জীবনের ছোঁয়া আছে, আবরণও আছে। লেখক তাঁর কালের এবং পরিবেশের রুচিকে অগ্রাহ্য করেননি। এই তিনটি নিয়ে

একটি শ্রেণী। আর, কিশোরী বধূ, শিশু, বিচিত্র লোকচরিত্র নিয়ে আর একটি শ্রেণী।

এই দুটি শ্রেণী—অর্থাৎ যৌন ও অযৌন—গল্পকারের সামাজিক নীতিচেতনা, যৌথ পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা, তার প্রতি সাবেগ সহমর্মিতা থেকে উৎসারিত। এই পর্যায়ে লেখক সঙ্গসুখধন্য এবং সংস্কৃতিমুখী।

বাৎসল্য রসের শিল্পী ঃ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

১

বহমান জীবন জটিল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, রহস্যময়। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যে ধরনের সার্থকতা অর্জন করেছেন তার তুলনা মেলা কঠিন। কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর সাহিত্যের কেবল একটি দিকেরই পরিচয় নেব, তা হল বাৎসল্য রস, যার মধুর স্বাদ আধুনিক সাহিত্যে ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে আসছে।

জীবনের দুরবগাহতা ও নানামুখিনতার অন্ত নেই। জীবনে সখ্য আছে, বাৎসল্য আছে; শত্রুতা আছে, সংগ্রাম আছে, শান্তিও আছে। যেমন আছে আনন্দ, উল্লাস হর্ষ, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ, আছে তেমনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু বিচ্ছেদ এবং শোক। ঐ জটিল বৈচিত্র্যময় জীবনের মধ্য থেকে এক একজন সাহিত্যিক এক একটি দিকেই জোর দেন অথবা এক একটি দিক তাঁদের সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যায়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় জোর পড়েছে বাৎসল্য রসের। সে রচনা পড়লে আমরা আশ্বস্ত হয়ে উঠি এই জেনে যে অবক্ষয়িত জীবনের নয়—সুস্থ জীবনের স্বাদই তাঁর রচনা আমাদের কাছে বহন করে এনেছে। এই স্বাদ প্রকাশিত হয় বাঙালীর বৎসলতার রূপটি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। একথা আলোচনার জন্য আমরা যে গল্প কটি বেছে নেব তা হল 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'দাঁতের আলো', 'স্বয়ম্বরা', 'বাদল' এবং 'বাঘ'।

২

'মাটি এবং মন লইয়া দেশ। বাংলাদেশের মাটি বড় ভিজা এবং মন বড় অশ্রুসিক্ত। আশার কথা, মাটি আর বেশিদিন ভিজা থাকিবে না, নদনদী খাল বিল সব জাহান্নামে চলিয়াছে।'

'মনের দিকটা। যদি একদণ্ডও অশ্রুর ধারা একটু বন্ধ করা যায় সেই জন্যই এই আয়োজনটুকু।'

'রাণুর প্রথম ভাগ' নামে গল্পের বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখকের এই ঘোষণা থেকে তাঁর সাহিত্যকর্মের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। সে উদ্দেশ্য ভাবানু রোদনপ্রবণ বাঙালী জীবনের দুঃখের অশ্রুর ধারা বন্ধ করে নির্মল হাসির উল্লাসে জীবনকে স্বাদু করে তোলা। এই ঘোষণায় আর সোনার তরীর পুরস্কার কবিতার কবির ঘোষণায় কি কোনও তফাৎ আছে?

সংসার-মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।

সুখ হাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহ সুধা মাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।

প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
আর একটু স্নেহ শিশুমুখ-'পরে
শিশিরের মত রবে।

এই উদ্দেশ্য পূরণে তিনি সফল হয়েছেন। মনের গহনে ঢুকে আঁতের কথা টেনে বার করে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা না দেখিয়ে, ঘটনাকে ক্রমশ জটিল করে তারপর তার অবসান ঘটিয়ে জীবনের ট্রাজিক স্বরূপকে দেখিয়ে তিনি আমাদের বিষণ্ণতর করে তোলেননি। চারিদিকে ছড়ানো জীবনের মধ্য থেকেই স্নেহ-মিশ্রিত আনন্দধারায় তিনি আমাদের স্নাত করেছেন। বস্তুত তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকাদের যে প্রেম বাঙালীর বহুজন সমন্বিত পরিবার জীবনে অবাধ প্রকাশের সুযোগ না পেয়ে সামান্য ছল করে পাওয়া অবকাশের মধ্যে বর্ণাঢ্য হয়ে উচ্ছ্বসিত হয় তা আমাদের জীবনকে আনন্দময় করে তোলে। এইসব সৃষ্টিও সকৌতুক স্নেহে ও প্রশ্রয়ে অভিষিক্ত। এই স্নেহ এবং প্রশ্রয়ের অন্য নামই বাৎসল্য রস।

'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পের নায়িকা ন' বছর বয়সের রাণু। গল্প যিনি বলছেন তিনি রাণুর মেজকাকা—যিনি কৃতবিদ্য, প্রৌঢ়, কর্মরত কিন্তু অবিবাহিত; শিশু মনস্তত্ত্বের সম্পর্কে বিদেশী বই পড়ে সব জেনেছেন বলে নিজেকে পরিহাসের এবং প্রশ্রয়ের পাত্র বলে আঁকতে যিনি কুণ্ঠিত হন না। পরিবারের মধ্যে রাণুর বাবা, মা, দাদু, ঠাকুরমা, রাণুর বোন রেখা, ছোটখোকা এরা আছে, আরও হয়তো কেউ কেউ আছে যারা অন্য গল্পগুলিতে মাঝে মাঝে এসে উঁকি দেয়। এদেরই মধ্যে এই ন' বছরের মেয়েটি ধীরে ধীরে তার মেজকাকার সঙ্গে আমাদের হৃদয় অধিকার করে নেয়। অধিকার করে আমাদের হৃদয়ের বৎসলতা

নামক ভাবটিকে।

রাণু যে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ শেষ করতে পারল না অথচ দ্বিতীয় ভাগ থেকে আরম্ভ করে কাকার আইনের মোটা বইগুলি পর্যন্ত যার পছন্দ—সে নানা শিশুসুলভ চপলতায় কখনও হারিয়ে ফেলে তার বই, কখনও ইচ্ছে করে ছিঁড়ে ফেলে। কখনও চোখের জলের ফোঁটায় ভিজিয়ে আঙুলে ঘষে ঘষে লেখাগুলি তুলে ফেলে—কখনও কাজলের দাগে তা করে ফেলে অস্পষ্ট। বাল্য-বিবাহের পর চলে যাবার সময় সে তার মেজকাকাকে সান্ত্বনা দেয়। বধূবেশের আড়াল থেকে দশ বারখানি প্রথম ভাগের বাণ্ডিল বার করে মেজকাকাকে দেখিয়ে বলে, 'পেরথোম ভাগগুলি আমি হারাই নি মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।' শুধু তাই নয় কান্না ভাঙা গলায় আবার জানায় 'সবগুলি নিয়ে যাচ্ছি মেজকা, খু—ব লক্ষ্মী হয়ে প'ড়ে প'ড়ে এবার শিখে ফেলব। তারপর তোমাকে রোজ রোজ চিঠি লিখব। তুমি কিছু ভেব না, মেজকা।' নতুন শ্বশুরবাড়ি যাবার আগের মুহূর্তে এসব কথার পর লেখকের একদণ্ডের জন্যও অশ্রুর ধারা বন্ধ করার চেষ্টার ঘোষণা মিথ্যে হয়ে যায়।

৩.

'রাণুর প্রথম ভাগ' বা এই জাতীয় সবগুলি গল্পের আবহাওয়া সেই যুগের যে যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের অনেক পার্থক্য ঘটে গেছে। আজ যে স্বামী স্ত্রী ও একটি সন্তান এবং ঠিক সময়ে কাজ করে চলে যাওয়া কাজের লোকের পরিবার তা থেকে সেই যুগের পরিবারের অনেক পার্থক্য। সেই যুগে মধ্য-যুগের জের বয়ে চলা বহু মানুষের ভীড়ে জমজমাট পরিবার। কাজের মেয়েরাও সেখানে পরিবারভুক্ত, পরিবারের 'ঝি'। কর্মসূত্রে অনেক পরিবারই শহরবাসী অথচ উৎসবে, অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ক্রিয়াকর্মে যারা চিরকালীন বাঙালী গ্রাম-সমাজের আচারকৃত্যে বিশ্বাসী। সেইসব পরিবারের মেয়েরা আধুনিক মেয়েদের মত বেশি লেখাপড়া শেখেনি কিন্তু মনের প্রসারে, হৃদয়ের বিপুলতায়, প্রবল আত্মবিশ্বাসে তারা একালিনীদের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। তারা বই পড়ে সংসারবিজ্ঞান শেখেনি। শিখত মা, মাসী, পিসি, কাকিমা, জেঠিমা, ঠাকুরমা, দিদি বৌদিদের কাছ থেকে। এদের সংসারকর্ম দেখে যেমন কাজকর্ম শিখত তেমনি শিখে নিত এদের কথা বলার ভঙ্গি। বড় মহিলাদের বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে গড়ে তুলত নিজেদের বিশ্বাসের জগৎ। তাদের বিধিনিষেধে নিজেকে বাঁধা রেখে সরল সর্বজনমান্য এক সংসারযাত্রানির্বাহ পদ্ধতি শিখে নিত অল্প আয়াসে। পুরুষমানুষগুলি লেখাপড়া শিখত, বাইরের কাজকর্ম করত কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে ছিল নিতান্ত অপটু। এই অপটু অসহায় জীবগুলির প্রতি তাদের অগাধ করুণা ও স্নেহ। এই মেয়েরা বাক্‌পটু, রসনার অগ্রভাগে ঈষৎ বিষের সঞ্চারণে স্বভাব-

কোমলা হওয়া সত্ত্বেও আত্মরক্ষায় কুশলা। তাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে প্রকাশ পেত নিপুণভাবে সংসার পরিচালনার আগ্রহ। এই পারিবারিক মেয়েলী আবহাওয়ায় কোলের শিশুও অতি সহজে প্রৌঢ়াদের বাক্‌বিন্যাস তুলে নিতে পারে। ফলে মেয়েদের এই মুখের ভাষাই প্রকৃত মাতৃভাষার মত তাদের গড়ে তুলত। সংসার চালাবার প্রধান হাতিয়ার সেই ভাষা এবং সেই ভাষাভাষীর অন্তরালে সক্রিয় মূল্যবোধগুলি আমাদের জীবনের কৃত্য ও আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করত।

সুতরাং পরিবারের সকলকে আহার যোগান দেওয়া তাদের দায়িত্ব বলে রান্না খারাপ করলে তার প্রতি ভর্ৎসনা ধিক্কার, চারদিকে নজর রাখায় গিন্নীর অশিথিলতা, ছেলেপুলেকে মানুষ করার দায়িত্ব, অল্প বয়সে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো বা ঘরে নিয়ে আসা, সংসারে সকলকে মানিয়ে নেবার মনোভাব এসব উপকরণ না মনে রাখলে এই জাতীয় গল্পের স্বাদ পাওয়া যাবে না।

৪.

শিশুদের সবচেয়ে বড় গুণ অনুকরণপ্রিয়তা। শুধু বড়দের কাজকর্মের অনুকরণ নয়, বড়দের বাগ্‌-ভঙ্গির‌ও অনুকরণ তারা করে। বড়দের হাবভাবের চলন বলনের অনুকরণে একটি শিশুর ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা নিঃসন্দেহে হাসির এবং কৌতুকের। রাণুর ক্ষেত্রে এই কৌতুক আরও বেশি হয় যেহেতু আট ন বছর বয়স থেকেই সে একেবারে বাড়ির গিন্নীদের অনুকরণ করে তাদের ভাবগুলি একেবারে নিজের করে নিয়েছে। তার 'প্রকৃতিগত অকালপক্ক গিন্নীপনা' তাকে অনুকরণের স্তরে না রেখে তাকে আয়ত্ত করে নিতে চায়। কেবল তার অল্প বয়স আর ক্ষুদ্র অবয়বটির মধ্যে সেই গিন্নীপনা এঁটে ওঠে না বলেই সৃষ্টি হয় কৌতুককর পরিস্থিতির। শিশুসুলভ সমস্ত ব্যাপারেই রাণুর তাচ্ছিল্য। ফলে ফ্রক জামা, নোলকগয়নাতে তার আপত্তি। বলে 'আমার কি ওসবের বয়েস আছে মেজকা?' প্রথম ভাগের পাতা ছিঁড়ে খোকার হাতে ধরিয়ে দিয়ে রাগ দেখিয়ে বলে খোকা ছিঁড়েছে—'পেত্যয় না যায়, দেখ।' শুধু তাই নয় খোকার ওপরে সব দোষ আরোপ করে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, এ ছেলের কখনও বিদ্যে হবে মেজকা?' খোকাকে শাসনের কথায় বলে, 'কি করে শাসন করব বল মেজকা, আমার কি নিশ্বেস ফেলবার সময় আছে, খালি কাজ—আর কাজ।' বিয়ের উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যে মেজকাকা নামক তার সন্তানটির জন্য ব্যবস্থার কথায় বাড়িতে বড়দের কাছে শোনা বা শেখা বুলি উপযুক্ত ভাবে ও ভঙ্গিতে প্রয়োগ করে বলে 'আমরা সব বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলাম মেজকা যে বিয়ে কর বিয়ে কর। তা শুনলে গরিবদের কথা? রাণু কি তোমায় চিরদিনটা দেখতে শুনতে পারবে মেজকা?

এরপরে তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ করতে হবে তো? মেয়ে আর কতদিন নিজের বল?'

এসব কথা শুনে হঠাৎ রাণুর বয়স নিয়ে বিভ্রম জাগে, আর মুহূর্তেই মনে পড়ে যে ছোট মেয়েটির মুখে অত পাকা কথা শুনি তার বয়স মাত্র ন' বছর। ফলে তৈরী হয় এক লঘু আবহাওয়া। সস্নেহ স্মিত হাসিতে ভরে ওঠে পাঠকের মন।

৫.

'দাঁতের আলো' গল্পেও রাণু আছে—কিন্তু এই রাণু চিঠি লিখতে পারে। তার নিজের ব্যাকরণের পদ্ধতিতে লেখা হলেও এতে কারও অসুবিধা হয় না, কারণ সকলের বোধগম্য করবার জন্য মেজকাকা একটু আধটু পরিবর্তিত করে দেন তার বানান পদ্ধতি।

'মৈয়া' বলে যাকে মেজকাকা ডাকেন সেই মেয়েটির মাত্র তিনটি দাঁত উঠেছে, বাড়ি আলো হয়ে আছে এই তিনটি দাঁত বার করা হাসিতে। 'মৈয়া'র নাম ছবুরাণী, আসলে সে রাণুর ছোট বোন। গিন্নির ভাব দেখিয়ে রাণু বলে যায় 'তিনটি দাঁত এমন কি সম্পত্তি, মেজকা, যে মৈধার তোমার ঠ্যাকার রাখতে জায়গা নেই? আমি তো বুঝি না বাপু।'

'ঠ্যাকার' শব্দটিতে মেজকা বিস্ময় প্রকাশ করলে সে মত প্রকাশ করে যায় 'কিন্তু দাঁত হয়ে পর্যন্ত যা সব কাণ্ড, তা দেখে ঠ্যাকার বলব না তো বলব কি? উনি আজকাল দুধ খাবেন না। দুধ খাব কেন? ওতে কি দাঁতের দরকার হয়? আমি খাব কয়লা, চায়ের কাপ, খোলামকুচি, দাদুর খড়ম, কুটকুট শব্দ হবে, লোকে বলবে হ্যাঁ ছবুরাণীর দাঁত হয়েছে। অথচ পুঁজি তো সবে তিনটি।'

বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে বাবুলবাবুর বয়স মাত্র ছ' মাস। তার উঠেছে একটি দাঁত। বাবুলবাবুর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এইভাবে: 'মানুষটি গম্ভীর প্রকৃতির। কপালটি প্রশস্ত হওয়ায় এবং মাথার চুলের ভাগ অল্প হওয়ায় ভাবটি যেন একটু মুরুব্বী গোছের। আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া পাতলা ঠোঁট দুইটি চাপিয়া শান্তভাবে সংসারের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে থাকেন।' কিন্তু রাণুর ভাবনা অন্যরকম। ওর মতে ছেলেরা ভাবে 'দাঁত যদি না রইল ত কিছুই নয়। হ্যাঁ মেজকা, ঠিক। আমি ভেবে সারা, বাবুল সর্বদা অমন ঠোঁট বুজে থাকে কেন, একটু ফিক করে হাসলে কখনও যদি, অমনই টপ করে ঠোঁট বুজে ফেললে। কোনো হদিস পাই না। তারপর বুঝতে পারলাম, আচ্ছা, বেচারীর একটি মাঝের দাঁত বলে এত লজ্জা গো, আহা! তার ওপর দাদু যখন একদন্ত, হেরম্ব, লম্বোদর, গজানন বলে ঠাট্টা করেন, ও বেচারীর যেন মনে হয়, মা পৃথিবী, দ্বিধে হও, আর কত সইতে হবে।'

ছেলেরা যে ভাবে দাঁতেই সৌন্দর্য একথা প্রমাণের জন্য ও আরও যুক্তি দেয়:

'ওদিকে তোমার মৈয়ার গুমর তিনটি দাঁত বলে আর এদিকে বাবুলবাবুর লজ্জা একটি দাঁত নিয়ে; তাহলে আর কি সন্দেহ রইল মেজকা যে, ছেলেরা নিশ্চয় ভাবে দাঁত নিয়েই তাদের যা কিছু বাহার?'

মেজকা কর্মস্থানে চলে গেলে সে চিঠি দিয়ে মোক্ষম প্রমাণ পাঠিয়ে দেয়। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ছবুরাণী ঘুমিয়ে পড়ার পর বাবুল হঠাৎ কেঁদে ওঠে। তার কারণ অন্বেষণ করতে দেখা গেল সে ছবুরাণীর মুখের মধ্যে আঙুল দিয়েছে আর ছবুরাণীর দাঁতের কলে আঙুল আটকে গেছে—ছবুরাণী কামড়ে দিয়েছে। রাণুর মতে এর মূল কারণ এই রকম, 'দাঁত যে উপড়ে ফেলা যায় না সে আর ও ছেলেমানুষ কি করে জানবে বল? ভাবলে দাঁতের গেরস্থ ঘুমুচ্ছে এই ফাঁক-তালে একটা চুরি করে নিই। আমার তাহলে দুটি হবে দিব্যিটি।' হুঁশিয়ার গেরস্থ ছবিরাণীর কামড়ে সে উদ্দেশ্য নাকি সফল হয়নি।

'লজ্জা নিবারণ হরি' নাকি সব দেখতে পান। তিনি বাবুলবাবুর এত হেনস্থা আর দেখতে না পেরে ব্যবস্থা করলেন। তার পরদিন বাবুলের জ্বর, পেটের অসুখ। 'ছেলে যেন নেতিয়ে পড়ল। বললে পেত্যয় যাবে না, তার পরদিন নীচে একটা দাঁত।'

বাড়ির ছেলের দাঁত ওঠার ঘটনায় পরিবারের সকলের মধ্যে আনন্দদায়ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু রাণুর নিজস্ব অভিমত যে দাঁতেই ছেলেরা নিজেদের সৌন্দর্য খোঁজে তাই এক দাঁতের বাবুলবাবুর লজ্জা দূর করতে লজ্জানিবারণ হরি দাত পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন—এই অভিনব ব্যাখ্যাতে বাৎসল্যের রসটি আরও মনোরম হয়ে দেখা দিল। রাণুর গিন্নীসুলভ বাক্‌বিন্যাস একে আরও মধুর করে তুলেছে। দাঁত ওঠার বর্ণনাটি রাণুর মুখ দিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে বাবুলবাবুর প্রতি যেমন তেমনি রাণুর প্রতিও পাঠকের স্নেহধারা বর্ষিত হতে থাকে।

'বাদল' গল্পে দু' বছর বয়সের বাদলের অসম্ভব দৌরাত্ম্য মেজকাকার সব শিশু মনস্তত্বগত কেতাবী ধারণাকে নিষ্ফলা করে দেয়। রাণু এখানে আর পাঁচটি শিশুর মধ্যে একজন। বাদলের অনুক্ষণের দুষ্টুমির জন্য সেও ব্যতিব্যস্ত। তার ভূমিকা এখানে নেই বললেই হয়। মেজকাকা ছোটছেলেদের শেখাবার আধুনিক পদ্ধতির পরীক্ষায় যখন নিরত তখন সেই অবসরেই বাদলের দাদুর প্রিয় সটকার নল বাদল লুসী কুকুরের লাগাম হিসাবে ব্যবহার করে। তাও অখণ্ড অবস্থায় নয়। দ্বিখণ্ডিত করে। এক অর্ধখণ্ড লাগামরূপে ব্যবহৃত হয় অপর খণ্ডটি লুসীর অন্যসন্তানদের খাবার জিনিস হয়ে যায়। লুসীর মুখে যা লাগাম-স্বরূপ থাকে তা মাংস বিভ্রমে লুসী এমনভাবে চিবোয় যে ওটা পুনরায় টুকরো হতে আর বেশি সময় লাগার কথা নয়। এ অবস্থায় বাদলের মা বাদলকে পেটায়, ঠাকুরমা তখন পুত্রবধূকে বকাবকি করেন, ঠাকুরদা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' বকুনি

দেন গল্পকার মেজকাকে, আধুনিক মনস্তত্ত্বের শ্রাদ্ধ সেই বকুনিতে সম্পন্ন হয়ে যায়। তাঁর ছেলে মানুষ করার কথায় বাদলের ঠাকুরমা বাদলের মেজকাকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঝঙ্কার দেন 'ছাই মানুষ করেছ, ওই নমুনা নিয়ে আর বড়াই করতে হবে না।'

এই পারিবারিক কুরুক্ষেত্রের অন্তরালে যে বস্তুটি থাকে তা বাদলের নির্ভেজাল দৌরাত্ম্য। তাকে যেন কিছু স্পর্শ করে না। ফলতঃ গল্পের মূল রসটিও বাৎসল্য রস হয়ে দাঁড়ায়। আর সে রস বিশিষ্টতা পায় পরিবারের সকলের অবস্থান থেকে। বাদলকে কেন্দ্রবিন্দু করে যে যেখানে যে বিশিষ্টতা নিয়ে পরিবারে অবস্থান করছে সে সেখান থেকেই বৎসলতাকে দীপ্তিদান করছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাৎসল্য রসসিঞ্চিত সবকটি গল্পেরই একটি বিশেষ পারিবারিক পটভূমিকা আছে। কয়েকটি গল্পের ভিতর দিয়েই সেই পারিবারিক পটভূমিকাটি চিনে নেওয়া যায়। সেজ ভাইয়ের বউটি যে দরকারমত শিশুদের ওপর হাত চালায়; বড় ভাই যিনি নিতান্ত অনুরক্ত জেঠা—যাঁর মাথায় যেটা যখন ঢোকে সেটা চট করে বেরিয়ে যায় না—রাণুকে গৌরীদান তো গৌরীদান, বাদলকে ঘোড়া কিনে দাও তো ঘোড়া না কেনার জন্যেই বাদলের সব দৌরাত্ম্য সেটা কিনে দাও তো সব সমস্যার নিরসন; মা যিনি পূজোপাট আচার নিয়ম নিয়ে ব্যস্ত আর ছোটছেলেদের মানুষ করে তোলার ব্যাপারে পুরুষ মানুষদের অপারগতার সম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাসী, বাবা যিনি দরকারমত নাতি-নাতনীদের পক্ষ অবলম্বনকারী; ছোট ভাই যে বৌদিকে আর ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে গরমের রাতে ছাতে যায় বৌদিকে ছাতের আলসের উপর বসতে অনুরোধ করে বলে, 'চল বউদি, আলসের উপর বসি, খুব হাওয়া লাগবে, অত চেপে মারা পর্দা মানি না', যে নিজে আবার ভাইপোর 'ছেয়ে' (ছেলে) হয়ে যায় [দ্র. 'ননীচোরা' গল্পটি], ভাইপোকে বেশিক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি না করে থাকতে পারে না; রাণু, রেখা, ছবিরাণী, বাবুলবাবু, খোকা, বাদল এইসব বাড়ির ছেলেমেয়েরা এমনকি কুকুর লুসী আর তার বাচ্চাগুলি—এরা সকলেই পরিবারের বিশিষ্ট সদস্য। এছাড়া প্রত্যেক গল্পের বর্ণনাকারী মেজকাকা তো আছেনই। যিনি ছেলেমেয়েদের গড়ার ভার নেন, আইনের বই পড়েন, যিনি বিয়ে করেননি। দেশী-বিদেশী বই পড়েন যাতে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার পদ্ধতি শিখতে পারেন। সকলেই ক্রমে পরিচিত হয়ে ওঠে, পরিচিত চরিত্রের মত আচরণ করে।

'স্বয়ম্বরা' গল্পটির কৌতুক যেন রাণুর রূপটিকে সামনে রেখেই আবর্তিত হয়েছে। রাণুর প্রথম ভাগ গল্পেই ন' বছর বয়সের রাণুর গৌরীদানের প্রসঙ্গটি জেনেছি। দাদার মাথায় গৌরীদানের ঝোঁক চেপেছিল তো মেজভাই কিছুতেই

তাকে টলাতে পারেনি তার সিদ্ধান্ত থেকে। রাণুর গায়ে-হলুদের দিনই শ্রীমতী ডলিরাণী যার বয়স মাত্র সাত বছর সে বিয়ে করার জন্য লুব্ধ হয়ে পড়ে। আর কারুর কাছে ইচ্ছাটি ব্যক্ত করতে না পেরে মেজকাকাকে সে তার মনের কথা খুলে বলে, 'মেজকাকা আমার বিয়ের যোগাড করে দেবে?' মেজকাকা চমকে যান কিন্তু আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আজ না হয় কালই দিতেই হবে' কিন্তু মুস্কিল হল খরচ যোগাড করা। রাণুর বিয়েতেই কত খরচ। ডলিরাণী তাতে মেজকাকাকে আশ্বস্ত করে বলে, 'পয়সা আমি যোগাড করে রেখেছি তোমাদের ভাবতে হবে না।' মেজকাকাকে সে ব্যাপারে প্রমাণ দিতে সে দেরি করে না। তার মাখন রঙের ক্যাসবাক্স থেকে তার জমানো পয়সা দেখায়। আধলা, পাইপয়সা মিলে যার মোট পরিমাণ সওয়া ছ' আনা। ডলিরাণীর অবশ্য একটি শর্ত আছে, তার শ্বশুরকে হওয়া চাই মোটা, তার মাথায় থাকা চাই টাক। লেখক সেরকম মেদসম্পন্ন, টাকওয়ালা অথচ সভাশোভন শ্বশুরের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চান।

শ্রীমতী ডলিরাণী যে নিজের বিয়ের যোগাড় করতে বলার জন্য আবদার করছে তার প্রতি মেজকাকার মনোভাব বেশ সহানুভূতিযুক্ত। তিনি বলছেন, 'মনে করিলাম, এটা নির্জলা নির্লজ্জতার নিদর্শন নাও হইতে পারে; সম্ভবতঃ উৎসবের ছোঁয়ায় লাগিয়াছে।'

এই সহানুভূতিও বাৎসল্য রসের।

অভিনব গুপ্ত বলেছিলেন যে রসসৃষ্টির মূলে কবির মনে নিজের চিত্তবৃত্তির আস্বাদন বা অনুভূত রস। সেটাই 'পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ' তাঁর লেখার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বাৎসল্যের এই রূপ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব আস্বাদন থেকেই ছড়িয়েছে। কিন্তু এটা কিছু বলবার মত নতুন কথা নয়। বলবার কথা হল যে, বাৎসল্যের মধ্যেও বাৎসল্যের রূপ ফুটিয়েছেন তিনি—। শিশুর দৃষ্টিতে জগৎকে দেখার মধ্যেই বাৎসল্যের রূপ ধরা পড়ে—কিন্তু শিশুর দৃষ্টিতে শিশুকে দেখার মধ্যে যেন আর এক মধুরতর বাৎসল্যরস স্পষ্ট হয়। শিশুর ক্রিয়াকলাপ আঁকাই সেখানে মুখ্য কথা নয়। শিশুর কার্যাবলী, মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল মন ও খেয়াল, তার কান্না, হাসি, অভিমান, অনুকরণপটুতা, তার আদর খাওয়ার ইচ্ছে, তার দৌরাত্ম্য এগুলির নিছক বর্ণনই পাঠকের মনে বৎসলতার ভাব সঞ্চার করতে সমর্থ। কিন্তু বিভূতিভূষণের গল্পে এই শিশুদের ঘিরে যে শিশুরা আছে অথবা অন্য বড় যারা আছে তারাও বৎসলতার বিচিত্র দিক উদ্‌ঘাটন করে চলেছে। বস্তুত তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাতেও বাৎসল্যের চেহারাটি আশ্চর্যরূপে ধরা দেয়। ওপরে যেসব গল্পের কথা বলা হল তার সব কটিতেই এর পরিচয় পেয়েছি। 'দাঁতের আলো' গল্পে বাবুলবাবুর কীর্তি আর তার দাঁত ওঠা রাণুর দৃষ্টিতেই আলোকিত হয়ে ওঠে, বাদলবাবুর সমস্ত দুষ্টুমী অন্য শিশুদের

অভিযোগ এবং ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই বেশি করে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। এ ছাড়া শিশুটিকে ঘিরে পরিবারের বাবা মা দাদা বউমা ঐ যে বড়রা আছেন তাঁদের কথাবার্তা আচার-আচরণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তা বাদলের নির্বিকার দৌরাত্ম্যের ছবিটি অত উজ্জ্বল করে তোলে।

'বাঘ' গল্পটিতেও তাই। লেখকের বাড়ির খিড়কির দিকটায় যেখানে কয়েকটা গাছের ডালপালা মিলে অন্ধকারকে ঘন করে রাখে, যেখানে একটা বিচালির গাদা জায়গাটাকে আরও অন্ধকার করে রেখেছে সেখানে নাকি একটি বাঘ এসে বসে আছে, যে সে বাঘ নয় একেবারে জাত বাঘ, কাঁচা সোনার মত হলদে রঙের ওপর হাত খানেক লম্বা কালো ডোরা, বিশাল মুখ, সজারুর কাঁটার মত গোঁফ। এ বাড়িতে ঢুকবার আগে বুধনী গয়লানীর যে মেয়েটা অষ্টপ্রহর ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে পাড়া মাথায় করত তাকে পেটের মধ্যে পুরেছে—তবে গায়ে দাঁত বসায়নি। ফলে পেটে গিয়েও সে ট্যাঁ করতে সুরু করেছে যখন, তখন নাকি জ্বালাতন হয়ে বাঘটা হরুণী মাহাতোর বুড়ো বাপকে তুলে নিয়ে চলে আসে। সেই বুড়োকে দুই থাবা দিয়ে মুড়ে মুখের মধ্যে ফেলে যেই দাঁতের চাপ দিয়েছে অমনি বুড়োর হাড়গোড় একসঙ্গে ভাঙার কী বিরাট কড়-কড-কড়াৎ শব্দ। এদিকে বাড়িতে, গুজরাটী মোষ যার নতুন বাচ্চা হয়েছে সে বাঘটিকে দেখেছে—তারপর সেই মোষ ভীষণ রেগে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে। ভয়ে বাঘ এমন আড়ষ্ট হয়ে গেল যে পেটের মধ্যে বুধনীর মেয়েটারও চিঁচিঁ শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। —এরকম রোমহর্ষক বর্ণনার মাঝখানে মেজকাকা রাণুকে বলেন শিশুদের অতটা ভয়াবহ জিনিস শুনিয়ে ভয় দেখানো ঠিক নয়। যথারীতি তিনি বলেন বইয়ে আছে এ কথা, দেখিয়ে দেবেন পরে। রাণু—যে এখন মা—সে ক্লান্তি আর বিরক্তিতে উঠে পড়ে বলে, 'ভয় দেখে যাও মেজকাকা, এততেও ও দজ্জালের চোখে একটুও ভয় আছে কি না।'

এক মুহূর্তে দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াতে ব্যর্থ মা, শিশুটির বড় চোখ মেলে নির্ভয় চাউনি এসব ছবিই এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে শিশুটিকে সব পাঠক নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়, খুসি হয়ে ওঠে। তাকে ঘুম পাড়াতে যে বাঘ-মোষের লড়াইয়ের গল্প ফেঁদেছে সেই মায়ের ক্লান্ত ও বিরক্ত মুখচ্ছবির পরিপ্রেক্ষিতে নিভয় শিশুটির চেহারা আমাদের হৃদয়ের সব স্নেহপ্রীতি লুঠ করে নেয়।

মায়ের গল্প বলা, ক্লান্ত, ঘুম না পাড়াতে পেরে বিরক্তি, 'রাজ্যির পাট' পড়ে থাকায় মেজকাকার কাছে তার নাতিকে রেখে কাজে চলে যাওয়ার ছবি আমাদের বাৎসল্যরসের অতিরিক্ত একটা স্নিগ্ধ পারিবারিক রসে তৃপ্ত করে তোলে।

এই তৃপ্তি যে কত গল্পে পাই তার অন্ত নেই। আমরা আলোচনা করিনি—

সেই 'পোনুর চিঠি'-তেও তাই। এমনি আরও আছে। বাৎসল্য রসের সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সবচেয়ে দক্ষ শিল্পী। প্রথাগতভাবে শিশুর ক্রিয়াকলাপ বর্ণনায় তিনি থামেননি—আমাদের পরিবার জীবনের প্রেক্ষিতে তাকে স্থাপন করেন বলে তাঁর সৃষ্ট বাৎসল্য রস এক নূতন মাত্রা লাভ করে। প্রত্যেক শিশুর প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত তার পরিবারই—। আমাদের পরিবার জীবন আমাদের ঘরের শিশুদের কাণ্ডিকলাপের পটভূমিকায় থাকে বলে আমাদের স্বস্তি তৃপ্তি এত বেশি হয়। এই পরিবার আজকের পরিবারচিত্র থেকে আলাদা হলেও আমাদের আকাঙ্ক্ষিত।

৭.

বাৎসল্যকে আস্বাদ্য রস বলে আমরা বহুকাল আগেই স্বীকৃতি দিয়েছি। তা নইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অলঙ্কার শাস্ত্রে দাস্য সখ্য আর মধুর রসের সঙ্গে বাৎসল্য রস এত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে কেন। 'দৌড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে বুক বাহিয়া পড়ে ধারা' এই পদে বালক কৃষ্ণের পিতার কাছে মায়ের সম্বন্ধে নালিশ করার যে ছবি আমরা দেখি তা আমাদের অনেক-দিন আগেই প্রীতিরসে সিক্ত করেছিল। নিঃসন্তান বিধবাকে বালগোপালের মূর্তি ধরিয়ে দিয়ে আরাধ্য দেবতা বানাতে কেন পরামর্শ দেবেন শাস্ত্রকারেরা? জীবনে যা ঘটে ধর্মে সাহিত্যে তো তারই প্রতিফলন!

Instinct হিসাবে বাৎসল্যকে আমরা বলি Philial Instinct, সমস্ত জীব-জগতে তার প্রগাঢ় পরিচয় ছড়ানো। আমরা কেউই এই instinct বঞ্চিত নই। জীবনের নানান জটিলতা বঞ্চনা ক্ষোভ ব্যর্থতা হতাশার মধ্যেও নিজের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারের মধ্যে এসে যখন একটি শিশুকে ঘিরে নিত্য নবায়মান অথচ চির পুরাতন নির্ভার শৈশবকে দেখতে পাই তখন জীবনের প্রতিই আমাদের আস্থা যায় বেড়ে। নবজাতকের জন্য এ যুগের কবি যখন শপথ নেন 'এ বিশ্বকে এ শিশুর যোগ্য ক'রে যাব আমি—নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার' তখন বুঝি তার প্রতিজ্ঞার আড়ালে শিশুকে দেখার বিস্ময় কতখানি। এ বিস্ময় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাৎসল্য রসের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে।

'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছিলেন, যাঁহারা "রাণুর প্রথম ভাগ" এই নামের গল্পটি পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন—"রাণুর দ্বিতীয় ভাগ" জিনিসটা আকাশকুসুম। তবুও শুধু নামের জের ধরিয়া রাখার জন্যই বইটির এই নাম রাখা হইল। এটি আমার ব্যক্তিগত মোহ।'

'সমস্যার দেশ। তাই "দ্বিতীয় ভাগ" (বর্ণপরিচয়) হইতেই আমাদের কাছে সমস্যার উদয় হয়—হাতে খড়ি হিসাবে, বানানের আকারে। এখন পর্যন্ত ওই বইটাকে আমরা এড়াইয়া চলি।'

'সেইজন্য এটাও মুখপাতে বলিয়া রাখিতে চাই যে, "রাণুর প্রথম ভাগে"-র মতোই "রাণুর দ্বিতীয় ভাগ"ও সরল ঋজু এবং সমস্যামুক্ত। বরং "রাণুর প্রথম ভাগে"র একটা মিশন ছিল, নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্যমত দেশের সমস্যামন্থর হাওয়াটাকে একটু হালকা করা। "—দ্বিতীয় ভাগ" যদি সে মিশনে সাহায্য করিতে পারে তো কৃতার্থ হইব।'

রাণু প্রথম ভাগই শেষ করেনি—কাজেই দ্বিতীয় ভাগ যে আকাশকুসুম তা বলাই বাহুল্য। তবু লেখক এই নামের জের ধরে রাখার জন্য রাণুর দ্বিতীয় ভাগ নাম রাখলেন। তাঁর এটা ব্যক্তিগত মোহ বলে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন তিনি। আমরা বুঝি এ তাঁর রাণুর প্রতি মোহ নয়—এ মোহ বাৎসল্যের প্রতি। এ মোহ তাঁর সত্তায় জড়িত। 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' বইটির 'দাঁতের আলো' আর 'বাদল' গল্প দুটির আলোচনা আমরা করেছি। বুঝেছি বাঙালীর অশ্রুর ধারা একদণ্ডের জন্য হলেও তা বন্ধ করার জন্যই তাঁর লেখনীধারণ। এই তাঁর 'মিশন'। কিন্তু এসব গল্প পড়ে চোখে জল না এসে পারে না। কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণের সময়ে যেমন চোখে জল আসে। তবু সেই চোখের জলের উপরেও স্নেহের হাসিটি গিয়ে পড়ে আর চোখের জল যেন ঝিকমিক করতে থাকে সেই আলোয়।

রাণুর তৃতীয় ভাগে দেখি লেখকের 'মিশন' যেন কিছু পরিমাণে পালটে গেছে। এবার তিনি দুঃখের দুনিয়া যারা দু ঘণ্টার জন্যও ভুলে থাকতে চান তাদের জন্য লেখার কথা বলেও আবার বলেন 'উপলক্ষে অনুপলক্ষে দুই ফোঁটা চোখের জল না ফেললেও যাদের অন্ন পরিপাক হয় না তাদের জন্যও দু একটি কাহিনী আছে।' এতদিনে লেখক যেন সম্পূর্ণ বুঝে নিয়েছেন বরযাত্রীর গণশা, তিলু, কে, গুপ্তর মত চরিত্র দিয়েই শুধু নয়, রাণুর মত চরিত্র দিয়েও তাঁর 'মিশন' সাধিত হয়—যেখানে স্নেহের হাসিতে চোখের জলের ধারাও মেশে।*

রচনাটি 'সৌরভ' পত্রিকা (সমস্তিপুর)-র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

"গাই যুঁই ফুলেরই গান"

শ্রীপদ্মলোচন বসু

যুগযন্ত্রণায় অতিচর্বিত উপলক্ষে অনেকে হয়ত আজকের দিনে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনার উপযোগিতায় সন্দেহ প্রকাশ করবেন। সাহিত্যে, বিশেষ কথাসাহিত্যে যুগমানসের প্রতিফলন অনিবার্য এবং শ্রেয়ও বটে। ২য় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে বাংলার জীবনে ও মানসে যে সর্বাত্মক ভাঙন দেখা দিয়েছে, তার প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্যে অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন জাগে। বিপর্যস্ত জীবনের পরিচয় আজ দেউড়ি পেরিয়ে বন্যার মতো প্রবেশ করেছে বোধের আঙ্গিনায়। সাহিত্যে সেই একই অভিজ্ঞতা মানুষের মনকে একান্তভাবে ক্লান্ত করে এবং বহুলাংশে তাকে ঠেলে দেয় নৈরাশ্যের ভুলভুলাইয়ায়। সাহিত্য যদি উৎক্রান্তির পথ না দেখায়, অন্ততঃ দূরাগত আলোর ইসারা না জোগায়, তবে তাকে শ্রেয় বলে মেনে নিতে দ্বিধা জাগে। এই শ্বাসরোধকারী পরিবেশে যদি কেউ 'মেসিনগানের সম্মুখে গাই যুঁই ফুলেরই গান' বলে এগিয়ে আসেন তবে তাকে বিনা দক্ষিণায় ফিরিয়ে দিতে পারি না।

সংসারের আবর্তে যে সব প্রিয় চিত্র বিবর্ণ হতে চলেছে, পারিবারিক বন্ধনের যে মাধুর্য অবলুপ্তপ্রায় তার মমতাসিক্ত পুনঃস্মরণ কতটা প্রয়োজন, বিভূতিভূষণের রচনা তার সাক্ষ্য দেয়। সব থেকে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এক হার্দিক পরিবেশ রচনা করতে তাঁকে কোমর বেঁধে উপাদান সংগ্রহে নামতে হয় নি। তাঁর ছোট গল্পে লক্ষ্য করেছি, কত অবলীলাক্রমে তিনি অতি পরিচিত পরিবেশে ও পাত্রপাত্রীকে ঘিরে অসাধারণ রস সৃষ্টি করেছেন। বেলে-তেজপুর কিংবা সিমুর, সাঁতরা যেখানেই যাও কোন পরিবেশ অথবা মানুষজন কি খুবই অপরিচিত। এমনকি তাদের সংলাপেও নেই অজানার চমক। তবু চোখ বা চিত্ত কোথাও নোঙর ফেলতে চায় না—প্রত্যাবর্তনে পা বাড়ায় না। এখানেই শিল্পী বিভূতিভূষণের সৃজন রহস্য।

বস্তুতঃ, বিভূতিভূষণের সাহিত্য সরলতা, সরসতা আর সহৃদয়তার ত্রিবেণী সঙ্গম। মনে পড়ে, দ্বারভাঙ্গাবাসী এক রসজ্ঞ বন্ধুর (হিন্দীভাষী) বৈঠকখানায়

দেখেছিলাম বিভূতিভূষণের 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম, বইটি আপনি পড়েছেন? সামনে-পিছনে মাথা দুলিয়ে তিনি উত্তর দেন কয়েকবার। জানতে চাইলাম—কেমন লাগল? জবাব শুনে অবাক হয়ে যাই। বন্ধুটি, তুলসীদাস যার নিত্যসঙ্গী, বলিষ্ঠ কণ্ঠে বল্লেন—কোন কারণে মন যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন এই বইটা খুলে কিছুক্ষণ পড়লেই মনের মেঘ কেটে যায়।

বলা বাহুল্য, এ কোন সাহিত্যিক মূল্যায়ন নয়, তবে নির্ভেজাল দিশারী। আত্মার উদ্দীপন তো সাহিত্যেরএক মহৎ দায়! সাহিত্য সৃজনের অবলম্বন এবং জীবনযাপনের ভঙ্গিমার একই তলে অবস্থান ইতিহাসে খুব সুলভ নয়। চন্দন কাঠ কাঠই তবু তার ঘর্ষণে সুরভিত সৃষ্টি। বিভূতিভূষণ এমনই এক ব্যক্তিত্ব। বহিরঙ্গে কোথাও রসের চিহ্ন নেই (অন্ততঃ আমি যখন দেখেছি), অথচ কাগজ-কলমের সংযোগে যা সৃষ্টি হয়েছে তাতে পাই আত্মার সৌরভ। অনেকের কাছে তিনি মূলতঃ হাস্যরসের স্রষ্টা। কথায় কথায় তাই এসে পড়ে গণশা, ঘোৎনা, কে, গুপ্তর প্রসঙ্গ। অনন্যসাধারণ সেই রচনার সামান্যতম মানহানি না করেই বলা যায় সেই সব নয়, এমনকি প্রধানও নয় বিচারশালায় সমন পেলে স্বর্গাদপি গরীয়সীকেই একমাত্র সাক্ষী মানলেই মামলা জোরদার করতে পারার ভরসা রাখি।

হ্যাঁ হাস্যরস আছে, থাকবেই, কারণ দেহের রক্তের মতোই বিভূতিভূষণের সজাগ সতর্ক অনুভবে রসের প্রবাহ সহজাত। ঘুড়িপৃষ্ঠারূঢ় রসিক হোমিও-প্যাথের সুযোগ্য বাক্সবাহক হারাণের রোগনির্ণয়ে সোচ্চার ঘোষণা 'নক্স্-ভোমিকা', সুযোগমাত্রই তার যত্রতত্র তবলালহরা, চলন নিয়ে আস্ফালনের জবাবে শ্যালিকার রসাল মন্তব্য (তুমি যদি এখন লঙ্কা ডিঙোও), স্বয়ং রসিক-লালের সদাসন্ত্রস্ত বালখিল্যতা ও বাদলবন্দী হয়ে ভৃত্যকে কাব্যালোচনায় অর্ধমৃত ক'রে তোলা, বিপিনচন্দ্রের নিরুদ্দেশ যাত্রার ছলনায় বিপত্তি প্রভৃতি অসংখ্য নজির আছে তবু বলব, এহ বাহ্য। আসল ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে রূপদক্ষ শিল্পী তিল তিল করে সৃষ্টি করেছেন তিলোত্তমা। না, উপমাটা হয়ত শ্রদ্ধেয় হয় নি। বরং বলা উচিত, খড়, কাঠি, মাটি দিয়ে গড়েছেন অপরূপ দশভুজা মূর্তি। গ্রামীণ (গ্রাম্য নয়) ভাষার মেঠো আমেজে, পারিবারিক আলাপ এবং আচার-আচরণের অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসের যুগলবন্দীতে কাহিনী প্রবাহিত হয়েছে গ্রাম্য নদীর মতো শান্তছন্দে আর সৃষ্টি করে চলেছে এক সবুজ-সজীব বাতাবরণ। বল্গাহারা উদ্দামতা নেই, আছে অবারণ চলা ; জটিলতাবিহীন হয়েও যা চিত্তাকর্ষক, যেন ঘরের মেয়ের আনন্দিত চিত্তের বাধাহীন নৃত্য।

স্বর্গাদপি গরীয়সীর প্রধান ঐশ্বর্য একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শচিত্র যা হারিয়ে গেছে যন্ত্রযুগের অর্থকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার অভিঘাতে। লেখক শত-ছোরা

অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে যে চিত্র উপহার দিয়েছেন সেখানে ভ্রাতৃস্নেহ, অগ্রজের প্রতি সহজাত আনুগত্য, বৃহৎ পরিবারে গৃহিণীর সমদৃষ্টি, আশ্রিতজনের প্রতি উদার লালন রীতি প্রভৃতি উজ্জ্বল জীবনচর্যা অস্বাচ্ছন্দ্যের দীনতায় বা ঐশ্বর্যের স্পর্ধিত উৎপীড়নে ক্ষুন্ন হয় নি। এই মহান ক্যানভাসের মুখোমুখী হয়ে আত্ম-কেন্দ্রিক অবক্ষয়ী সমাজের বর্তমান বাসিন্দারা পাবেন পরিদূষণমুক্ত বাতাসের স্বাদ। আধুনিকতা বা অন্য কোন অজুহাতে বাংলার পড়ুয়া মন থেকে এই স্মরণীয় সাহিত্যকারকে সরিয়ে রাখা যাবে না, উচিতও হবে না।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় বিহারের ভাষা ব্যবহার

মঞ্জুলী ঘোষ

মৈথিলীভাষে বিশেষ পারংগমতা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে একবার এক ভারি মজার বিপদে ফেলেছিল। মিথিলার পাঁজিয়ার (ঘটক) সম্প্রদায়ের স্বনামধন্য সদস্য তুনমুন ঝার 'তাগ' পড়েছিল পাগ মাথায় স্বয়ং তাঁরই উপর। কুশী প্রাঙ্গণে ইতঃস্তত: ভ্রমণরত বিভূতিভূষণ এসে পড়েছিলেন সৌরাঠ মেলার গায়ে। সৌরাঠ মেলা মিথিলার বিখ্যাত বরমেলা, যেখানে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষই উপস্থিত থাকেন। পাত্রীপক্ষ সরাসরি বর বাছাবাছি করেন।—বিভূতিভূষণের মাথায় সত্ত চড়ানো হায়দার মিঞার উপহার, বাহারে গোলাপি পাগ (পাগ মৈথিলী ব্রাহ্মণদের শিরস্ত্রাণ)। তুনমুন ঝার শিকারী সোৎসুক প্রশ্ন—"আপনেকে ঘর?" (আপনার বাড়ি কোথায়?) এর উত্তরে এমনই প্রকৃষ্ট অবাধ মৈথিলীতে আলাপন এগোতে লাগল যে পঞ্চাশ উত্তীর্ণ বিভূতিভূষণকেই প্রায় গেঁথে ফেলেছিল তুনমুন, কনের খোঁজে মেলায় আসা পাগ-মাথায় বয়স্ক মৈথিল বর ভেবে। কথাবার্তায় কৌতুকটুকু সে ধরতে পারে নি, কথাবার্তা যে কোন মৈথিলের সঙ্গে নয়, তা-ও সেই ঘুঁদে ঘটক প্রবরও বুঝতে পারে নি।

১। তিন পুরুষে মিথিলা নিবাসী পরিবারে জন্মে আজন্ম দ্বারভাংগাবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সেই অঞ্চলের ভাষা বলা হয়তো বিস্ময়ের নয় কিন্তু যে সহজ সাবলীলতায় তিনি আপন রচনাতেও তার ব্যবহার করে গেছেন, তার উল্লেখ ও আলোচনা বিস্ময়নন্দিত হবে সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর যেসব সাহিত্যগুণের জন্য স্থায়ী 'সমাদর-সম্মান' পেয়েছে, সর্বস্বীকৃত ভাবে তা হল হাস্যকৌতুক রচনা; বাৎসল্যরসের অমেয়মূল্য অনেকগুলি ছবি; গার্হস্থ্য রসের নির্বাপিত-প্রায় দ্যুতিকে শক্তি ও প্রতিভায় স্থায়ী করে যাওয়া; দোরের পাশের ধানশীর্ষের শিশিরবিন্দুতে নিজে মজে থেকে পাঠককেও মজিয়ে রাখতে পারা ইত্যাদি। তবে এ যাবৎ অচর্চিত তাঁর ভাষাব্যবহারের এই উল্লেখযোগ্য দিকটিও বিশেষ

চর্চা ও অভিনিবেশ দাবী করে। গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণবিবরণ—সর্বত্রই ঝরঝরে গল্পের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ শিল্পকুশলতায় তিনি বিহারের নানা ভাষার মিশেল দিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই মৈথিলীর ব্যবহার সর্বাধিক। তাঁর উপন্যাসে, গল্পে এবং আপন অভিজ্ঞতাজাত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গুলিতে মৈথিল চরিত্রও অনেক; তবে বিহারের, বিশেষ করে উত্তর বিহারের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষারও বহুল ব্যবহার করেছেন তিনি।

অতি পরিচিত 'উপভাষা' শব্দটি প্রায়ই কোন সর্বগ্রাহ্য ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে গৃহীত হয় তারই নিম্নমানের ভিন্ন একটি ভাষণ-নমুনা (variety) বলে। ইংরেজিতে 'dialect' এবং 'dialectal' (বা ভাষাগত) ইত্যাদি শব্দগুলি বিষয়েও একই মানসিকতা দেখা গেছে। —আসল কথা, গৃহীত এবং মান্য ভাষিক প্রয়োগগুলি থেকে অন্য রকম বাচনভঙ্গী (উচ্চারণ, শব্দ, বাক্যরীতি ব্যবহার) হলেই তাকে 'উপভাষা' বা প্রকৃতপক্ষে কিছুটা নিম্নমানের ভাষণ বলে মনে করা হয়। বিপরীত পক্ষে, কোন 'ভাষণ' বা 'বাচন' এর নানা প্রকারের মধ্যে একটি রূপ অনেক কারণেই সর্বজনগ্রাহ্যতা এবং সর্বাধিক মান্যতা পেয়ে যায়। কারণগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক এবং এসবেরই প্রভাবে সাংস্কৃতিকও হতে পারে। অতঃপর সেই ভাষার সর্বোচ্চস্তরীয় নমুনা বলে গ্রহণ করা হয় এই রূপটিকে। অন্যথায় তাকেও বলা চলে সেই ভাষারই একটি 'উপভাষা' বা 'বাচন' অর্থাৎ একটি 'dialect'।[২] সুতরাং উত্তর বিহারের ভাষা-উপভাষা বলতে এই অঞ্চলে প্রচলিত এবং ব্যবহৃত ভাষা বা বাচনগুলিকে বোঝানো হচ্ছে। বিভূতিভূষণের রচনায় তাদেরই কয়েকটির ব্যবহার আলোচনা হচ্ছে।

বহু বৎসর পরে পিতৃবন্ধু ফণীন্দ্র ঝার স্ত্রীর (যাঁকে তিনি চাচী অর্থাৎ কাকিমা বলতেন) সঙ্গে 'বিভূতি'র দেখা হয়েছে পাণ্ডুলে। চাচী সস্নেহে অনুযোগ করছেন:—"হঁ রে বিভূতি, তোঁহু সচমুচ কুটুম ভ গেলে? তোরা এত্তেক্টা দেখ্লে ছেলওঁ হ্যাঁ।—আই তো পইথ্ ভ গেলে হ্যাঁ; হেডমাষ্টার ভ গেলে হ্যাঁ। তেঁই হমরো লেকে পৈথ, হমরো লেকেঁ হেডমাষ্টার হাব্যা? হ' রে বিভূতি?" (হ্যাঁ রে বিভূতি। তুইও সত্যিই কুটুম হয়ে গেছিস? তোকে এইটুকু দেখেছি, আজ তুই বড় হয়েছিস, হেডমাষ্টার হয়েছিস—তা আমার কাছেও বড়? আমার কাছেও হেডমাষ্টার হবি? হ্যাঁ রে বিভূতি?" ('জীবন তীর্থ')

এ বিশুদ্ধ আটপৌরে মৌখিক মৈথিলী।

ভোজপুরী ভাষায় সংলাপ পাওয়া গেছে 'কলতলার কাব্য' (রাণুর তৃতীয় ভাগ) গল্পে।

—"আরে ভাই। গাগরী ধিপল বা, ধোই না? পাণি সব ধিপ গৈল বা।
—সুনরা, ই সব কোন বাত বা? ভালা আদমি কহলাবতাড় না?" (আরে

ভাই কলসী গরম হয়ে গেছে, ধোব না? জলও গরম হয়ে গেল।—সুন্দর, এ সমস্ত কি ব্যাপার? তোমাকে ভদ্রলোকই তো বলা হয়?)

'বসন্তে' (বসন্তে) গল্পে রামলগন ছাপরেয়ে ভোজপুরীতে গান গেয়েছে।—

"ওহো ফাগুনা কে রাতিয়া মে পিয়া
কাঁহামা হো—
ফাগুনা কে রাতিয়া মে পিয়া বা—আ—আ—
ওহো, চুনরি রঙা দি'হে লালে লাল হো—
ফাগুনা কে রাতিয়া মে পিয়ারা—আ—আ—"

(এই ফাগুন রজনীতে প্রিয় তুমি কোথায় / লাল রঙে তুমি রাঙিয়ে দেবে শাড়ি, ওগো। ফাগুন নিশীথে প্রিয় ইত্যাদি)

মজঃফরপুর-বৈশালী অঞ্চলের কথ্যভাষা বজ্জিকার ব্যবহারও করেছেন ঐ অঞ্চল থেকে চয়ন করা চরিত্রের মুখে। 'অযাত্রায় জয়যাত্রা'তে পাই,
—"পরণাম না করলে তু? মার লাগে কে?—বড়াবাবু রূপেয়া দেলে বাড়ন, তু ফুল না দেব বউয়া হমর?" (প্রণাম করলি না তুই? মার খাবি? বড়বাবু টাকা দিলেন, তুই ফুল দিবি না বাবা?")

কুশী অঞ্চল, ভাগলপুর অঞ্চলের ভাষা অঙ্গিকার সামান্য সামান্য ব্যবহার তাঁর 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি'তে পাওয়া যাচ্ছে।—
—"মাই গে, বাঙালিয়া সবকে দেখলি। তিন গোটে ছেলই গে। পুছল কেই,—'বাঙলা বোলিতে পারো?' হম কহলিয়েই,—'হুঁ, হামি পারে।' সচ্চেগে—তাহর—কিরিয়া!" (ও মা,—বাঙালীদের দেখলাম। তিনজন ছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'বাঙলা বলতে পার?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ আমি পারি।' সত্যি বলছি, তোমার দিব্যি!)

কোনও কোনও গল্পেও আছে, তবে বজ্জিকা, অঙ্গিকার ব্যবহার কম।

এ সব ছাড়াও খাড়িবোলি বা হিন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা যদিও খাড়িবোলি সঠিক অর্থে মাতৃভাষা অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিহারীর, বিহার রাজ্য হিন্দী অঞ্চল এবং খাড়িবোলি হিন্দীই বিহারের রাজ্যভাষা। এই ভাষাই বিহারে কাজকর্মের, অফিসকাছারির, স্কুলকলেজে লেখাপড়ার, আনুষ্ঠানিকতার এবং প্রাদেশিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের ভাষা। খাড়িবোলি যেহেতু সমাজে মান্যতাপ্রাপ্ত এবং মর্যাদার অধিকারী, শিক্ষিত জনসাধারণ সামাজিক কথাবার্তায় মোটামুটি এই মাধ্যমটিই ব্যবহার করতে চান এবং করেনও। সুতরাং কেবল আজন্ম শহর নিবাসী, শহরেই শিক্ষিত এবং বড় হয়ে ওঠা অতি সাম্প্রতিক প্রজন্মের মাতৃভাষা বলা চললেও, খাড়িবোলি বিহারের মানুষের রপ্ত হয়ে যায় মাতৃভাষার মতই স্বাভাবিকতায়। বিভূতি-

ভূষণ ট্রেনের অপূর্বপরিচিত সহযাত্রী, চাকুরী জীবনের সহকর্মী বা শিক্ষক ইত্যাদির কথোপকথনে হিন্দী ব্যবহার করেছেন। 'অযাত্রায় জয়যাত্রা'তে সহযাত্রী বলছেন,—

—"সো হি কিজিয়ে। বহি আকিলমন্দিক। কাম হোগা; আপ গলতি কিয়া।"
(তা-ই করুন। তা-ই বুদ্ধির কাজ হবে, আপনি ভুল করেছেন)।

'জীবন তীর্থ' গ্রন্থে সুধাবাবু নামে একজন বিহারী যুবকের রচিত এবং গীত গান উদ্ধৃত করেছেন,—

"হে দুর্গে তু হমপর রহমকর,
ইন বিদেশী য়োঁ কো তু খতম কর।"

(হে দুর্গা তুমি আমাদের দয়া কর / এই বিদেশীদের তুমি খতম কর)।

বিহারের এই সব ভাষার সাক্ষাৎ ছাড়াও বিভূতিভূষণের রচনাবলীর বহু ঘর বারান্দা, অলি গলিতে একটি মিশ্র ভাষার সঙ্গে বারেবারেই দেখা হয়, বিভূতিভূষণের গল্পকে যা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। মিশিয়েছে এক অন্য চারিত্র-বর্ণালী এবং কৌতুক-সুবাস। প্রকৃত অর্থে এ কোন পিজিন ভাষা (Pidgin language) নয় তবে একধরনের মিশ্র ভাষা বটে। কথোপকথনে বক্তার মাতৃভাষার গাঢ় প্রভাব দেখা যায়।

দুই বা অধিক ভাষার মিশ্রণ প্রক্রিয়া সচেতনে তত ঘটে না, যত ঘটে পারিবেশিক প্রভাবে স্বতোৎসারে।[৩] Code Switching অর্থাৎ একধরণের ভাষায় কথাবার্তা চলতে চলতে হঠাৎ ধরণ পরিবর্তন বা অন্যধরণে মোড় নেওয়া, মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ততই ক্রিয়াশীল হল জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে 'Borrowing'; অন্য ভাষা থেকে শব্দ, শব্দদল ইত্যাদি চয়ন করে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া। তৃতীয় উপায় হল, দুই বা একাধিক ভাষা মিলিয়ে ব্যবহার করা বা Variety synthesis। এই তৃতীয় প্রক্রিয়াটি সচেতনে ঘটতে পারে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবেও Variety synthesis করা যেতে পারে।

অনেক সময়েই ব্যবহারিক কারণে ভাষা মিশ্রণ ঘটানো হয়। ভিন্ন ভাষা-ভাষীর মধ্যে আলাপচারিতার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে মিশ্রণ ঘটে Communication বা বক্তব্যের আদান প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য। ব্যবসায়িক কারণেও ঘটে। ব্যবসাবাণিজ্য চালাবার জন্য পিজিন ভাষাও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গড়ে ওঠে। ভাষাগুলির রূপতত্ত্ব ও ব্যাকরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না, মনোযোগ ওই দিকগুলি পায়ও না।[৪] ভাষা মিশ্রণ এগোতে থাকে।

বিহারে বাংলা ভাষা ও অন্যান্য ভাষার মিশ্রণকে Pidginisation বলা চলে না। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আলাপচারিতার ব্যবহারিক কারণে তখন মিশ্রণ দরকারি ছিল। পঞ্চাশের পর থেকে মিশ্রণও তত সজীব আর নেই। ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ অনেক বেড়েছে; যোগাযোগের মাধ্যম

হিন্দী। গণমাধ্যমগুলি, যা ক্রমশ উন্নত, যেমন—পত্র-পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন, তাদের ভাষাও অবিসংবাদিত ভাবে হিন্দী। সুতরাং হিন্দী সঠিক ভাবে শিখে নেওয়া জরুরী হয়েছে। স্কুল কলেজের লেখাপড়ায় পঞ্চাশের দশক থেকে হিন্দীর প্রতিষ্ঠা—(প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে) পাকা। সমাজে মান্য ভাষা—(Prestigious language) হিসেবে প্রতিষ্ঠায় হিন্দী শেখা নির্ভুল ও পরিণত হয়েছে ক্রমশ।

এখন সম্ভবত গল্প উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা আর মিশ্র হিন্দী বলবে না কিন্তু সেই বিশ, ত্রিশ, চল্লিশের চরিত্রগুলিকে যথাযথ করার জন্য বিভূতিভূষণ মিশ্র ভাষাটির সুকুশল প্রয়োগ করেছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহারও আছে তাঁর রচনায় এই ভাষার। তাঁর কলমে মিশ্র ভাষাটির দুই নমুনা, দুই রূপ। একটি হল, হিন্দীই (খাড়িবোলি) ব্যবহার হচ্ছে, বাংলা ভাষাভাষীর কথোপকথনে কিন্তু মাতৃভাষার অপরিমাণ অনুপ্রবেশ (Mother tongue interference) ঘটেছে। অন্যটি হল অবাঙালী চরিত্রের মুখের বাংলা যাতে বক্তার আপন মাতৃভাষার প্রভাব। তবে আমাদের আলোচনার আওতায় আসবে প্রথমটি যেহেতু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় বিহারে বাংলাতর ভাষাগুলি নিয়েই আমাদের এই আলোচনা। আর প্রচুর অনুপ্রবেশ সমন্বিত এই ভাষা মূলে হিন্দী; চরিত্রগুলি এখানে হিন্দীই বলার চেষ্টা করছে। বাংলার অনুপ্রবেশ চিহ্নিত এই ভাষাটি বলছে বিহারে বসবাসকারী বাঙালী চরিত্র। বিভূতিভূষণ স্বয়ং এই মাধ্যমের নামকরণ করেছেন 'বাঙালী হিন্দী'। তাঁর অজস্র ছোট গল্প এই বাঙালী হিন্দীর সার্থক ভূমিকাকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। 'উমেশ কো বোহীন' (বসন্তে) গল্প থেকে দেখা যাক।—এও এক ট্রেনের দৃশ্য। প্রচুর মালপত্র এবং অনেকগুলি শিশুসহ এক ভদ্রলোক ট্রেনের কামরায় চড়ে তাড়াহুড়ো করে জায়গা দখল করতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের (বিহারী) পায়ের উপর বসে পড়েছেন।—

"কর্তা বাঙালী হিন্দীতে প্রশ্ন করিলেন,—'আঘাত লাগা হ্যায়? থোড়া ব্যতিব্যস্তো কর দিয়া থা। বাচ্চাকাচ্চা সাথ রহনে সে মগজ ঠিক নেহী রহতা হ্যায়। আরো কারণ হুয়া হ্যায়,—হামকো কোভি কোনও ঝক্কি নেহী লেনে দেতা হ্যায় উ সব কো মাদার। আর উয়ো সবভি হামেসা মা কোই পাশ মে রহতা হ্যায়, বাপ বোল করকে সে একঠো বস্তু হ্যায়—"।

২। এই সবকটী ভাষা ব্যবহারেরই উদাহরণের সংখ্যা এবং পরিসর আরো অনেক বাড়ানো যায় কিন্তু সীমিত উদাহরণও স্পষ্ট করতে সক্ষম যে বিভূতিভূষণ আদান রচনায় যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, প্রয়োজন মনে হয়েছে অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। এমন ব্যবহারে অনর্থক অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভাষাজ্ঞান প্রকট হয়ে পড়ার একটা ভীতিকর সম্ভাবনা থেকে যায়।—বিভূতিভূষণের কলম সেই

কাঁড়া কবলিত হয় নি। হয় নি এই জন্ত যে, মনোভূমি ও ব্যবহার ভূমি,—রচনার—দুই উঠোনেই তিনি একটি বিশ্বাসের ঘর তৈরি করতে পেরেছিলেন।

দেশিক পটভূমি থেকে নেওয়া জীবননির্যাস মনোভূমিতে ছড়িয়ে নেবেন এবং শিল্প কৌশলে ব্যবহার ভূমিতে তা স্থিত হবে,—লেখকের এই ভূমিকাকে তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণের স্বাভাবিকতায় দেখতেন। বলা চলে, এমনটা না করাকেই তিনি সাহিত্যে নির্জীবতার সাধনা মনে করতেন। যখন তাঁর একটিও গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি, হাসিরমণীয় ছোট গল্পের লেখক বলে পরিচিত হয়ে উঠেছেন মাত্র[৫] তখনই প্রবাসীর সাহিত্য চর্চা প্রসঙ্গে "যেখানে আছি, সেখানকার ঐতিহ্য থেকে ভাবশক্তি সঞ্চয়" করতে আগ্রহ হওয়ার 'অভাব' সূত্রে বলেছিলেন, "প্রবাসী যাঁদের এই ভাব নিয়ে সাহিত্য চর্চা করতে হয়, তাঁদের বাস্তবিকই বিশেষ দুর্ভাগ্য, কারণ, শূন্যে দোদুল্যমান থেকে তাঁরা না স্বর্গের, না মর্ত্যের কোনও খানেরই রসের যোগান পান না। এতদ্বারা সাহিত্য পরোক্ষভাবে অসীম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সাহিত্যের বৈচিত্র্য নষ্ট হয় এবং একই জমির রস টানতে টানতে সাহিত্য নির্জীব হয়ে পড়ে।"[৬] আবার মৃত্যুর আট বছর আগে লিখেছেন,—"যে পরিবেশের মধ্যে কেউ মানুষ হয়ে উঠতে থাকে, তার দ্বারাই হয় প্রভাবিত, তাকেই আপন বলে জানে।"[৭] অর্থাৎ পরিবেশ সচেতন শিল্পী তার প্রণোদনা পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে, প্রতিবেশ বিস্মৃত হয়ে থাকতে যে সে পারে না, এই বিশ্বাস আজীবন তাঁর ধারণায় স্থিত ছিল। বিশ্বস্ত থাকার জন্য স্ব-আরোপিত অঙ্গীকার বা Commitment তিনি মেনে চলেছেন।

রচনাকে অত্যন্ত যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই দায়বদ্ধতাই তাঁকে স্থানীয় রঙ (Local colour) ব্যবহার করিয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। বিহার পটভূমিকার রচনাগুলিতে তিনি বিহারের, বিশেষ করে উত্তর বিহারের "প্রান্তর কানন পল্লী", শহর গঞ্জের ছবি; শিক্ষিত, নিরক্ষর, ধনীগরীব নির্বিশেষে মানুষজন, তাদের জীবনযাত্রা, সামাজিকতা, চিন্তা ব্যবহার ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। সেসব ছবি প্রায়ই মনোরম। কঠোরতা, দারিদ্র্য তিক্ততাকে আপন ক্যানভাসে এড়িয়ে চলেছেন কিন্তু ছবিগুলির বাস্তবিক এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক যথার্থতা শতকরা শতভাগই অটুট। বিশেষভাবে চরিত্রগুলি যেন তাদের সপ্রমাণ অস্তিত্ব নিয়ে সুমুখে এসে দাঁড়ায়। কেননা স্থানিক পরিবেশ থেকে চয়ন করা চরিত্র যখন তার নিজের ভাষায়, আপন ভঙ্গিমায়, নিজ সংস্কৃতির নিখুঁত পরিচয় দিয়ে কথা কয়, সে স্থানিক রঙে আঁকা হয়ে যায় সবচেয়ে অমোঘ দক্ষতায়।

অপর ভাষা থেকে চয়ন করা বাক্যযূথ, বাক্য, বাক্যাংশ এমন কি এক একটি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অভিপ্রেত বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা, রচনাকর্মে একটি মূল্যবান সাহিত্যিক কৌশল। এই কৌশল বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ আয়ত্তে। অন্য ভাষার

উপর দখলকে তিনি যে অনায়াস প্রয়োগে নিয়ে আসেন, তাতে একসঙ্গে প্রকাশ পায় রসসাহিত্যিকের সংবেদনশীলতা এবং ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা। দক্ষতা এতদূর যে কৌতুকরস সৃষ্টির জন্যও অন্য ভাষা নিযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। তিনি অন্য ভাষার শব্দের প্রাসঙ্গিক অর্থ (Referential meaning) ব্যবহার করেন গল্পবলায় তথ্য প্রকাশের কাজে কিন্তু তার আনুভূতিক ও আবেগাত্মক অর্থটি (Emotive meaning) অলক্ষ্যে আপন কাজ সারা করেই। পাঠকের যদি সে ভাষাটি না-ও জানা থাকে, (অনেক সময়েই থাকে না) তবু বুননের গুণে প্রধান ভাষা ও চয়ন করা ভাষা রসসাহিত্যের দায় সুচারুণভাবে পালন করে।—একটা উদাহরণ নেওয়া যাক 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' থেকে।—

কনে বৌ গিরিবালা মিথিলার গ্রাম পাণ্ডৌলে পৌঁচেছেন প্রথমবার। শাশুড়ি, ননদ এবং পাড়ার পরিচিত মহিলারা মিলে নতুন বৌকে ঘিরে জটলা হচ্ছে। মৈথিল মেয়ে তুলারমন কথার পিঠে "মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া আরো গম্ভীর ভাবে বলিতেছে—'কিয়্যাক ন সক্‌বৈ? হুন্‌কা মাথা পর লক টোলা টোলা ঘুম জা সকৈছি, গৌরী থিকি, ঢাকিয়া ঢাকিয়া পুন্‌ হেতৈ। চলথুন্‌।" (কেন পারব না? ওঁকে মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে আসতে পারি, উনি তো গৌরী, আমাদের চ্যাঙাড়ি ভরে ভরে পুণ্যি হবে। চলুন না।)

গল্প বলার কাজে এই ভাবেই অপর ভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রাসঙ্গিকতাকে বিশ্বাসযোগ্যতর, স্পষ্টতর করে তোলার জন্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সংবেদনশীলতা ও গাঢ়তর আবেদন ছড়িয়েছে পাঠকের চেতনায়। আবেগাত্মক অর্থের সঠিক নিযুক্তি ও নিরতি সাহিত্য সৃষ্টি এবং সাহিত্য উপভোগ দুই ক্ষেত্রেই প্রেরণার মত কাজ করে—কচি কনে বৌ গৌরী বা উমার সঙ্গে উপমিত হচ্ছে, কাহিনী বুননের কাজে এই প্রাসঙ্গিকতা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবেগে সুনিযুক্ত কিন্তু ভাষার প্রয়োগে প্রাসঙ্গিক অর্থ এবং আবেগাত্মক অর্থের একত্র মিশ্রণ (Blending) পাঠক অনুভূতিতে দ্বিগুণ প্রভাব ব্যাপ্ত করেছে। কেননা, মৈথিলী সংস্কৃতিতে পার্বতী, গৌরী বা উমা (দুর্গার নানা রূপ) শক্তির সঙ্গে সঙ্গে শান্তশ্রী, মঙ্গল, শান্তি আবার ঐশ্বর্য ইত্যাদির প্রতীক। লোক সাহিত্য, কাব্য, গাথায় তো বটেই, এমনকি আলপনা, দেওয়াল চিত্রাঙ্কনেও দুর্গা বন্দনার প্রাচুর্য।[৮] সুতরাং কাহিনীর মৈথিল পাত্রী যখন মৈথিলী ভাষে নববধূ গিরিবালাকে 'গৌরী' বলে সমাদর দেখায়, তখন কথোপকথন থেকেই বক্তার মৈথিলী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতায় বক্তা ফুটে ওঠে পাঠকের অনুভবে। নিঃসন্দেহে স্পষ্ট হয় যে, রচনায় এই ভাবে অন্য ভাষার প্রয়োগ এসব ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশালী (Affective) হতে পেরেছে।

৩। ভাষাশিল্পীর উদ্দেশ্য আর রচনায় উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে তৈরি হওয়া ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষ পরিস্থিতি (Particular linguistic situation) শিল্পী

অর্থাৎ লেখক কি ভাবে, কোন কৌশলে, কেমন কুশলতায় সামাল দিলেন, তার উপর রচনায় সাফল্য নির্ভর করে। বিশেষ পরিবেশ থেকে বিশেষ চরিত্র অথবা অনেকগুলি চরিত্র ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে লেখককে যদি ভিন্ন ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ব্যবহারের দ্বারা একটি বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক পরিস্থিতি গড়ে তুলতেই হয়—দেখতে হবে, সেই অবস্থান সন্ধিতে তিনি পাঠকের রসগ্রহণকে ব্যাহত না করে স্নিগ্ধ করলেন কি না। বিভূতিভূষণ অসংখ্যবার কৌতুক-রম্যতা এবং স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছেন পাঠকের অনুভবে।

'রূপান্তর' (রূপান্তর) গল্পের ঘটনাসংস্থান নিতান্তই পরিচিত। ট্রেনে বাবাধামের (বৈদ্যনাথ) উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রীর প্রচণ্ড ভীড়। "মিথিলার লোকেরা বৈদ্যনাথধামে বাবার মাথায় জল ঢালিতে যাইতেছে। ...এজমালি হট্টগোল যা হইতেছে, তাহাতে বাবা বৈদ্যনাথের সঙ্গী সাথীদেরও লজ্জিত হইবার কথা। তাহারই মধ্যে বাঙালীর গলা; উচ্চারিত হইতেছে বিশুদ্ধ বাঙালী হিন্দী। কালো লিকলিকে চেহারা, লম্বা, মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত; একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, সামনের সবাইকে তাহার কোণের জায়গাটুকু দখল করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে,—'চলা আও, কিসকা সাহস হ্যায়। হাম একঠো চিজ ভী নেই নামাবেগা, হামরা ইসি ক্লাস কা টিকিট হ্যায়, পয়লা তুম সবকো টিকিট দেখাও। মগের মুল্লুক পা গেয়া হ্যায়। চলা আও এক এক করকে। নেই নামাবেগা একঠো ভি চিজ।' একদিকে আমাদের বাঙালী বাবুটি, অপর দিকে বাকি সবাই। ক্রমশ অবস্থাটা চরমের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। —আমাদের যা জাতীয় রোগ; 'মেড়ো,, 'ছাতু' দেখিয়া উপদেশপ্রবণ হইয়া ওঠা—'আরে বাবা, হাম তোম লোককো কেয়া বোলা? বোলো? —বোলা তো এই, যে, ঘরমে ভি দেবতা হ্যায়, উসি কো পুজা করো না। গাড়িমে ভিড় বাড়ানে সে পুণ্যি নেই হোগা?"

স্পষ্ট যে, এই ঘটনাবিন্যাসে মিশ্র ভাষাটির অত্যন্ত যথাযথ প্রয়োগ গল্পের বক্তব্যকে সার্থকতম ভাবে ব্যক্ত করেছে। একটি মাত্র যাত্রী যেন তার 'বাঙালী হিন্দী'র বুকনি নিয়ে একসময়কার একটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি—ছবি হয়ে বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী হয়ে গেছে।

এই রকম ভাবেই গল্প, কাহিনী, বক্তব্যের বিশেষ সংস্থিতি-সন্ধিতে মৈথিলী, ভোজপুরী ইত্যাদি বিহারের বেশ কটি ভাষা চমৎকার ব্যবহৃত হয়েছে। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' থেকেই আর একটি ঘটনা সংস্থান দেখা যাক। এখানে মৈথিলী ভাষায় নির্মিত হয়েছে কৌতুক সরস একটি নিটোল কাহিনী সন্ধি।

নববধূ গিরিবালা প্রথমবার পাণ্ডুলে এসেছেন। বধূবরণ হচ্ছে। "বাঙালী বধূবরণ এখানে এই প্রথম। কিছু মৈথিল স্ত্রীলোকও ঢুকিয়া পড়িয়া একদিকে গান করিতেছিল, উলুর অদ্ভুত আওয়াজে একটু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া

একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। যাহারা উলু দিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একটি বড় মেয়ে অনুযোগের সুরে বলিল 'দেখো মা, হাসি ভাল লাগে না ওদের আদাড়ে গানের জন্যে আমরা হাসছি?' তাহার পর শুদ্ধ মৈথিল ভাষায় সোজা তাহাদের সঙ্গেই মৃদু ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল—'ইঃ হসৈছি কিয়া? আঁহা লোকৈন্ আহে মাহে কি গবৈৎ যাইছি? (ইস, হাসছ কি? তোমরাই বা আগড়ম বাগড়ম কি গেয়ে যাচ্ছ?)

হাসিটা আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একজন বলিল—'ইত মনুখ্যক গীত ছিয়েই হে, আঁহা লোকৈন গিদড় জঁকা কি ভুক্কি পাটৈৎ ছি? (এতো মানুষের গান গো, তোমরা শেয়ালের ডাক কি তুলছ?)

কাহিনীতে আঞ্চলিক ভাষা যোজনা এবং তার ফলে জাত রমণীয় আবেদনে বিসংবাদ নেই। টানা বাংলা গদ্যে অন্য ভাষার এমন দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপ বাক্য এবং একসঙ্গে পরপর একাধিক বাক্য ব্যবহারে যিনি এমন অনায়াস কুশল, শব্দ চয়নে তাঁর দক্ষতা সহজেই অনুমান করা যায়। 'জীবনতীর্থে' একটি দীঘির উল্লেখ করেছেন। দীঘিটির স্থানীয় পরিচিতি ছিল "ভূতাহা পোখরা" (ভূতুড়ে দীঘি) নামে। দীঘিটিকে তিনিও ভূতাহা পোখরা নামেই রচনায় এনেছেন; শব্দ দুটিকে অনায়াসে গেঁথে দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে। এক ব্যক্তির পরিচয় দিতে "হরফন্দবন্দা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন তিনি।—"মোট কথা, এদিকের ভাষায় যাকে হরফন্দবন্দা বলে, সেই ধরণের মানুষ। চৌকশ, সব কাজেই আছেন।" শব্দটি অবশ্য উর্দু কিন্তু চলিত ব্যবহারে এ হিন্দী, মৈথিলী সর্বত্রই ব্যবহার হয়। আবার গল্প উপন্যাসে সহসা ব্যবহৃত এক একটি সংক্ষিপ্ত শব্দে, বাক্যাংশে রসসাহিত্যের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতায় পালিত হয়েছে। রচনার উদ্দেশে এবং অভিপ্রায়ও সর্বাংশে স্পষ্ট হয়ে গেছে। 'শহুরে' গল্পে (শারদীয়া) যেমন।

সর্দার বিবাহ সংক্রান্ত বিলটা আইনে আসার আগেই তাড়াহুড়ো করে বিহারের একটি শহরের উপান্তে বিয়ে ঘটানো হয়েছিল বুধন মড়রের বেটা মিঠুয়ার সঙ্গে রৌদি মহতোর বেটি সোনিয়ার। কালক্রমে সোনিয়ার পতিগৃহ গমন যখন ঘটছে, তখন তার বয়স 'উন্নেস' (উনিশ) আর বরের "সম্ভবত পনেরো দু একমাস কমই হইবে। ছোঁড়াটা মাথায় বাড়িয়াছে কিন্তু মাথার ভিতরে বাড়ে নাই।" এ হেন বরের সঙ্গে সোনিয়ার পতিগৃহে গমন শহরের উপান্ত ছাড়িয়ে ভিতর দিকে অন্য গাঁও এ, পথ হেঁটে। পনেরো বছরের বর মিঠুয়া শুধু গোঁফ মোষ চেনে, বধূর সঙ্গে কথা বলতে পারে না। ঘোমটার ভিতর থেকে আলাপ পরিচয়ের ভার শহুরে বধূকেই নিতে হল।—

—"ইস্ দৌড়ন হচ্ছে একেবারে।"—মিঠুয়ার প্রথমটা কথাই যোগাইল না, একটু পরে জিভে ঠোঁট ভিজাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল,—"বাঃ তুমিই

তো…।" ঘোমটায় একটা ঝাঁকানি হইল, শব্দ বাহির হইল, "গমার কাঁহাকে।" (গেঁয়ো কোথাকার)। আঞ্চলিক বোলির এই দুটি শব্দে মিঠুয়ার অসহায় অবস্থা, সোনিয়ার স্মার্টনেস আচার আইন বাঁচাতে গিয়ে বিহারের গ্রামের এই ধরনের অসম বিয়ের কৌতুকের দিকটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪। এতক্ষণের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, রচনায় বাচন (Dialect) ব্যবহার দ্বারা মনোভাব প্রকাশ ও বক্তব্য জ্ঞাপন করার ক্ষমতা (Communicative competence) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ। অন্য কোনও বাচন যখন তিনি ব্যবহার করেন, সেই পারগতা প্রত্যক্ষে না এসে পারে না। অনেকগুলি প্রতিবেশী ভাষা, উপভাষার উপর দখল সক্ষমভাবে নিজেকে প্রকাশে আনে। রচিত চরিত্রগুলি নির্ভুল বাচনে কথা বলে। তাদের-তাদের প্রাদেশিক, আঞ্চলিক বা স্থানিক পটভূমি তো স্পষ্ট হয়ই, তাদের সামাজিক পটভূমিও চেনা যায়। কে কোথায় কার সঙ্গে কি বলছে, তা অস্পষ্ট থাকে না। আঞ্চলিক উপভাষার (Regional dialect) সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলিকে তাদের সঠিক সামাজিক উপভাষাতেও (Social dialect) কথা বলিয়েছেন তিনি।[৯]

মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বিভূতিভূষণের আজন্ম পরিচয়। মৈথিলী তাঁর জন্য প্রায় প্রথম ভাষাই, প্রায় মাতৃভাষার মতই দখল। 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি'তে লিখেছেন, "আর শুধু মৈথিল ভাষা শোনাও তো সঙ্গীত শোনাই। বাংলার সহোদরা,—ঐরকম নরম, ঐরকম মিষ্টি; শুধু সহোদরাই নয়, সংস্কৃত মায়ের যমজ মেয়ে দুটি; এক মুখ, এক চোখ, এক গড়ন, এক চলন।"—স্বাভাবিক ভাবেই মৈথিলী তার নানা ভঙ্গিমায় বিভূতিভূষণের রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। স্থানিক ও সামাজিক দুই উপভাষা রূপেই তাকে সঠিক অবস্থানে পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ বক্তার এই দুই অবস্থানই স্পষ্ট হয়েছে।

ট্রেনে আলাপ হওয়া এক পণ্ডিতজী মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নানে আসার প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—"মাঈকে যখৈন্ যখৈন্ কৃপা হৈৎ ছৈক" অর্থাৎ তিনি স্নানে আসতে পারেন যখন যখন মায়ের কৃপা হয়। এই পণ্ডিতজীর বিষয়ে লেখক বলছেন,—"এমন একটি আদর্শ মৈথিল ব্রাহ্মণের চেহারা এর আগে কখনও চোখে পড়ে নি।" ইনি 'কৌশিকী মহাকাব্যের' নানা কাহিনী বলেছেন এবং মুখের কথাটুকু যা, লেখক উদ্ধৃত করেছেন, তা বিদ্বানের মুখের ভাষা; অন্যথায় হয়তো বলা হত—"কৃপা হোইছেন"।

দ্বারভাংগা রাজপরিবারে গৃহশিক্ষক হবার পর একবার রাজমাতা তাঁকে ডেকেছিলেন। মিথিলার প্রথা অনুযায়ী একমুঠো আস্ত সুপুরি (সুপুরি মিথিলার একটি বিশেষ মাঙ্গলিক) ডানহাতে নিয়ে বললেন—"লেথুন"। অভ্যর্থনায় এই অনুরোধের ভাষা সম্ভ্রম ও সম্মানসূচক; যেন "নিন" বলাও নয়, বলা, "গ্রহণ করুন"। বিভূতিবাবুও অর্থ জানাতে লিখেছেন, "অর্থাৎ আমি যেন গ্রহণ

করি।" লেখেন নি,—"আমি বেন নিই।" রাজপরিবারের বাক্যালাপে ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার ভঙ্গিমা এই সংলাপে ব্যক্ত হয়েছে। অন্যথায় বলা যেতে পারত,—"লেল যায়"; আর একটু সম্মানসূচক হলে "মানল যায়"।

একদিন জমাটি দরবারে অন্যমনস্কতায়, মহারাজের নিজস্ব ব্যবহারের অফিসঘন্টি বাজিয়ে ফেলে অপ্রস্তুত অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন লেখক (জীবনতীর্থ)। ঘটনাটা প্রসঙ্গে মহারাজ কামেশ্বর সিং হাসতে হাসতে বলেছিলেন,—"কী ফুরল্যান হুনকা?" (কি স্ফুরিত হল অথবা ফুটল ওঁর মনে?) এ হিউমার উজ্জ্বল মার্জিত মৈথিলী। না হলে হয়তো বলা হত—"কি ফুরয়েলেন হুনকা?"

আবার দৈনন্দিন কথাবার্তায় খাঁটি মৈথিলী, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা শুনিয়েছেন তিনি। শহর থেকে দূরে ভিতরের দিকেই ভাষা উপভাষার অবিমিশ্র রূপটি বজায় থাকতে পারে, যেহেতু সেখানে বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে মিশ্রণ হয় না, বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর মধ্যে আদান-প্রদান কম। ভাষা বিষয়ে সতর্ক-চেতন বিভূতিভূষণের শ্রবণ এড়ায়নি এই ব্যাপারটি। কূশী প্রাঙ্গনে তিনি কান পেতেছেন।—

"আমি তো কান পেতে দিই; খাঁটি মৈথিলীও জোটে না মিথিলায় থেকেও; শহরের জগাখিচুড়ি, দশ দিক থেকেও দশ রকম ভাষা কান করছে ঝালাপালা, তার ওপর আছে মোটর রিকশা, টমটম, বাস, লরি, সর্বোপরি লাউড স্পীকার—রীতিমত বাইবেলের সেই বেবেল।...

গ্রামের শেষ দিকে এসে পড়েছি আমরা, বাড়িঘর পাতলা হয়ে এসেছে, গাছপালা এসেছে বেড়ে। কোথাও গাছের তলায় জটলা, কোথাও কারুর "দুরক্ষির (চণ্ডীমণ্ডপ) দাওয়ায়। জোর গল্প জমেছে—'পরন্তু রমাকান্তক কুটুম্ব নৈনিক ভেলৈন।' (পরন্তু রমাকান্তর কুটুম্ব সুবিধের হয় নি)।" এ অবিমিশ্র খাঁটি মৈথিলী। আরো লক্ষণীয় যে এ শুনলে বোঝা যায় পুরুষের সংলাপ, বিভূতিভূষণের কথায়—"চণ্ডীমণ্ডপের সেই কেচ্ছা।"

তেমনিই আবার মেয়েলি জটলারও (মৈথিল ও বাংলা ভাষায়) সঠিক নমুনা শুনিয়েছেন তিনি। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বৌ এর কথাবার্তা। বৈকালিক চুল বাঁধার আসরে খোঁপা বাঁধার প্রস্তাবে (স্বর্গাদপি গরীয়সী) "দুলারমন একটু লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলে—'হু" কিয়্যাক ন? আর বাঙালীন্ বৈন ক দাদি-ঠাম ঝাড়ু খাই গ। যাইছি ন বুঢ়িয়াকে কহে, লাঠি লক দৌগং।" (হ্যাঁ, তা বৈকি; এবার বাঙালী মেয়ে হয়ে ঠাকুমার কাছে ঝাঁটা খাই গে। —যাচ্ছি বুড়ীকে বলে দিতে, লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসবে।)

গৃহস্থ বাড়ির ঝি, পরিচারিকার সংলাপও শোনা যায় অন্য ধরণের মৈথিলীতে; সে মৈথিল উপভাষায় ওই শ্রেণীর মানুষজন কথা বলে। যেমন—
—"পুরি ভেলেই হে দুলহীন?" (লুচি হল গা গিন্নি?) —"হাম, মাইজীকে

খাবাসিন ছি হে, ঝাড়ু বাহরণলা নই ছি।" (আমি মাইজীর—খাস চাকরাণী, ঘর-টর ঝাঁট পাট আমার কাজ নয়।)

বাড়ির শিশুদের রাখা কাজ যে মেয়েটার, বারে বারে শ্বশুরবাড়ি পালানো সেই "হুড়কোমেয়ে" খঞ্জনীর সঙ্গে তুলারমনের খঞ্জনীর ভাষাতেই হাসি ঠাট্টা হচ্ছে।—

"খঞ্জনীকে প্রশ্ন করিল (তুলারমন)—'কে না ভাগৈছে গে খঞ্জনী, বাতা দেত।' (কি করে পালাস রে খঞ্জনী, বলে দেতো?)

—ইঃ, হিন্‌কা বুতে হোত্যান্। আহি গে দইয়া! (ইঃ, এঁর দ্বারা হবে! মা গো মা!)

—তু কহিত, (তুই বলই তো।)—গোড় ধরৈৎ ত তোঁহু যৈত্যা। (পায়ে ধরলে তুইও যেতিস)।

এই সংলাপ অংশগুলি ছিল গার্হস্থ্য রসের অসাধারণ ছবি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' উপন্যাস থেকে। আর চাচীর (ফণীন্দ্র ঝার স্ত্রী, 'জীবন তীর্থ') কথাবার্তার ভাষা ঘরোয়া মৈথিলী (পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে); শোনা মাত্র স্পষ্ট হয় স্নেহসিক্ত ও বাৎসল্যরসবাহী এক স্ত্রীকণ্ঠ। পরিশীলিত এবং উচ্চশিক্ষাজনিত মার্জনা তাতে স্বাভাবিক নয়, বিভূতিভূষণও দেন নি। লক্ষ্য করার বিষয়, যে, স্ত্রীবাচন (Women's dialect) রচনাতেও (এমনকি অপর একটি ভাষায় স্ত্রীবাচন) বিভূতিভূষণ কত সাবলীল এবং সিদ্ধহস্ত। উদ্ধৃত বিভিন্ন বাচনাংশগুলি থেকে (চাচী, তুলারমন, পরিচারিকা আর খঞ্জনীর উক্তি) তা স্পষ্ট হবে। চরিত্রগুলি তাদের শ্রেণী, ব্যক্তিত্ব, উপভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাহিনীর যথাযোগ্য অবস্থান-সন্ধিতে যথাযোগ্য চিত্রিত হয়েছে।

আরো কয়েকটি ভাষা ব্যবহার বিষয়েও বীক্ষণ লেখকের—নিখুঁত সম্প্রেষণ শক্তির বার্তা দেয়। 'অযাত্রায় জয়যাত্রা'তে বিভূতিভূষণ ভুল ট্রেনে চড়ে অজায়গায় পৌঁচেছেন, ফিরে আসতে হবে সঠিক ষ্টেশনে।—বাস খারাপ, লরি ভরসা। এবং "বাসে-লরিতে চিরকাল আড়াআড়ি।" লরি ড্রাইভার আঘাটায় আটকে পড়া অসহায় যাত্রীর প্রতি সদয় বটে কিন্তু নিজের ওজন বিষয়েও সচেতন। চা দোকানের মালিক খদ্দেরের (লেখক) প্রতি লরিচালকের সহানুভূতি চায়।

—"এ তুখন ভাই, তু বাঙ্গালীবাবু কো জেরা পহুঁচা না শকব?" (ও তুখন ভাই, বাঙালীবাবুকে তুমি একটু পৌঁছে দিতে পার না?)

ড্রাইভার আড়চোখে একটা ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে চেয়ে উত্তর করল—"নোকরি খোয়ায় সে বনি?" (চাকরি গেলে আমার চলবে?) কিন্তু একটু খোসামোদে সে গলে; তায় চা-ওলা দীর্ঘ পরিচিত।—

—"আব তু কহতার ত কা করি? নোকরী যাইত চা বানাবেকে দিহ দুকান মে।" (তুমি বলছ, তো কি আর করি। চাকরি গেলে দোকানে চা তোয়ের

করার কাজটাই দিও।" এই সামান্য ভোজপুরী সংলাপে চা-ওলা আর ড্রাইভারকে বেশ চেনা যায়। "চৌমাথার চায়ের দোকানের মালিক যেন সর্বজ্ঞ"—তাকে এবং ঘটনাচক্রে বাস-দুর্লভ দিনে লরির সর্বশক্তিমান ড্রাইভার যেন স্পষ্ট।

'কলতলার কাব্য' (রাণুর তৃতীয় ভাগ) চটকলের ভোজপুরী ভাষী মজুরদের গল্প। কুলী, মজুর, শ্রমিকশ্রেণীর মেয়ে পুরুষ। তাদের কথাবার্তা থেকে মানুষগুলি এবং তাদের পটভূমি বেশ চেনা যায়। শ্রমিক পাড়ার বারোয়ারি জলের কলে 'ভাজা' অর্থাৎ কার পরে কার পালা, তা নিয়ে নিত্যিদিন বচসা।—"একদিন ভাজা লইয়া গোলমাল করিতে গেলে লছিয়া জলের কলসীটা কলের মুখে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"হাম না হটায়ব; দেখি কৌনাকে অখতিয়ার বা।" (আমি সরাব না, দেখি কার সাধ্যি।)

ছেলেটা হতভম্ব হইয়া গেল—"আরে, ই ঔরৎ না জমাদার বা।" (আরে এ এ মেয়ে—না সেপাই ?) মেয়েটা যাইবার সময় কথা রাখিয়া গেল।—"হাম, হারামজাদগি তোড়া, হাঁ।...বউয়া ডেরায়ল বাড়ন।" (আমি বদমায়েসী ভাঙব বলে দিলাম।—বাছাধন ভয় পেয়েছেন।)

'জীবন তীর্থ' গ্রন্থে এক মৌলবীসাহেবের উল্লেখ আছে। ছাত্রদের প্রতি তাঁর তিরস্কারের ভাষা লেখক উদ্ধৃত করেছেন।—"আরে আদমিকা বাচ্চা, বয়েল।"—অর্থাৎ ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে তিনি সতর্ক থাকতেন যাতে পিতা বা গুরুজনদের প্রতি অসম্ভ্রম, না দেখিয়ে ফেলেন। তাই বলছেন,—"ওরে, মানুষের বাচ্চা বলদ।"—ছাত্রের প্রতি তিরস্কারটুকুর ভাষা বহুশ্রুত মুসলমানী সহবৎ সম্পন্ন এক শিক্ষিত মৌলবী শ্রেণীকে নিমেষে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

৫। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় বাংলাতর ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে কয়েকটি লক্ষণীয় বিন্দু অভিনিবেশ আকর্ষণ করে।—

প্রথমত তিনি এইসব ভাষা ব্যবহার করেছেন শুধুই সংলাপে, পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনে। ক্বচিৎ কোন কিছুর পরিচয় দিতে দুটি একটি 'অবাংলা শব্দ এবং কখনও কখনও হিন্দী রামায়ণ অথবা কোন গান ইত্যাদি থেকে সামান্য উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁর রচনায় অবাংলা ভাষার প্রয়োগ সমস্তটাই পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনে।

এই বিশেষ প্রয়োগকলায়, বিষয়বস্তুর পটভূমিকা, ঘটনা, ঘটনাপ্রবাহ ইত্যাদি বর্ণনায় অন্য ভাষা প্রয়োগ বিরল যেহেতু তেমন প্রয়োগের কার্যকরতায় সংশয়ের অবকাশ আছে। পটভূমির চরিত্র ফোটাতে বর্ণনায় অতি ক্বচিৎ ব্যবহার হয় স্থানীয় বাচন। হলেও শব্দ চয়ন এবং শব্দ সংস্থানই মুখ্য ভূমিকা নেয়। প্রকৃতপক্ষে, পাত্র-পাত্রীকে তাদের আপন ভাষায় কথা বলানোই স্বাভাবিক-

তায় বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার সহজতম এবং শ্রেষ্ঠতম উপায়। এই কলাকুশলতার এক কালজয়ী উদাহরণ আমাদের হাতে আছে।—"ও কি মায়া, কি স্বপন ছায়া, ও কি ছলনা"—এ সব সন্দেহ, অবিশ্বাসকে বহু তফাতে সরিয়ে দেয় পাগলা মেহের আলি, যখুনি আমাদের বোধে তার কণ্ঠস্বরে তার জিহ্বার রণন ঝনন ঠিকরে পড়ল,—"তফাৎ যাও,—সব ঝুট হ্যায়।"

অপরাপর ভাষায় বিভূতিভূষণ সে যথেষ্ট কথোপকথন রচনা করেছেন, তা ভাষাব্যবহার অধ্যয়নেও সাহায্যের হয়েছে। কথোপকথনের প্রকৃতি বিচার ভাষা ব্যবহার অধ্যয়নে বিশেষ মূল্যবান তা সমাজ ভাষাবিজ্ঞান (Socio linguistics) প্রতিষ্ঠিত করেছে। সার্বিক ভাবে ভাষা বিজ্ঞান চর্চায় ক্রমবর্ধমান আগ্রহ কেবল মাত্র ধ্বনিতত্ত্ব এবং ব্যাকরণ অধ্যয়ন মনস্কতায় নিবদ্ধ নেই আর। আলাপচারিতা বিশ্লেষণে (Discoures analysis) তীব্র মনোযোগ ন্যস্ত হচ্ছে। ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক বাস্তবধর্মিতা (Pragmatics) কে ভাষাবিজ্ঞান বিশেষ স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং বাকক্রিয়া ব্যাখ্যা-তত্ত্ব (Speech-Act theory), জাতি বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা (Ethnome thodology) ইত্যাদি ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তত্ত্ব গুলিতেও নতুন করে কৌতুহলী দৃষ্টিপাত ঘটছে। ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়নে এই নবীন আগ্রহ ও উৎসাহী পদপাত যে ধারণা ও প্রয়াসকে ভিত্তি করেছে, তাকেই মোটের উপর বলা চলে 'Communicative competence' (বাচন দ্বারা বক্তব্য যথাযথ জ্ঞাপন শক্তি)।[১০]

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অধিগত ছিল প্রতিবেশী কয়েকটি বাচন, ভাষা বা উপভাষা। আপন বিস্তৃত রচনায় সেগুলির প্রয়োগে তিনি Linguistic competence (বাচন ব্যবহার শক্তি) এর প্রমাণ তো রেখেইছেন, Communiative competence ও যে তাঁর অসাধারণ, তারও প্রমাণ সর্বত্র। আয়ত্ত ভাষাগুলি সঠিক ভাষাতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সম্প্রেষণায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মসৃণ কলমে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে এ দুর্লভ প্রাপ্তি।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিন্দু হল, তিনি সর্বদা আঞ্চলিক বাচন ব্যবহার করেন নি। স্থানীয় ভাষাভাষী সব চরিত্র সর্বত্র আপন ভাষায় কথা কয়নি বিভূতিভূষণের গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কথা, স্মৃতিচারণায়। —ভাষাগুলি যেন ব্যবহৃত হয়েছে অনেকটা লেখকের খেয়াল খুশিতে। স্বয়ং লেখকও মনে করতেন তাই, বলতেনও। একবারের সাক্ষাতে (২১/১২/৮৬) নানা কথাবার্তার ফাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁর অবাঙালী চরিত্রেরা কেউ নিজের ভাষায় কথা বলে, কেউ বলে না ; যারা বলে তারাও কখনও বলে, পরক্ষণেই আর বলে না। আবার হয়তো বলল, —এমনটা ঘটার পিছনে তাঁর সচেতন কোন চিন্তা বা প্রয়োগ কৌশল সক্রিয় কি না। তাঁর নির্দ্বিধা উত্তর ছিল,—"ভাষাগুলো জানা আছে,

বলতেও পারি। লেখার টানে কোথাও এসেছে, কোথাও আসেনি। তেমন ভেবে করিনি, ভেবে দেখিও নি এ নিয়ে কখনো কিছু।"—

স্রষ্টা এমন বলতে পারেন, উত্তর দেওয়ারও কোনও দায় তাঁর নেই। কেননা গৃহীত মাধ্যমে (আমাদের আলোচনায় ভাষা) অভিব্যক্তির পরিবর্তমানতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব শিল্পীর 'আপরুচি'র হাতে। অভিব্যক্তি কথন বা লিখন, যাতেই হোক না ;—এ শৈলী-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা এবং অবিসংবাদিত ভাবে গৃহীত। বিভূতিভূষণের শৈলীও ইচ্ছানুসারে নানা কৌশল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রেখেছে।[১১] প্রয়োগ, রচনাকারের ইচ্ছাধীন বটে, তবে আলোচনার কৌতূহল একটু থেকেই যায়। ভাষা ব্যবহারের অন্ধিসন্ধি, ভাষা প্রয়োগ কলার—নিপুণ কারবারী, লেখকের আয়ত্তে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাকে "ভাষার রহস্য"[১২] বলছেন, তা আর এক ভাবে ভাষাতত্ত্বের কারবারী, তত্ত্বআলোচকের আওতায় বটে। লেখকের আয়াস বা অনায়াসলব্ধ ভাষাজ্ঞান যখন অভ্যস্ত প্রয়োগসৌকর্যে শিল্পবস্তুকে সামনে মেলে দিল, প্রয়োগকলার কোন কোন নিয়মকে তাতে প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অথবা খাটানো হয়েছে, তা তাত্ত্বিক অল্পঅধিক সচিহ্ন করেন। চিহ্নিত করলেও, ভাষার নিয়মের সচেতনজ্ঞান তাকে সে বস্তুর সাফল্য-রহস্যের চাবিকাঠি হাতে ধরিয়ে দেয় না। "বিদ্যুৎলতা, দেখা না দেখায় মেশা"ই থেকে যায় অনেকখানি।

যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, অপর ভাষা থেকে লাগসই শব্দ, বাক্য, বাক্যবন্ধ বিভূতিভূষণ মোক্ষমভাবে ব্যবহার করেছেন খাঁটি স্থানীয় রঙের সন্নিবেশে ছবিকে স্বাভাবিক করে তুলতে। সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকরসরচনার স্বাভাবিক কুশলতা ওই প্রয়োগ কৌশলকে যতদূর সম্ভব খাটিয়ে নিয়েছে নিজের স্বার্থে। নইলে "বাবুজী, সমধি আইল বাড়ন" বা "ভোজপুরী বারাৎ উৎরি থি" (দুটিই 'অযাত্রায় জয়যাত্রা'য়) ইত্যাদির মত 'চয়ন' বা 'গ্রহণ' (borrowing) এর মোক্ষম উদাহরণগুলি পাওয়া যেতো না।

দুঘণ্টা লেট হয়ে যাওয়া গাড়ি (সোনপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে) গার্ডের হুইশল, লাইন ক্লিয়ার ইত্যাদি পেয়েও ছাড়ে না কেননা ইঞ্জিনের ভিতর তার টানতে তারে হাত দেওয়া ড্রাইভারকে নীল হাফ প্যান্টপরা গায়ে গেঞ্জি কিশোর পরিত্রাহি ছুটে এসে খবর দিল,—"বাবুজী, সমধি আইল বাড়ন্" আর ড্রাইভার ইলেকট্রিকের শক খাওয়া মুখে, আরো ঘণ্টাখানেকের জন্য উধাও হয়ে গেল। এই ঘটনাসংস্থানের নিগূঢ় হাস্যরস পাঠকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার উপায়ই হল স্থানীয় বাচনে ওই 'সমধি' শব্দটির ব্যঞ্জনা। ট্রেন ছাড়তে হোক বা বন্যারোধ করতে হোক, বাপ অপারগ হবেই, উধাও হয়ে যাবেই যদি শুনতে হয় 'সমধি' (ছেলের বোনের শ্বশুর অর্থাৎ বাপের বেহাই) এসেছে। সমধি

সমাসম বার্তার পর আর কিই বা বলার থাকে! এ সমাজে সমধি-সমান V.I.P. আর নেই।

ঠিক এমনই সব কথা বলা হয়ে যায়—যখনই রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজার ক্ষুধাক্লিষ্ট লেখককে শূন্য ভাঁড়ার দেখিয়ে বলেন, "ভোজপুরী বারাৎ উৎরিথি।" —ভোজপুরী বরযাত্রী নেমেছিল যে স্টেশনে সেখানে বা সেখানকার চৌহদ্দিতে আর কি খাবার পাওয়া যেতে পারে!—"খাবারের দোকানগুলোর সব খাবার খেয়েছে; চিনে বাদাম, ছোলা ভাজা, চিঁড়ে ভাজা, ঘুঘনি, হারা চানা (কাঁচা ছোলা), বেগুনি, ফুলুরি, গরম দুধ, মালাই, খোওয়া, রামদানাকা লাড্ডু; এদিকে চা, বিস্কুট, পাঁউরুটি—সব বেবাক খেয়ে গিয়েছে; অবিশ্যি কিনেই। স্টেশনে একটি পান কি সিগারেট পর্যন্ত পাবেন না।" (অযাত্রায় জয়যাত্রা)

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময় অবধি মানে না যখন দেখা যায় 'কুইট ইণ্ডিয়া' (অষ্টক)র মত গল্প চরিত্রগুলির মুখে তাদের মাতৃভাষা পরিহার করা হয়েছে। এই গল্পের কাঠামো, ঘটনা, চরিত্র—সবকিছুর উচ্চকিত দাবী হওয়া স্বাভাবিক ছিল,—অন্তত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে,—স্থানীয় dialect কিন্তু ঘটনামন্দির চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্তেও লেখক সংলাপ দিয়েছেন আদর্শ মৌখিক বাংলায়।

প্রথম শ্রেণীর ট্রেনের কামরায় ছিলেন, লেখক ও মিস গ্রেস যিনি ভারতের 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনকে ঘোর অন্যায় মনে করেন। নিজের মনোনীতকেও ইণ্ডিয়া ছেড়ে যাওয়ার ভাবনা থেকে বিরত করতেই চলেছেন ছাপরার কাছাকাছি এক জায়গায়। মধ্যে এক স্টেশনে "গাড়ির দুই পাশে দোরজানলা দিয়া দুইটা যাত্রিদল পিলপিল করিয়া ঢুকিয়া গাড়িটা একেবারে ভর্তি করিয়া ফেলিল।" সেই দুই বরযাত্রীদল নিজের নিজের বাজনা, বাগ্গির ব্যাণ্ড নিয়ে চলেছে।—"নানারকম বাজনা—ঢাক, জয়ঢাক, বড় বড় করতাল, ক্ল্যারিয়নেট, কর্ণেট, ব্যাগপাইপ, দেশী ঢোল, ঢাক, শানাই, রামশিঙা—রকমারি ব্যাপার একেবারে।" আর এই সমস্তর উপর ছাপরা জেলার জুন মাসের ভরা দুপুর, হাওয়া—আগুনের হল্কা।" বিহারের 'লগনসা' অর্থাৎ বিয়ের মুখ্যসময় গ্রীষ্মেই। কামরায় দুদিকে দুই বরকর্তা বসে আছেন আপন আপন উচ্চ গাম্ভীর্য নিয়ে, মহিমাচ্ছটা বিকীরণ করে।—"ওদিকে মোটা গোঁফ আর গালপাট্টা সমন্বিত প্রধান ভদ্রলোকটি ওদিককার বরের পিতা। বাবু গুলজার সিং, ভয়ংকর রাশভারি আর ফরিয়াদী লোক। এদিককার কর্তা বরের ভাই—মাথায় বাবড়ী, গোঁফ অত বড় নয় তবে একটা রাজপুতী ঢঙ আছে; অত্যন্ত রগচটা মানুষ। নাম বলবন্ত সিং।"

এঁদের নেতৃত্বে সেই জুন মাসের আগুন ঝরানো দুপুরে ট্রেনের কামরায় দুই বাজনদলে বাজনার প্রতিযোগিতা লেগে গেল। একজন আরম্ভ করলেন,

অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে উচিত প্রত্যুত্তর দিলেন। "কোন যন্ত্রই বোধহয় বাদ নাই, সুর-তালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া সবগুলা যেন একটা প্রলয়তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে।"—এমন সময় ওদিককার কর্তা (আপন ম্যানেজারের প্রতি) হুংকার করিয়া উঠিলেন,—"এমন গুণ্ডা (বোবা) বাজনা কোথা থেকে যোগাড় করেছ তোমরা? জবাব দাও, চুপ করে কেন?"—কর্তার মোসাহেব সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন,—"কেন, আওয়াজ তো হচ্ছে হুজুর। বাজনা তো গুণ্ডা নয় আমাদের।" কর্তা হুংকার করিয়া উঠিলেন,—"কিন্তু ঢাক ঢোলের আওয়াজ কোথায় মশাই? বাজনায় ঢাক নেই, বিয়েতে তা হলে কনে না থাকলেও চলে।" এই বাক্যালাপটি এবং গল্পের প্রায় সব বাক্যালাপই আদর্শ মৌখিক বাংলায়। বাজনার দাপট সহ্য করতে না পেরে ভারত ত্যাগ বিরোধী মিস গ্রেস শেষ পর্যন্ত রেলের কামরা ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর কথাবার্তাও মোটের উপর বাংলায়। বাজনা প্রসঙ্গে একবার বাবু গুলজার সিংএর ক্রোধতপ্ত কণ্ঠে একটা আঞ্চলিক শব্দ (গুণ্ডা) বসিয়েও শেষমেষ বাংলাই জারি রেখেছেন লেখক। তবুও লক্ষ্য অবশ্যই করতে হবে যে, এখানকার—'Humour' বা কৌতুকটার অবস্থান বিন্দু (Locative) ওই শব্দটি। অন্যপক্ষের বাজনা সঢাক। ঢাক ছাড়া নিজেদের বাজনা, যা প্রলয় তাণ্ডবকেও হার মানায়, তাও 'গুণ্ডা' মনে হচ্ছে বাবু গুলজার সিং এর কানে। শব্দ চলনে বোবা আসে নি, এসেছে 'গুণ্ডা'। সুতরাং আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথনের অনুপস্থিতি এই গল্পে লেখকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এরকম আরো ঘটেছে।

রচনা অনুবাদ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা লেখককে অন্যভাষা বহুল পরিমাণে একই গল্পে ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারে। পদে পদে অনুবাদ যোজনায় গল্পের রস ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ও থেকেই যায়। লেখক যাকে বলেছেন, "গল্পের টানে" ভিন্নতর বাচন ব্যবহারে আসা অথবা না আসা; সেই অসচেতন তাৎক্ষণিক বিবেচনাও হতেই পারে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। বলার কথা নানা ধরনে বলা যায়; কোন ধরনে ন্যস্ত হবে লেখকের নির্বাচন, সে রহস্য "মানুষের মনোভব-ভাষাজগতের অদ্ভুত রহস্যই" বটে।[১৩] সম্ভবত প্রতি রচনা, প্রতিবারের সৃষ্টিই শিল্পীর বোধে জাগায়, "অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার।"

প্রসঙ্গ সূত্র:

(১) 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি', পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, (বেঙ্গল পাবলিশার্স)। আগে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ঐ বছরই ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ করে।

(২) "In a descriptive, synchronic sense 'language' can refer either to a single linguistic norm or to a group of related norms. In a historical, diachronic sense, 'language' can either be a common

language on its way to dissolution, or a common language resulting from unification. A 'dialect' is then any one of the related norms comprised under the general name 'language'—"

E. Hangen, 'Dialect, Language, Nation, Penguin Modern Linguistics Readings, 1972.

(৩) "People who live in the same community and amicably interact with one another, speak in a manner which greatly resembles one another's speech. This is indeed to be expected from the nature of the learning resorces available to them.

M. W. Sugathapala De Silva, 'Diglossia and Literacy' CIIL, Mysore, 1976.

(৪) '...the presence of a language—specific 'common core'(outoflexis) is not always a necessary requirement of commu nication'—তদেব।

(৫) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ 'রাণুর প্রথম ভাগ' ; প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৪৪, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

(৬) 'বিচিত্রা', জৈষ্ঠ ১৩৩২ সংখ্যায় ভাষণটি প্রকাশিত হয়েছিল।

(৭) 'জীবন তীর্থ', ১৩৮৬, শরৎ সমিতি। বইটি লেখা সারা হয়েছিল প্রকাশের প্রায় দুবছর আগে।

(৮) বিদ্যাপতির দুর্গাবিষয়ক পদগুলি মিথিলা এবং মৈথিলী সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় ; রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের সমান, এমন কি অধিক।

(৯) The appropriate designation and definition of domaines of language behavior obviously calls for considerable insight into the socio-cultural dynamics—"

S. A. Fishman, 'The study of who speaks what language to and when —Penguin, 'Sociolinguistics' 1972.

(১০) "The term was irst used by Dell Hymes in 1972. He argued that it was essential to incorpoate social and cultural factors into linguistic description."

Jennifer Coats : Women, Men and Language, Longman 1986.

(১১) দ্র.—এই লেখকের 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পশৈলী' সাহিত্য ও ও সংস্কৃতি : কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৩।

(১২) "ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা করে বিস্মিত হই।"—ভূমিকা, 'বাংলা · ভাষা পরিচয়', রবীন্দ্রনাথ।

(১৩) তদেব।

ছোটগল্পে বিভূতিভূষণের শিল্পীমানস

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

"A short story must contain one and only one informing idea that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method."

ছোটগল্পের এই সংজ্ঞা বোধকরি আর কিছুদিন পরে থাকবে না। ক্রমশঃ তার চরিত্র পাল্টাচ্ছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত তা আভাসে বা প্রতীকে বিম্বিত হবে। গল্পের বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক নির্ভর এক ধরনের আশ্চর্য কায়াহীন, অসম্বদ্ধ ধারণায় রূপায়িত হয়ে পরিবেশিত হবে। বলতে দ্বিধা নেই, ইতিমধ্যেই সেই প্রবণতা বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিযুদ্ধের এই বিষম টানাপোড়েনে অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের প্লট, চরিত্র যেমন প্রচণ্ডভাবে পাঠকের মনস্কতা দাবি করছে, গল্পকারও অনুরূপভাবে পাঠকের রসবোধের কঠিন পরীক্ষা নিচ্ছেন। স্বভাব সুলভ কমনীয়তা পরিহাসপ্রিয়তা, রঙ্গব্যঙ্গ অথবা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ঘটনা পরম্পরা ছোটগল্প থেকে প্রায় বিদায় নিতে চলেছে। এমতাবস্থায়, অনেক সময়েই হয়ত, জটিলতর, সমস্যাকণ্টকিত জীবনে আরো বেশি করে লঘু, স্বচ্ছন্দ, গল্প নির্ভর, হাস্যরস নিষিক্ত রচনার দিকে আকৃষ্ট হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মত ছোট গল্প স্রষ্টারা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সময় এগিয়ে চলে। তার রং বদলায়, রূপ বদলায় আর বদলায় মেজাজ। তার সঙ্গে তাল রেখে বাছাই করে চলেন শিল্পী। কিন্তু বাছাইকালীন মানস পরিক্রমার রেখাচিত্র যেহেতু সবটুকুই তাঁর (লেখকের) একান্ত আপনার, তাই দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিন্ন না করে সাধারণ মানুষের হাসি অশ্রুর দু-একটি মুক্তোবিন্দুর খবর রাখার দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা সচেতন—যা পাঠকের প্রার্থিত। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে তার প্রাচুর্য।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় দাদামশায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঙলা সাহিত্যের

পাঠক যে জন্য মনে রাখবেন সেইজন্যেই মনে রাখবেন বাংলা সাহিত্যে পিতামহ সদৃশ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে। হাস্যরসের নির্মল আনন্দধারায় এঁদের ছোটগল্প বিভাসিত—'আই-হ্যাজ' এর যথার্থ উত্তরসূরী 'বিপন্ন' 'বসন্তে' গল্পসমূহ।

[দুই]

মানুষ বিভূতিভূষণ শিল্পী বিভূতিভূষণের প্রকৃত প্রতিফলন কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তবে এটা নিশ্চিত যে মন্ময়তা ও ঋজুতার মিশ্রণে তাঁর আপাত গম্ভীর স্বাদু ব্যক্তিত্বের মর্মমূলে হাসি অশ্রুর দ্বিমুখী নির্ঝর নিয়ত সজীব ও সক্রিয় ছিল। বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না রসিক, পরিহাস-প্রিয়, কৌতুক স্নিগ্ধ সদাহাস্যময় এই পুরুষটিকে। আতিথ্যে, বাৎসল্যে, প্রীতি বিনিময়ে সদাব্যগ্র বিভূতিভূষণের কাহিনীগুলি হাসি-অশ্রুর যুগল মিলনে ভরিয়ে দেয় পাঠকের মন।

তাঁর গল্পরস নিষ্পত্তিতে তিনি বেছে নিয়েছেন পরিচিত জীবনের ভালমন্দ, ঈর্ষা-হিংসা, সত্যমিথ্যা, প্রেম-অপ্রেম, লোভ-ক্ষোভ, বাসনা কামনা, শ্রদ্ধা-সততা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির সহজ সরল অভিব্যক্তি। একটি আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট গল্পে আমাদের রোজ নামচা আস্তররস জারিত হয়ে একেবারে বুকের মাঝখানটিতে ঠাঁই করে নিয়েছে। বিভূতিভূষণের যে স্নেহসুধাস্পর্শে আপামর সাধারণ নিত্য সঞ্জীবিত ছিল তারই সুস্পষ্ট ছাপ মেলে তাঁর সাহিত্যে। আনন্দ উচ্ছ্বাসে মঞ্জরিত এই সাহিত্য সাধকের ছোটগল্পগুলি যেন এক একটি উজ্জ্বল স্ফটিকখণ্ড।

স্নিগ্ধ, শান্ত, নম্র, কমনীয় বাঙালী মানসিকতার পরিহাস-উজ্জ্বল পরিবার-পরিজন বেষ্টিত তাঁর যে নিজস্ব পরিমণ্ডল ছিল সেইস্থান থেকেই সংগৃহীত তাঁর গল্পের রস ও রসদ। দুয়ার থেকে অদূরে বিভূতিভূষণ সঞ্চয় করে রেখেছিলেন বিচিত্র কাহিনীর বিশাল ভাণ্ডার।

[তিন]

ভ্রাতুষ্পুত্রী 'রাণু' বিভূতিভূষণের হাস্যরসমূলক গল্পগুলির মূল ও প্রথম উৎস। শিশু চরিত্রের নানা বৈচিত্র্য ঘিরে তাঁর বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিতভাবে আমাদের আকর্ষণ করে। অথচ, এর জন্য বিশেষ কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি। 'রাণুর প্রথম ভাগ' (১৯৩৭), 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' (১৯৩৮) ও 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' (১৯৪০) ও 'রাণুর কথামালা' (১৯৪২) বিভূতি সাহিত্যের নির্ণায়ক পর্বরূপে চিহ্নিত।

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন :

"...'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পটি শিশুমনের হাস্যকর অসঙ্গতি ও অদ্ভুত কল্পনা-প্রবণতার বিষয় লইয়া যে কয়েকটি গল্প রচিত হইয়াছে তাহাদের মূল উৎস। ইহাতে শিশু রাণুর অকালপক্ক গৃহিণীপণার অভিনয়, প্রথমভাগের সহিত আপোষহীন বৈরিতা, না পড়িবার অসংখ্য ছল ও অজুহাতের

আবিষ্কার যে হাসির আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে মেজকাকার সহিত বিদায় বেলার শোকোচ্ছ্বাস হৃদয় দ্রবকারী করুণ রসের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হইয়াছে।...” [বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : পৃ. ৪১৬]

মেজকাকার শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ পাঠের দ্বারা শিশুর 'নিরঙ্কুশ ও 'নব নব দৌরাত্ম্য উদ্ভাবন' মনকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যর্থ প্রয়াস নিঃসন্দেহে হাসির উদ্রেক করে; সেই সঙ্গে, 'বাদল' গল্পের মধ্যে পরিবারের অন্যান্য শিশুদের বাদলের বিরুদ্ধে অভিযোগে এক চমৎকার শিশুজগৎ সৃষ্টি করেছে। এই শিশুমহলের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারা না তাদের মেজকাকা এটাও বোধহয় ভেবে দেখার বিষয়।

শৈশব-কৈশোরের চিন্তা ও বিচিত্র কল্পনা বিলাস শিল্পীর স্বকীয় ভঙ্গীতে রূপ পেয়েছে। 'পৃথ্বীরাজ' ও 'কাব্যের মূলতত্ত্ব'-এ বিদ্যালয়ের গুরুগম্ভীর আবেষ্টনে শিক্ষাদান পদ্ধতির অসঙ্গতি, কৃত্রিমতা, ছাত্রের বিকৃত অর্থবোধ ও নানা অপকৌশল, ছাত্রদের মধ্যে ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার 'বক্রপ্রভাব' একই সঙ্গে তীব্রশ্লেষ ও কৌতুককর অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

[চার]

বিবাহ ব্যাপারে নানারসের অবতারণায় স্বাদবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন লেখক। নিজে অকৃতদার। অথচ, শুধু অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে তাঁর লেখনী বিবাহ বিষয়ক বিবিধ সরস কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমাকে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, “বিয়ে আমি করিনি বটে তবে দিয়েছি প্রচুর। বিয়ে করিনি বলে তার প্রত্যক্ষ ভালমন্দের দিকটা হয়ত বর্ণনা করতে পারব না কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানের যত অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি তা বোধ-করি নিজে বিবাহিত হলে সম্ভব হত না।”

'বিয়ের ফুল' ও 'মোটর দুর্ঘটনা'য় বিবাহ বিপত্তি “একটিতে দীর্ঘপোষিত আশাভঙ্গ, অপরটিতে কৌমার্য পালনের প্রতিজ্ঞাচ্যুতি—হাসির প্রবাহ ছুটাইয়াছে।” এই প্রসঙ্গে 'মেঘদূত' 'বসন্তে' প্রভৃতি স্মরণীয়। অবশ্য সর্বত্রই যে সিদ্ধি সমান এসেছে তা নয় কিন্তু ভঙ্গীটির বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন স্পৃহা নিঃসন্দেহে কৌতুকাবহ। এটাই ওঁর স্টাইল।

'বিপন্ন'-এর মৌলিকতা প্রশংসনীয়'—আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এ মন্তব্য ষোল আনা খাঁটি। বাঙালীর সৌন্দর্যবোধ ও প্রসাধন রুচিতে আস্থাশীল নব পরিণীত বিহারী ছাত্র নবাগত বাঙ্গালী অধ্যাপকের নিকট বেনামীতে নিজ দাম্পত্য সমস্যার ইঙ্গিত দিতে নাকাল হয়েছে।

'যুগান্তর'-এ আধুনিক যুগের সঙ্গে পঞ্চাশ বছর পূর্বের বিবাহের আনন্দোৎসব প্রতিবেশের সুন্দর তুলনা করা হয়েছে। আজকের দিনে তো এ জাতীয় আবহাওয়া শুধু অকল্পনীয় নয়, অসম্ভব—হয়ত বা অবাস্তবও। কোথায় সেই পারিবারিক ঐক্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠানের পালনের মধ্যে সতর্ক নিষ্ঠার সাথে

শঙ্কিত শুভকামনা, বরবধূর মনে প্রথম প্রণয় আবেশ—সবই যেন দূরশ্রুত অতীতের গর্ভে বিলীন, যুগের হাওয়ায় অন্তর্হিত। তবুও তরুণ-তরুণীর অন্তরের কোন পরিবর্তন দেখা যায় কি? বিভূতিবিভূষণ এই চিরন্তন সত্যকেই তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন।

[পাঁচ]

অবস্থা সংকট থেকে নয় বরং চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তর্কালোচনার ভেতর দিয়ে নির্মল আনন্দ ও হাসি সঞ্চারিত হয়েছে এমন কতগুলি গল্প হল, 'নোংরা, 'হোমিওপ্যাথি', 'অব্যবহিতা' 'কস্মৈ হবিষা বিধেম,' 'মধুলিড়', 'তীর্থ ফেরত' 'মাথা না থাকিলেও' প্রভৃতি।

'তীর্থফেরত'-এ সদ্যতীর্থ প্রত্যাগতা বৃদ্ধা ধূলাপায়েই পাড়াতে কোন্দল বাধাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর অনুপস্থিতিতে শান্তি বিরাজ করত এবং 'যে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত' হয়েছিল সেটি বিপর্যস্ত করে বৃদ্ধা যেন এতদিনের ক্ষতিপূরণে বিষম ব্যস্ত হয়েই কোমর বেঁধে লেগেছেন। এই সমস্ত গল্পের ভেতর লেখকের হাস্যরস মার্জিত রূপ গ্রহণ করে জীবনের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হয়ে নির্ভেজাল 'হিউমার' এর পর্যায়ে পড়েছে।

গভীর সুরে লেখা গল্পগুলির মধ্যে 'ননীচোরা', 'প্রশ্ন' 'মাতৃপূজা' ও 'আশা' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'মাতৃপূজা'-য় বাঙালীর দলাদলির শিকার হয়ে একদিকে যেমন বাঙালীর প্রিয় উৎসব দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়েছে অন্যদিকে পূজার এই প্রহসনান্তে মৃত্যুপথযাত্রী সান্যাল মশায়ের বুকে যে নিদারুণ শেল হেনেছে—তার বেদনা পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়েছে।

ভাবাবেগের দিক দিয়ে 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনি কলা-কৌশলের দিক দিয়ে 'আশা' অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আশা'-র আলোচনায় লিখছেন: "...এই গল্পে লেখক বিচিত্র দক্ষতার সহিত,

> অভিনব আবেষ্টনে ভৌতিক শিহরণ জাগাইয়াছেন। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে জনহীন শহরতলী, সদ্য রোগমুক্ত তরুণ কবির শিরায় শিরায় প্রাণ চঞ্চলতার প্রবল উচ্ছ্বাস, ...প্রতিবেশীর রুদ্ধদ্বার, প্রতীক্ষাস্তব্ধ গৃহ, হানাবাড়ির জনশ্রুতি, প্রণয়োন্মুখ চিত্তে অপ্রাকৃত কল্পনার ভ্রান্তি—এই সমস্ত মিলিয়া অতি প্রাকৃতের এক আদর্শ পটভূমিকা রচনা করিয়াছে।..."

[বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৪১৯]

অব্যবহৃত পালঙ্কে আলোছায়ার খেলায় স্বপ্নপ্রবণচিত্তে দৃষ্টি বিভ্রমে অলক্তক রাগ রঞ্জিতা সুখশায়িতা সুন্দরীর রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সেইসঙ্গে বৃদ্ধদম্পতির হৃদয় মৃত দুহিতার প্রত্যাবর্তনের আশা-মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত, প্রতীক্ষারত। এই মনোবিকার মোহগ্রস্ত তরুণের মনেও সঞ্চারিত হওয়ায় তার সংশয়াকুল প্রত্যাশাকে স্থির প্রতীতি প্রদান করেছে।

[ছয়]

বিভূতিভূষণের হৈমন্তী (১৯৩৪) ও 'কায়কল্প' (১৯৪৪) গল্পগ্রন্থ দুটির মধ্যে 'আর্ট', 'মানুষ' 'হৈমন্তী' শ্রেষ্ঠ।

মানুষ ঠকতে-ঠকতে, ঠেকতে-ঠেকতে শেখে। দান করে লাঞ্ছিত হওয়া বোধহয় সর্বাপেক্ষা গ্লানিকর—'আর্ট' গল্পে তারই ছবি ফুটে উঠেছে।

অন্ধভিখারী ও ফেরিওয়ালা অনাথ বালকের পরস্পরের স্নেহসম্পর্ক সহজেই নায়কের মনে মানুষের প্রতি লুপ্ত বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। 'মানুষ' গল্প এখানেই সার্থক।

'হৈমন্তী'তে বিগত যৌবনের উপেক্ষিত প্রণয়াবেগের স্মৃতি নায়কের মনের আকাশে হেমন্ত-অপরাহ্নের গোধূলি আকাশের রঙীণ বর্ণসমারোহে উজ্জ্বল।

'চ্যারিটি-শো', 'ফুটবল লীগ' ও 'ভক্ত' গল্প ত্রয়ীতে ফুটবল ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি যুব সমাজের অতিরিক্ত নেশার ফলে যে কৌতুকাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তারই হাস্যরসাত্মক বিশ্লেষণ।

'ভক্ত' গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য। এক চিত্রতারকার অতর্কিত উপস্থিতিতে পল্লীগ্রামের কিশোর সম্প্রদায়ে যে কেমন হুলস্থুল ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে তারই সরস বর্ণনা। হৃদয়বৃত্তি যুগে যুগে কেমন পরিবর্তনশীল সেটিই লেখক তুলে ধরেছেন—দেবদেবীর ক্ষেত্রে যে ভক্তি কয়েক পুরুষ আগে দেখা যেত সেই ভক্তির পাত্র বদল হয়েছে—film star বর্তমানে সেই স্থান নিয়েছে।

"দেহ্-সমাং নিক্ রহো"—কথাটা মিথিলাঞ্চলের এক প্রবাদ—বড় আশীর্বাদ। অর্থ হচ্ছে—তোমার শরীর এবং পরিবারবর্গ কুশলে থাক্। (গল্পটি কথাসাহিত্যের সপ্তদশ বর্ষ কার্তিক, ১৩৭২ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ পায়)। বিভূতিভূষণ এই কাহিনীতে যে বিষয়টি নির্বাচন করেছেন সেটি মর্মান্তিক শ্লেষে পরিণত হয়েছে। শেষটুকু তুলে দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমওয়ালী বুড়ি ঠকিয়ে গেছে অথচ :

"...আমগুলো যে রেখেও নিলাম তা ওর ভাঁওতাতে পড়েই নয়। কুটুমসাক্ষাতের কাছে কিছু আম পাঠাতে হয়, কাঁচা বোধহয় আরও কিছু কিনতেই হবে। ও যে দামটা বলে তা থেকে শতকরা দু'তিন টাকা যে কমাই আমি (সেটাও- ও ধরে নিয়েই বলে), সেটা কমিয়েও নিলাম। রেওয়াজ মাফিক খানিকটা নাকী কান্নাও কাঁদল বুড়ি, ওরা ক'জনে দোয়ারও দিল, জেনেই কিছু লোকসান দিই বলে এসবে খানিকটা সান্ত্বনাই পাই বরং।

আজ সব চুকে-বুকে গেলে ঐ গোছা নোট আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে একটু হাত তুলে সে আশীর্বাদটুকু করল—"দেহ্-সমাং নিক্ রহো"—

তাই তো—কিন্তু মনটা সত্যই বড় খারাপ হয়ে রয়েছে।

কী অগ্নিমূল্যে কিনতে হোল আমায় আজ এই চারটি শব্দ? এতদিন পরে এসে একবারটি একটু বাজার না বুঝে ঘুড়ির খপ্পরে গিয়ে পড়ায় জন্যেই না?"

[সাত]

'শারদীয়া' গল্প গ্রন্থটি শেষ আলোচ্য। গ্রন্থটির বুকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহ সুবাস উৎকীর্ণ—এর মূল্য কোনদিনই পরিশোধ হবার নয়।

শীর্ষক কাহিনী 'শারদীয়া'র জমিদার সনাতন রায়। অর্থের মাপদণ্ডে যিনি প্রতিনিয়ত ওজন বুঝে চলেন, গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাকে বধূরূপে বরণ করে আনলেও দীর্ঘ চার মাসের ব্যবধানে নববধূকে আর একটি বারের জন্যও পিত্রালয়ে না পাঠিয়ে তার মন থেকে পিতৃগৃহের স্মৃতিটুকু মুছে ফেলতে পারার বিজয় উল্লাসে সহজেই বলতে পারেন :

> "...মা, তোমার বাবার ভয় হয়েছে আমি বুঝি তোমায় তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিলাম।...চাল কলা-খেকো ব্রাহ্মণ কিনা যার বাবা, তাই কলা ভক্ত জীবটির মত বুদ্ধি।..."

এই মর্মান্তিক বেদনাবোধের ওপরই গল্পটি দাঁড়িয়ে আছে। তাই আশ্বিনের আগমনীতে বেজেছে বিজয়ার বিষাদ। চিন্ময়ী বরণে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দযজ্ঞের সঙ্গে জমিদার বাড়ির বিশাল আয়োজনে কোথায় যেন ফাঁক ছিল—প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি মায়ের। বধূর নীরব অশ্রু নিক্ষেপের মধ্যে সনাতন রায় উপলব্ধি করেছেন :

> "...আমি নিজেই যে মায়ের বাপের বাড়ির পথ আটকে রেখেছি পুরুত মশাই। একটু দর্প হয়েছিল। মেয়েকে কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম তার বাপের কাছ থেকে।...বুঝতে পারিনি পুরুত মশাই, কোন্ মায়ের বুকের ব্যথা যে কোন্ মায়ের বুকে বাজবে, অতটা আন্দাজ করতে পারিনি... অপরাধ হয়ে গেছে।"

'অভিভাবকে'র সুর সম্পূর্ণ পৃথক। প্রুডেনশ্যাল ফ্যামিলি ইনশিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট অনাথ সরকারের সঙ্গে ব্যারিস্টার এস. কে. ড্যাটের অহি নকুল সম্পর্ক অভিনব কৌশলে মধুরতম বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে দুজনকে, দুই পরিবারকে। মিসেস দত্ত অনাথকে ফোঁটা দিয়েছে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে—অনাথও পেয়েছে তার দিদিকে এবং যথার্থ অভিভাবকের মত দিদি-জামাইবাবুর বহুমূল্য জীবনের বীমা করে দিয়েছে। এই তো উপযুক্ত সম্বন্ধীর কাজ!

'শহুরে' গল্পের নব পরিণীত কিশোর-কিশোরী নায়ক-নায়িকাকে বিহারের গ্রাম্য পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আচার-আচরণ, সামাজিক সংস্কার এবং অল্পবয়সের চপলতাকে স্থানীয়ভাষার অলংকার পরিয়ে বিভূতিভূষণ মানুষ,

প্রতিবেশকে প্রাদেশিকতার শৃঙ্খলমুক্ত করে বাঙলা ভাষা সাহিত্যের পরিধি প্রশস্ত করে দিয়েছেন। মিঠুয়া-সোনিয়ার রোমান্স বিহীন জীবনের অতি সাধারণ প্রণয় কথাকে গ্রাম্যতা বর্জিত সারল্যের মাঝখানটিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

'আচারের অনাচার' গল্পের আচার চুরির প্রধান আসামী চার কুড়ি বছর বয়েস পেরোনো দিদিশাশুড়ী। তিনি সঙ্গী করেছেন প্রপৌত্র খোকাকে, সেই বড়মাকে আচার যোগান দেয়। লেখক বড়ই সরস ভঙ্গীতে বলেছেন :

"টক আর ঝাল মেয়েছেলের চির দুর্বলতা। এইখানে সব মেয়েদেরই রসনায় রসনায় একটা গূঢ় সখিত্ব আছে, বয়সের প্রভেদ নাই।"

'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' এর কাউণ্টার পার্ট 'অন্নপূর্ণা কেবিনে'র মালিক শৈলেন শুভাকাঙ্খী (?) প্রতিবেশীদের কল্যাণে দেনায় আপাদ মস্তক জর্জরিত হয়ে কিভাবে আবার হৃত সম্পদ ফিরে পেলো 'বনলতা ভেরাইটি স্টোর্স এণ্ড রেস্তোরাঁ' খুলে, তারই হাস্যকৌতিক পরিবেশন 'নাম মাহাত্ম্য' গল্পটি। বাঙ্গালীর ব্যবসা এমনই বটে!

'আ-শরীরী' কাহিনীর অতি প্রাকৃত রস সৃষ্টিতে নায়ক স্বয়ং লেখক—তাঁর Prototype শৈলেন আজগুবি গল্প ফেঁদে বন্ধুদের নির্বাক করে দিয়েছে। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে। উপযুক্ত পরিবেশে বেশ একচোট হাসির হুররা উপহার দিয়েছেন লেখক। অজানা পাহাড়ি শহরের ডাক বাংলোর চৌকিদারের চেহারাই এ বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে। 'জামাই ষষ্ঠী'তে নববিবাহিত যুবক দেবেশ তার বন্ধু নৃপেনকে নিয়ে চলেছে পুণা রোডে—শ্বশুরবাড়ি—ছোট লাইনের এই আলো নেভা কামরায় অন্য দুজন সহযাত্রী তরুণ বিবাহিত অধ্যাপক গুপ্ত এবং দেবেশের শ্বশুর—একই গন্তব্যে নামার কালে কামরায় আলো হঠাৎ হনুমানজীর কৃপায় জ্বলে ওঠায় দেবেশের অবস্থা!

'চল্লিশ বৎসরের দুই প্রান্তে' বাচস্পতি মশায়ের সঙ্গে তাঁর পৌত্রের কালের অপূর্ব পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন মাত্র কয়েকটি রেখায় : "...প্রচুর স্বাস্থ্যে, প্রচুর অবসরে, প্রচুর মুক্তিতে সমস্ত সম্বন্ধ পূর্ণভাবে উপভোগ করা, সমস্ত রস নিংড়াইয়া পান করা, ওদিকে এক আত্ম সমাহিত জীবন ;—জীর্ণ, অকাল বৃদ্ধ, অনবসর, শৃঙ্খলিত, স্বজন বিচ্ছিন্ন, চিরবুভুক্ষু, এদিকে এক শত বিক্ষিপ্ত জীবন। মাঝে মাত্র চল্লিশটি বৎসরের ব্যবধান।"

'ঘর জামাই'-এর বহুলখ্যাত শিবপুরের গণেশ-ঘোঁৎনা আর তাদের দল—তাদের কি ভুলে থাকা যায়?

'শব্দরূপ'-এ শিল্পী স্বয়ং নিজেকে নিয়ে এমন পরিহাসমুখর হয়ে উঠেছেন যে হাসির গল্প রচনায় তাঁর অসাধারণ পটুত্বে আমাদের মন শ্রদ্ধায় নত হয়ে ওঠে। কি অনায়াস সিদ্ধি!

তাই বলছিলাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর শিল্পী মানসকে রসে-বশে রেখেছিলেন, শুক্‌নো সন্ন্যাসী হ'তে দেননি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাঙালীর জন্য 'ঘুমিওপ্যাথি' দিয়ে গেছেন আর তিরানব্বই বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বেদনার গুমোট ও হাসির মৌতাত মিলিয়ে বিভূতিভূষণের প্রাণময়-বাঙময় সাহিত্য বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাকে যে 'এলিক্সির' Prescribe করে গেলেন তা এক কথায় অতুলনীয়। বাঁচার সঞ্জীবন, জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার অমোঘ পাথেয়।

বাৎসল্য রস ও বিভূতিভূষণ

অমল কুমার ঘোষ

প্রথমেই প্রশ্ন জাগতে পারে অলঙ্কার শাস্ত্রে বাৎসল্য রস বলে কোনো রসের উল্লেখ আছে কি না! বাৎসল্য রসের পরিচয় প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা না দিলেও তার পরিচয় ছিল না এমন নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "তদেৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ" (১. ৪. ৮.) ইত্যাদি শ্লোকে পুত্র যে প্রিয় তার উল্লেখ পাচ্ছি। রামায়ণকার যখন পুত্রবিয়োগে কাতর অন্ধমুনির ব্যথা বর্ণনা করেন, কিংবা রামের জন্য দশরথের যে বিলাপের কথা ব্যক্ত করেন তার স্থায়ী ভাব কি? আবার ব্যাসদেব যখন দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রস্নেহের কথা বর্ণনা করেন, কিংবা ভাগবৎ [১] ও বিভিন্ন পুরাণাদিতে কৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার যে 'মমকারঃ' (অর্থাৎ 'আমার আমার') ভাব ব্যক্ত হয়েছে, অথবা শকুন্তলার প্রতি মাতা মেনকার যে অপরিসীম মমতা বর্ণিত হয়েছে তার স্থায়ীভাবই বা কি রসই বা কি?

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষ করে ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' বাৎসল্য রসের কথা বলা হয়নি। আর চতুর্দশ শতাব্দীতে 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থপ্রণেতা কবিরাজ বিশ্বনাথ 'অথ মুনীন্দ্র সম্মতো বৎসলঃ' ইত্যাদি বলে বাৎসল্যকে দশম রস বলেছেন। তাঁর মতে বৎসলতারূপ যে স্নেহ তা তার স্থায়ীভাব, আর পুত্রাদি তার অবলম্বন। কিন্তু "নাট্যশাস্ত্রে"র মূলে "করুণ বীভৎস ভয়ানকেষু অদ্ভুতাত্ত..." ইত্যাদি অংশে 'বীভৎস'-র স্থানে বিশ্বনাথ 'বাৎসল্য' পাঠ ধরেছেন। যাই হোক, একাদশ শতাব্দীতে রচিত ভোজদেবের 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' গ্রন্থে 'বৎসল' রসের উল্লেখ আছে। তবে এটি বাৎসল্য রস না প্রেয়োরস তা স্পষ্টীকৃত নয়।

১, তু.—তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ নিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ॥ ১.১১.৩০

এখানে স্নেহবশতঃ স্তন্য ধারাক্ষরণ, হর্ষবিহ্বল চিত্তে অশ্রুজলে কৃষ্ণকে পরিষেকিত করার যে বর্ণনা পাচ্ছি তাতে মাতা যশোদার অপূর্ব বাৎসল্য ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

অভিনব ভারতী 'নাট্যশাস্ত্রে'-র ভাষ্যে বলেছেন, "স্নেহো হি অভিষঙ্গঃ" অর্থাৎ স্নেহ হ'ল আসক্তি, "তাহা সকলই রতি বা উৎসাহ প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়। এইরূপে বালকের মাতাপিতা প্রভৃতির প্রতি যে স্নেহ তাহা ভয়ের অন্তর্ভূত; যুবক যুবতীর মিত্রজনে স্নেহ রতির নামান্তর...বৃদ্ধের পুত্রাদির প্রতি স্নেহও এইরূপ বুঝিতে হইবে।"[২] অভিনব ভারতীয় ব্যাখ্যা থেকে বাৎসল্যরসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুর বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" প্রণেতা রূপগোস্বামীকে অনুসরণ করে বাৎসল্য রসকে স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর "অলঙ্কার কৌস্তভ" গ্রন্থে বাৎসল্য রসের স্থায়ী ভাবকে নির্দেশ করেছেন "মমকার" অর্থাৎ আমার আমার।

মানুষের মনে প্রীতিই স্থায়ীভাব। সংস্কৃতে প্রীতি বলতে হর্ষ, আনন্দ, স্নেহ, তৃপ্তি ইত্যাদি[৩] নির্দেশ করলেও বাংলায় এর অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা। বাৎসল্যের স্থায়ী ভাবকে কেউ বলেছেন স্নেহ, কেউ বা বলেছেন. 'মমকার', আবার কেউ বা বলেছেন, দয়া বা করুণা। পরবর্ত্তীকালে আলঙ্কারিকগণ যে ষড়বিধ প্রীতির কথা বলেছেন, তার মধ্যে কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের যে প্রীতি তাকেই বলেছেন, মমতা বা বাৎসল্য রতি।

'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'তে বৎসল [ভক্তি] রস বলতে বাৎসল্য নামক স্থায়ীভাব অর্থাৎ অনুগ্রহময়ী রতি নামক স্থায়ীভাব বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টিলাভকে বুঝিয়েছেন।[৪] বৈষ্ণবরস শাস্ত্রেই বাৎসল্যরস অর্থাৎ বাৎসল্য ভক্তিরস সুপ্রতিষ্ঠিত। বাৎসল্যরসের প্রকাশ হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলী অতুলনীয়। ধর্ম ও ভক্তিতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রেখে, বৈষ্ণব কবিতা একটি সহজ ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা সাধারণের হৃদয়ে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। অধ্যাত্মজীবনের কাব্যায়নে এই পদগুলিতে মানবীয় আশা আকাঙ্খার কথাই যেন ব্যক্ত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীতে মমতাময়ী মা ও মেয়েকে নিয়েই বাৎসল্য রসের প্রকাশ হয়েছে। আগমনী ও বিজয়ার গানে যে পিতার ভালোবাসা, মায়ের স্নেহ অঙ্কিত হয়েছে তা যেন বাঙালী জীবনের আলেখ্য। বাংলার লোক জীবনের বিচিত্র উপাদানে সৃষ্ট এই বাৎসল্যে আছে "মায়ের মমতাধিক্য, চিন্তাধিক্য, মেয়ের ভালোবাসা, আবদার অভিমান উভয়ের ভয়, শঙ্কা, বিষাদ।" স্থায়ীভাব 'স্নেহ'কে নিয়ে জমে ওঠা বাৎসল্য রসের মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ বাংলার গৃহজীবনের যে ছবি তুলে ধরেছেন—তার গভীরতা ও ভাব সৌন্দর্য্যের যেন তুলনা নেই।

শিশু ও কিশোরদের প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ এক সময়ে লিখেছিলেন[৫] "এখানে

২. ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্তের 'কাব্যালোক' গ্রন্থ (১ম খণ্ড—১৩৬৫) থেকে উদ্ধৃত। দ্র-পৃ. ১৪৭।

৩. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস. বাংলাভাষার অভিধান (২), পৃ. ১৪৩৭।

৪. বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যংস্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। —৩.৪.১.

৫. আমার সাহিত্য জীবন, দ্র. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবল—১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫

এসে আমার অন্তর বাহিরের সবন্ধন্ধ গেছে ঘুচে। তার কারণ, এখানে আমার নিজের মনের গহনে প্রবেশ করা নয়, তাদের মনের যে মুক্ত আনন্দলোক সেইখানে গিয়ে দাঁড়ানো।...অন্ত পাইনা এদের আনন্দলোকের।"

সার্বজনীন 'মেজকাকা'[৬] বিভূতিভূষণের সমস্ত রচনাই বিচিত্ররসে রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা প্রেয়োরস[৭] নামে একটি রসের সন্ধান দিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ যেন সেই প্রেয়োরসের প্রজাপতি।[৮] তাঁর সমগ্র সত্তা রসময়।

কথাকোবিদ বিভূতিভূষণ বাঙ্গালীগৃহজীবনের যে কান্নাহাসি, মেঘ-রৌদ্রের যে বিচিত্র ছবি এঁকেছেন তার মূলে আছে যৌথ পরিবারের দেখা বিচিত্র মানুষের চরিত্র। গার্হস্থ্যজীবন রসে পরিপ্লুত বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস পড়ে অবাক হতে হয়, ভাবতে আশ্চর্য লাগে অকৃতদার এই মানুষটি গৃহজীবনের স্নিগ্ধ রূপটি ফোটালেন কি করে? পরিবার-জীবনের প্রায় সব উপাদানই তাঁর কথা-কাহিনীতে লভ্য। বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিস্তৃত আলেখ্য আঁকবার অভিজ্ঞতা তিনি পেলেন কোথা থেকে? "আমার সাহিত্য জীবনে" বিভূতিভূষণ নিজেই লিখেছেন, জীবনে "অনেকবার ভালোবেসেছেন," কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তা পরিপূর্ণতা পায়নি। তাই প্রশ্ন জাগে যে, না পাওয়ার বেদনাই কি তাঁর মনের গঠনকে বিষণ্ণময়[৯] করে তুলেছিল? জীবনের অনেক ঘূর্ণিপাকে ক্লান্ত[১০] বিভূতিভূষণকে বাইরে থেকে চেনা যায় না। হয়তো এর থেকেই তার মধ্যেই জন্ম নিয়েছে দার্শনিকসুলভ নিঃস্বার্থ নির্লিপ্ত মনোভাব। একান্নবর্ত্তী পরিবারের নানা ঘটনাকেও তিনি এই দৃষ্টিতে দেখেছেন। একটা অনাসক্ত প্রসন্ন স্মিত কৌতুকের আবরণে নিজেকে দূরে রেখে পরিবার কেন্দ্রিক রসের ভিয়ান চড়িয়ে কত আশ্চর্য রকম রসেরই না তিনি সৃষ্টি করেছেন। যে ষড়বিধ চিত্তবৃত্তি নিয়ে প্রেয়োরসের সৃষ্টি—তার মূলে আছে প্রীতি। লৌকিক

৬. অনামকুমার মুখোপাধ্যায়, আমাদের মেজকাকা, দ্র. 'শাশ্বতবাণী' (পৌষ, ১৩৮৮), পৃ. ১।

৭. দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' প্রেয়ঃকে রস হিসাবে গণনা না করে অলঙ্কার হিসাবে গণনা করেছেন (২।২৭৫)। রুদ্রটই প্রথম প্রেয়ঃকে রসহিসাবে গ্রহণ করে স্নেহ'কে এর স্থায়ীভাব নির্দেশ করেছেন (কাব্যালঙ্কার ১৫।১৭)। রূপগোস্বামী প্রেয়োরসের সাহায্যে সখ্যরস নির্দেশ করেছেন—'স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ। নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রস প্রেয়ানুদীর্যতে।' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৩।৩।১) জীব গোস্বামী একে মৈত্রীময় রস বলেছেন। দ্র. রাধাগোবিন্দ নাথ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন (৫ খণ্ড), পৃ. ৩৩০৯। মোটামুটি ভাবে প্রীতিরতি, বাৎসল্য, ভক্তি, সখ্য, দেশপ্রীতি—এই ষড়বিধ চিত্তবৃত্তি নিয়েই প্রেয়োরসের সৃষ্টি।

৮. অগ্নিপুরাণে কবিকেই একমাত্র প্রজাপতি বলা হয়েছে। দ্র. ৩৪৫।১০।

৯. 'বিষণ্ণতাই আমার মনের গঠনের যেন মূল উপাদান'—দ্র. আমার সাহিত্য জীবন।

১০. দ্র. আমার সাহিত্য জীবন।

প্রীতিই বিভাবাদিরূপে যে-সব রসের সৃষ্টি করে থাকে তার মধ্যে বাৎসল্য, মিলন বাৎসল্য ও বাৎসল্য বিরহ অন্যতম। অলৌকিক কারুণ্যে, স্নেহে, মমতায় পরিপূর্ণ এই রস বিভূতিভূষণের রচনায় বাৎসল্য ভাবকে চমৎকার রূপে ফুটিয়ে তুলেছে।

বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়' (১৯৪২)—প্রেমের উপন্যাস। এই উপন্যাসে অপর্ণাদেবীর অপরিতৃপ্ত এবং ব্যর্থ পুত্রস্নেহের ছবিটি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। সর্বংসহা এই নারীর কোন সান্ত্বনা নেই। সংসারের প্রতি আসক্তিহীন অপর্ণাদেবীর মনোবিকার যেন পুত্র সম্পর্কে আশাভঙ্গের ছবিটিকেই ভয়াল করে তুলেছে। অমানিশার গভীর অন্ধকারের মধ্যে পুত্রের বাগ্‌দত্তা, "নৈরাশ্যের পঞ্চতপা" সরমার প্রতি অপর্ণাদেবীর অদ্ভুত মমত্ববোধ তাঁর বাৎসল্য ভাবকে আরও অশ্রুসজল করে তুলেছে। সন্দেহ নেই, লৌকিকজগতে এই শোক দুঃখদায়ক, কিন্তু কাব্যজগতে সবই সৌন্দর্যময়।[১১] অপর্ণাদেবীর জীবনের অসীম রহস্য বিভূতিভূষণ এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যা দেখে আমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি। 'অযোগে উৎকণ্ঠিত বাৎসল্যে'র বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি বৃদ্ধা ভুটানীকে অপর্ণাদেবীর বেদনাতুর অবোধ সান্ত্বনা দেওয়ার মধ্যে—"উঠো বেটা মিলেগা—বুড়ী মাঈ, উঠো..." (৭ম পরিচ্ছেদ)। প্রবাসী পুত্র নীতিশকে কেন্দ্র করে ট্র্যাজিডির বেদনা অপর্ণাদেবীকে শোকাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই স্বল্পভাষী মা পুত্র-বিরহে উদ্‌ঘূর্ণিয় আক্রান্ত হয়ে বিবশদেহা হয়ে অচৈতন্য হয়েছে। তার বাৎসল্যরতির অন্য একটি ছবিও আমাদের অন্তর স্পর্শ করে—"মিসিস রায়ের একটা হাত মায়ার বেণীর উপর, মুখে মৃদু হাস্যের সঙ্গে খানিকটা কৌতুকের ভাব মিশিয়া গিয়া অনির্বচনীয় একটা মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, নিজের মাতৃত্বরসে যেন বিলীন হইয়া গিয়াছেন" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। ব্যর্থ বাৎসল্যের এমন রিক্ত করুণ অশ্রুসজল ও গম্ভীরচিত্র বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে।

বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করতেন, "নারী জীবনের পূর্ণ সার্থকতা মাতৃত্বে"[১২]। মায়ের মনের এই অপরূপ ছবি নানা বৈচিত্র্য সম্ভারে তিনি তুলে ধরেছেন, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' উপন্যাসে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে বাৎসল্য একমাত্র নারীতেই সীমাবদ্ধ নয়। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' উপন্যাসের প্রথম পর্যায়টি তো রসিকলালের পিতৃহৃদয় আর তাঁর কন্যা গিরিবালার নিবিড় প্রীতি-স্নেহ-মমতায় ভরা ছবি। পিতাপুত্রীর মান-অভিমান ও পরস্পরের ভালোবাসার মাধ্যমে কত বৈচিত্র্যই না

১১। শেলী যথার্থই বলেছেন, "Poetry turns all things to loveliness."—A Defence of Poetry.

১২। ভূমিকা, স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম)।

বিভূতিভূষণ সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসের প্রারম্ভেই অষ্টম বর্ষীয়া গিরিবালার পুতুলকে নিয়ে কাল্পনিক খেলাঘরে—ও নকল মায়ের ভূমিকায় বাৎসল্যের স্নিগ্ধচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে—"গিরিবালা পুতুলটিকে বুকে চেপে...নানান্ রকম আলাপ অনুযোগ—অবাধ্য ছেলে কথা শোনে না, শুধু দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ানো। রোদ নাই, বৃষ্টি নাই—মুখখানা যে একেবারে সিঁদুরবর্ণ হইয়া গেছে! হুঁশ আছে সেদিকে ছেলের? মা একলা মানুষ কত দিকে যে দেখবে।"...রসিকলালের স্ত্রী বরদাসুন্দরীও পিতাপুত্রীর মান-অভিমান—পিতার শঙ্কা দেখে হেসে ফেলে যখন বলে—'মরিঃ, ঢুকলেন দেখ না মায়ে-পোয়ে—কচি ছেলেও অমন করে মায়ের আড়াল খোঁজে না।"—তখন পাঠকের মনেও বাৎসল্য রসের আনন্দ বিস্তার করে: বরদাসুন্দরীর স্মিত হাসি, গিরিবালার মধুর বাক্য এখানে বাৎসল্য রসের উদ্দীপন। রসিকলালের সর্বব্যাপী কারুণ্যের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে গিরিবালা যে সকল অব্যক্ত, ব্যক্ত এবং মধুর ভাব ব্যক্ত করেছে, তাই দেখে পিসিমাই যথার্থ বলেছে—'মেয়ের বাপের দিকে টান হ'লে ছেলেপুলের ওপর বাচ্ছিল্যি হয় বেশি। মেয়েমানুষের পক্ষে বাপ আর ছেলে দুই একই কিনা—শুধু বয়সের যা তফাৎ।'

মায়ের মনের আরেক অপরূপ বাৎসল্যের ছবি ফুটে উঠেছে বিধবা কাত্যায়নী—যে মা হতে পারেনি,—তার কথায়. "হ্যালো গিরি, আমি মরে যদি তোর পেটে জন্মাই তো এমনি করে আমায় আদর যত্ন করবি তো? পিসিমার কাছ থেকে তোকে যেমন করে কেড়ে নিয়ে এলাম, এমনি করে সবার কাছ থেকে কেড়ে-কুড়ে—নিজের বুকে চেপে রাখবি? নিজের হাতে খাওয়াবি গল্প বলতে বলতে? যখন খুব ছোট—কোলেরটি, তখন টিপ কাজল পরিয়ে দোলনায় শুইয়ে দোল দিবি? ধুলো লাগলে ঝেড়ে দিবি? রোদে তেতে যখন ঘেমে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব আঁচলে ঘাম মুছিয়ে......"। অন্তরের দরদঢালা এসব কথা শুনে গিরিবালা ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। কাত্যায়নীও গিরিবালাকে বুকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে কেঁদে উঠেছে। অসম মাতৃত্বের এই দুই নীরব অশ্রুর বাৎসল্যধারায় রসিক পাঠক যে সুখানুভব করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। কাত্যায়নী নিজের বুকের যে অমৃত দিতে পারেনি পরের বুকে সেই অমৃতস্বাদ পাওয়ার অবুঝ আকাঙ্ক্ষার ছবি অশ্রু-বেদনায় অপরূপ হয়ে উঠেছে—(গিরিবালার বিয়ের পর —পতিগৃহে যাবার সময়) "গিরি, তোকে ভালবেসে আমি কলঙ্ক নিলাম। তুই মা আমায় কিন্তু কখনও ভুল বুঝিসনি—বিশ্বাস করিস, যা ভুল করতে যাচ্ছিলাম তা ভালোবাসারই ভুল।"

এই সুবৃহৎ উপন্যাসের দ্বিতীয়খণ্ডের তৃতীয় পর্যায়ে—গিরিবালার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে পিত্রালয়ে আসা যেন, নগেন্দ্রনন্দিনীর কৈলাস ছেড়ে হিমালয়ের ঘরে আসা। আর এক পটভূমি হিসাবে শাক্ত পদাবলীর যে আগমনী গানের

আবাহন করা হয়েছে তা অনুপম। গিরিবালা তো উমাই। গানের 'ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী' ..ইত্যাদি কথা আর মা বসন্তকুমারীর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলা—"মনে পড়লো মেয়ের।"—ব্যঞ্জনা তো একই। বাৎসল্যের এই বর্ণনায় যে ভাবটি ফুটে উঠেছে তা বৈষ্ণবীয় 'বৎসল-সাত্ত্বিক' ভাবের। ব্যাকুলা গোকুলেশ্বরী যশোদার মতই বসন্তকুমারীর চোখদুটি অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায়—যেন আর কিছু বলতে পারছেন না। বসন্তকুমারীর অশ্রু এবং স্বরভেদে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাকে বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে বলা চলে "স্তম্ভাদি"।

গিরিবালার শিশুপুত্র—যার বয়স 'প্রথম কৌমার',[১৩] তাকে নিয়ে গিরিবালার মনে যে এক নূতন ধরণের অনুভূতি, একটা হারাই হারাই ভাব, অকারণে চিন্তা শঙ্কা, একটা অব্যক্ত বেদনা—তা যেন যশোদার পুত্রবাৎসল্যের ন্যায়—"কুণ্ঠার বশে পারিতেছেন না ; তবুও এক একবার মনে হইতেছে দেখিয়া আসি খোকাটাকে।...আতঙ্কে, অনুকম্পায়, বেদনায়, বুক নিঙড়ান স্নেহে..."।[১৪]

পরিণত বয়সের গিরিবালা দুই সন্তানকে দূরে পাঠিয়ে কি বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন। বিচ্ছেদের ব্যথা মায়ের বুকেই বাজে বেশি। "খোকা সব হমরা ভুল গেলেই গ খঞ্জনী—" গিরিবালা এই কথা কয়টির মধ্যে দিয়ে বাড়ীর দাসী খঞ্জনীকে সান্ত্বনা দেয়নি, নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিয়েছে।

"ইচ্ছা-বন্ধ্যা" খঞ্জনীর চরিত্রটিও বাৎসল্যের সামান্য মাত্র আঁচড়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। খঞ্জনার কাছে গিরিবালার ছেলে শৈলেন পেয়েছে "নব পরিত্যক্ত স্বর্গের স্বাদ"। যে শৈলেনকে নিয়ে সে অত্যধিক রূপে আনন্দ পেত তাকে যেদিন ছাড়তে হয়, সেদিন খঞ্জনীর বিলাপে পাঠকও স্তম্ভিত হয়ে যায়—"অব হামি কিনু বাস্থার মাথায় কখনত ভুলব না গো হুলহিন—বড্ড বেইমান—বড্ড বেইমান"।

মাতৃস্নেহের অমৃতধারায় মানবজীবন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। অমৃতের আস্বাদ-দাত্রী এই মাতৃস্নেহের আর এক অভিনবরূপ দেখতে পাই 'নবসন্ন্যাসে' (১৩৫৫)।

বিভূতিভূষণের 'মাতৃ' রূপটি এই উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে সীমায়িত নয়। এখানে জননী আর জন্মভূমি দুইই পুণ্যময়ী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে মাতৃহীন শিশু হীরকের উপর মোহিনীনারী চম্পার স্নিগ্ধ বাৎসল্য রসের ফল্গুধারা কিভাবে প্রবাহিত হয়েছে, ভ্রষ্টা চম্পা কিভাবে মহিমময়ী নারীসত্তায় বিকশিত হয়ে উঠেছে—তারই অপূর্ব আলেখ্য আঁকা হয়েছে। দেহাতীত সম্বন্ধের সূত্রে বাঁধা চম্পা-হীরক-টুনু যথাক্রমে মাতা-পুত্র পিতা। এই বিস্ময়কর হৃদয়রহস্য উন্মীলনের ছবিটি লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা অপরূপ—"খোকা হীরকের

১৩। 'প্রথম কৌমারে মধ্যভাগ এবং উরু স্থূল হয়, অপাঙ্গ (নয়নের অন্তঃভাগ) শ্বেতবর্ণ হয়, অল্প অল্প দন্তোদ্গম হয় এবং মৃদুতা বিশেষ রূপে ব্যক্ত হয়।'
—দ্র. রাধাগোবিন্দনাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (৪র্থ) পৃ. ৩৩৩২।

১৪। দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পর্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্ত মনটা হঠাৎ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, চম্পা হন হন করিয়া বস্তির পানে চলিল। অনুভব করিল কিসে যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—মায়ের বুক দুধে কি এইরকম তোলপাড় করিয়া উঠে?" এ যেন জননীরূপের মধ্যে চম্পার নবজন্মের সূচনা। তারপর চম্পার যে আত্মপ্রকাশ তা অপূর্ব বাৎসল্যে, অনুরাগে, সৌন্দর্যে ও প্রেমের সুরভিতে অনবদ্য হয়ে উঠেছে—"এই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে হীরককে যেন আবার নূতন করিয়া পাইয়াছে চম্পা, ক্রমাগতই চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল, বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া। সন্তানের মতোই ও যেন টুলু আর চম্পার মধ্যে একটা সেতু—এই অনুভূতিটাই অতিনিবিড় একটা মমতার আকারে হীরকের উপর যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। না কোন সম্বন্ধ থাক, টুলুর স্পর্শ পর্যন্ত নাই থাক্ হীরকের গায়ে, তবু ঐ যে টুলু তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল ঐটুকুতে তাহার মনের স্পর্শ যেন পাওয়া যায় সদ্যজাত শিশুটির মধ্যে। ঠিক তাহারই মতোই একটি স্নেহের ধারা, একটি সন্তানের মায়াই তো টুলুর বুক থেকে উৎসারিত হইয়া হীরককে অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল? চম্পা নিজের স্নেহ দিয়া সেটিকে অনুভব করিতে লাগিল;—মাঝখানে হীরা তাহার ওদিকে আছে টুনু, এদিকে চম্পা নিজে।" এই অপূর্ব অনুভূতির মধ্যে নারীর জায়া ও জননী সত্তার যে হৃদয়রহস্য উন্মোচিত হয়েছে তা লেখকের অসাধারণ সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। যেভাবে দুদিক থেকে দুটি স্নেহের ধারা এসে মিশেছে আমরা এমন স্নেহের 'অন্ত' পাই না। মমতাধিক্য ও মধুর রসের স্পর্শে—প্রীতি ও অনুরাগের আরতিতে এই চিত্রটি সমুজ্জ্বল। বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসের এমন সমন্বয় খুব কমই দেখা যায়। বাৎসল্য রস এখানে স্থায়ী রস নয় বটে, তবে তা শৃঙ্গার রসকে পুষ্টি দিয়েছে। আর মাঝে মাঝে মোহিনী চম্পার ক্রোধ, ঈর্ষা, বিষাদ—ইত্যাদি ব্যভিচারীর বর্ণচ্ছটায় সমস্ত কাহিনীটি পরমোৎকর্ষ লাভ করেছে।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলিতে বাৎসল্যের যে-সব রসমূর্তি আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে সন্তানবতী নারীর বাৎসল্য, 'ইচ্ছাবন্ধ্যা' নারীর বাৎসল্য, নিঃসন্তান বিধবার বাৎসল্য এবং দেহাতীত সম্পর্কযুক্ত নারীর বাৎসল্যই প্রধান। এইসব নারীদের বিচিত্র রূপের মধ্যে লেখক একথা কখনই বিস্মৃত হতে দেননি যে, এরা সকলেই জননী—এবং নারীমাত্রেরই পূর্ণ সার্থকতা মাতৃত্বে। নারীর এই রসমাধুর্যের কথাই মধুস্বাদী ভাষায় বিভূতিভূষণ ব্যক্ত করেছেন।

বহু ছোটগল্পের রচয়িতা বিভূতিভূষণ। এইসব গল্পমালার অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে সুমধুর গার্হস্থ্য জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র। এইসব গল্পমালায় যে স্নিগ্ধ হাস্যরসের পরিচয় পাই তাতে মনে হতে পারে যে, তাঁর রচনার মূল রস হল হাস্যরস। ধারণাটি সম্পর্কে বিতর্ক হলেও আমাদের মনে হয়, তাঁর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্পগুলিতে হাস্যরস মূল রস নয়, মুখ্য সঞ্চারী মাত্র—

মূল রস বাৎসল্য। চলমান জীবনের নির্লিপ্ত দ্রষ্টা বিভূতিভূষণ। সংসারের হাসিকান্না, সুখদুঃখকে তিনি নির্লিপ্তদৃষ্টি নিয়েই পর্যবেক্ষণ করেছেন। মনের বিশাল উদারতা ও ব্যাপ্তি নিয়ে সমস্ত শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীকে তিনি প্রীতি ও করুণা নিয়ে চিত্রিত করেছেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে অবহেলার বিষয় নয়। শিশুর মনোজগতে প্রবেশ করে—তাদের মান-অভিমানের স্নেহ-প্রীতির এমন সুবিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, গভীর বাৎসল্যবোধ না থাকলে তা সম্ভব হত না। এইসব গল্পমালায় বিভূতিভূষণের আত্মলীলারও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। আত্মকাহিনীতে তিনি লিখেছেন, শিশুদের মুক্ত আনন্দলোকে, "একবার গিয়ে পড়তে পারলে শুধুই আনন্দ আর আনন্দ। ...এদের অত্যাচার অত্যাচার নয়, মিথ্যা মিথ্যা নয়, প্রবঞ্চনা প্রবঞ্চনা নয়। রাণু প্রথমভাগ লুকোয়, কিন্তু তার কাকার আইনের বই পড়ে সে-দোষ স্খালন ক'রে নেয়। মেজকা'র হাতে শাসন, তাতে গৃহিণীত্ব যেটুকু খর্ব হয়, মেজকার পিতাকে শাসন ক'রে পুষিয়ে নেয়—"তোমায় অত ক'রে শেখাই, তবু একটুও মনে থাকেনা দাদু, কী যেন হচ্ছ দিন দিন।"

বাৎসল্যে আর হাস্যরসে ভরা অপরূপ কল্পলোকের ছবি ফুটে উঠেছে, 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পসংগ্রহে (এবং অন্যত্রও)। 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পটি সোনার জলে বাঁধিয়ে রাখার মত অবিস্মরণীয় বাৎসল্যের কাহিনী। এই বাল্যলীলার নায়িকা ভ্রাতুষ্পুত্রী রাণু, নায়ক মেজ'কা। অশ্রুজল ও অপত্যস্নেহরসে সিক্ত এই কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, ভাইঝি রাণু প্রথম ভাগের গণ্ডি পার হতে পারছে না। তার অকালপক্ব গিন্নিপনা, মধুর বাক্ চতুরতা, কাকা-ভাইঝি-র মিথ্যা ছলনা, অভিমান সবই প্রাণস্পর্শী আনন্দময় জীবন্ত চিত্র। গৌরীদানের পর রাণু যখন মেজকা'র কাছে বিদায় নিতে এসেছে, আর মেজকা যখন বলেছে, "রাণু, তোর এই কোলের ছেলেটাকে কার কাছে—?" তখন রাণু উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলে যে কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ও নূতন পাওয়ার মাধুর্য সবই যেন অপরূপ হয়ে উঠেছে। কাহিনীর পরিশেষে বেনারসীর চেলির মধ্যে লুকিয়ে রাখা দশ-বারোখানি প্রথম ভাগের বাণ্ডিল বের করে অশ্রুসিক্ত মুখে রাণুর যে স্বীকারোক্তি "পেরথোম ভাগগুলি হারাইনি মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।"[১৫]—তা বড়ই করুণ-মধুর। রাণুর গিন্নিপনা-মানঅভিমান—মেজকার শাসন—স্নেহের কাছে কাকার পরাজয় বরণ নিয়ে কাহিনীর আরম্ভ—। এসবই মমতা ও কারুণ্য ভাবকে গভীর করে স্থায়ীরস বাৎসল্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। যাত্রাকালীন বিদায়ের অশ্রুসিক্ত রাণুর কথাগুলি করুণ,—আবার দীপ্তশ্রী কিশোর বরের পাশে মালাচন্দনে চর্চিত রাণুর অন্তরালে শৃঙ্গার রসের ক্ষীণতম আভা (মূলরস বাৎসল্য) ছড়িয়ে পড়ে সেই করুণতাকে আরও মধুর

১৫। 'আমার সাহিত্য জীবন'।

করেছে। স্মিতহাস্ত বাৎসল্য রসকে এখানে অমুজ্জ্বল না করে পরিপুষ্ট করেছে। কাহিনীটি শাক্তপদাবলীর 'বিজয়া'র গানের সঙ্গেই তুল্য—এ যেন এই শতকের বিজয়ার গান, বাৎসল্য বিরহের গান।

করুণমধুর সুরে রচিত 'গিন্নীমা' গল্পে ষোল-সতেরো বছরের গিন্নীমার সঙ্গে সতেরো-আঠার বছর বয়সের পুত্র ও পুত্রবধূর যে স্নিগ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে কথা আছে তার মূল রস বাৎসল্য নয়, করুণ। বাৎসল্য এখানে সঞ্চারীর কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য স্মর্তব্য: "আমার মনটা ছলছল করছে, হাসিতে কি অশ্রুতে তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। জীবনে এমন মিষ্টি কিছু একটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না; কিন্তু অপরিসীম ট্র্যাজিডিও তো লুকনো আছে এর একটা জায়গায়।"

শিশুর প্রথম দন্তোদ্গম নিয়ে লেখা 'দাঁতের আলো' গল্পে লেখক যে 'কাল্পনিক ভ্রান্তির জগৎ' গড়েছেন, তা মধুরতায় ভরা। ভাইঝি 'মৈয়া'-র সঙ্গে লেখকের মা-ছেলের সম্বন্ধ। রাণুর সঙ্গে 'মৈয়া'র সম্প্রতি তিনটি দাঁত ওঠা নিয়ে যে কাল্পনিক মান-অভিমানের জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তা অপূর্ব। আর মেজকার কাছে কন্যা 'মৈয়া'কে নিয়ে রাণুর যে গর্ব তা যেন বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি। "আদ্য কৌমার" অবস্থা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে খুব কম গল্পই চোখে পড়ে। শিশুর দাঁত ওঠা, তার কোমল হাসি গল্পে বাৎসল্যের উদ্দীপনের কাজ করেছে। শিশুর নানা কীর্তিকলাপ দেখে দেখেও রাণুর পিপাসা তৃপ্তিলাভ করছে না। বাৎসল্যের এই মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে লেখক লিখেছেন, "শেফালি-স্তবকের মত রাঙায় সাদায় আলো-করা দুইটি কচি মুখের হাসি আমায় প্রবল আকর্ষণ করিতেছে।"

সর্বজনীন 'মেজকা'র বেশ কিছু আদরের আত্মজসম পুত্রকন্যা আছে। তুলনামূলকভাবে আদরিণী কন্যার সংখ্যাই যেন বেশি। এইসব কন্যাদের নিয়ে বিভূতিভূষণ যে নূতন 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গান শুনিয়েছেন—তা আর শোনা যাবে না।

আত্মজসম পুত্রের "কৌমারাদি" বয়স, রূপ, বেশ, শৈশবচাপল্য, মধুরবাক্য, মন্দহাসি এবং ক্রীড়াদির মাধ্যমে বিভূতিভূষণ 'ননীচোরা' গল্পে যে ভক্তি-বৎসলরসের উদ্দীপন[১৩] দেখিয়েছেন, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। এই গল্পে লেখক শিশুর বাৎসল্যলীলা নিয়ে যেভাবে কথকতা করেছেন, তাতে গল্পরসের মধুস্বাদে আমাদের মন ভরে যায়। গৃহদেবতা শিশুগোপাল—যিনি যশোদার নয়নের মণি, তাকে এখানে "স্নেহের ভিখারী" রূপে আঁকা হয়েছে। "প্রতি দিনের, প্রতিক্ষণের, সংসারের হাসি-অশ্রু দিয়ে

১৩। দ্র. ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—৩।৪।১১

গড়া" সেই বালগোপাল যে সুদূরের নয়, ঠাকুরমার চিন্তার মধ্যে তা যেন বাসা বাঁধে। তাঁর মনে হয়, "খোকার মুখে কি তাহারই ছায়া পড়িয়াছে? ধুলি-পাটল পেলব অঙ্গে কি তাহারই বর্ণাভাস? কচিপায়ের চঞ্চলতায় কি তাহারই নৃত্যবিলাস?" খোকার মা যখন দেখে, উল্লসিত আবেগে শুক্‌নো আমের ডাল নিয়ে খোকা ঘরের বাছুরটাকে ছুঁতে চেষ্টা করে, হেসে লুটিয়ে পড়ে, আবার ছোটে—তখন কিছুতেই যেন তার তৃপ্তি হয় না, "কপাল, বক্ষ আর কাঁধের ধূলা ঘামের সঙ্গে কাদা হইয়া কণায় কণায় জমিয়া উঠিয়াছে, হাসির চোটে মুখে লালা উঠিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে,...মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলার দুর্দশার আর পরিসীমা নাই"—। অঙ্গনে এরূপভাবে বিচরণকারী পুত্রকে দেখে যশোদা যেরূপ আনন্দিত হয়েছিলেন, খোকার মাও তদ্রূপ তৃপ্তিলাভ করে। এই বালকও কৃষ্ণের মত ননীচোরা।[১৭] দেবভোগ্য ক্ষীরের নৈবেদ্য চুরি করে, কেমন করে 'ননীচোরা' বালকৃষ্ণ হয়ে গেল পাঠক বুঝতেই পারল না। পাঠকের মন একটা অপার্থিব আনন্দে ভক্তি ও বাৎসল্য রসে সিক্ত হয়ে যায়।

ভবভূতিকে সংস্কৃত সাহিত্যে করুণ ও দাম্পত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়ে থাকে। বিভূতিভূষণও বিংশ শতাব্দীর ভগ্ন ও বিলীয়মান যৌথ পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকার। যৌথ পরিবারে দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিশুর শৈশবলীলার কাহিনী। সহজ সরল অনাড়ম্বর ও নিস্তরঙ্গ পারিবারিক জীবনের আনন্দবেদনার অনুভূতি, বাঙ্গালীর হৃদয়বীণার তারে ঝঙ্কৃত বাৎসল্য প্রেমের বিরহমিলনের করুণমধুর সুর বিভূতিভূষণ তাঁর প্রায় সব গল্প উপন্যাসে এমন মধুস্বাদী করে পরিবেশন করেছেন যে, পাঠক কোনদিনই তা বিস্মৃত হতে পারবে না। বাৎসল্য প্রেমের এই অনির্বাচ্য আনন্দানুভূতিকে তিনি হাস্যরসের মিশ্রণে এমন স্নিগ্ধ রমণীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন, যে, তার বৈচিত্রী ও রসত্বে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। বাঙ্গালী অন্তঃপুরের পারিবারিক জীবনের কাহিনী রচনায়—বাঙ্গালী মাতৃমূর্তি চিত্রণে—সন্তানের মিলনবিচ্ছেদের কথায়—বিভূতিভূষণ যথার্থই বাৎসল্য রসের রসকার—কথাকোবিদ।

১৭। ঐ —৩।৪।২৩

অদ্বিতীয়, অনন্য বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শুভ্রা গুপ্ত

> যত বড়ো হও,
> তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
> আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
> যাব আমি চলে।

হয়তো এই কথা এমন করে বলতে পারতেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। হয়তো মনে মনে তা তিনি বলতেনও, জীবন দিয়ে তাই তিনি প্রতিপন্ন করে গেছেন। তিনি মৃত্যুকে নিয়ে পরিহাস করেছেন। তাঁর কাছে কর্তব্যই ছিল প্রধান কর্ম ও কর্মজীবনই ছিল তাঁর অভীষ্ট। তাঁর কাছে—

> জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
> চিত্ত ভাবনাহীন।

বেদনার বক্ষ চিরে মৃত্যু আসে অতর্কিতে। কখনও আগমন বার্তা ঘোষণা করে, কখনো বা নীরবে আসে। সেই দুঃখে হৃদয় কেঁপে ওঠে কিন্তু তবুও অভ্যর্থনা করতে হয়। সিংহদ্বার খুলে দিয়ে জাগ্রত চিত্তে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাই করেছেন।

আজীবন কর্মপাগল ও সাহিত্যপ্রেমী মানুষটি কর্ম ও সাহিত্য রচনার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার।

তাঁর রক্তে ছিল আরও কিছু নান্দনিক নেশা, ছিল সঙ্গীতে প্রেম, সাহিত্যে প্রীতি, সার্বিক সংস্কৃতিতে অনুরাগ।

গুরুতর পরিস্থিতিতেও তিনি রসবোধ বিস্মৃত হতেন না। স্বভাবগুণে তিনি সর্বত্র সমাদৃত হতেন।

বিভূতিভূষণকে বিশেষভাবে চল্লিশ দশকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী বলা যায়। তাঁর সাহিত্যকৃতি গোটা জীবন ধরেই বিস্তৃত। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ', 'রাণুর কথামালা' পাঠকের নিকট চিরকাল জনপ্রিয়

হয়ে থাকবে। আবার গণশা, ঘোঁতনা, কে গুপ্তর মত নির্মল চরিত্রগুলিও বাঙালীর নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভূতিভূষণের প্রেমের উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়' পাঠককে অভিভূত করেছিল।

নির্মল কৌতুক বা স্নিগ্ধ প্রেমের কাহিনী রচনার জন্য বিভূতিভূষণ যতটা প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন ঠিক ততটাই তিনি ছিলেন কারুণ্যের লেখক। স্বর্গাদপি গরীয়সী-তে লেখকের এই স্নিগ্ধ করুণা ও মমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৌতুকাশ্রিত গল্পরচনায় তাঁর বিশেষ নিপুণতা ও প্রবণতা ছিল। রাজশেখর বসু বলেছিলেন, "যেমন তেল আর জল তেমনি করুণ ও হাস্যরস সহজে মিশে যায় না। অপটু লেখকের হাতে দুই রসের বিরোধ হয়। যে অল্পসংখ্যক লেখক এই মিশ্রণে কৃতকার্য্য হয়েছেন তাদের শীর্ষদেশে আছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।"

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরসপ্রধান রচনাগুলিতে অকৃত্রিম হাসির আভাস থাকলেও শেষের দিকে কষ্টকল্পনা, উদ্ভট কল্পনাও দেখা যায়।

'রাণুর প্রথম ভাগে' শিশু রাণুর অকালপক্ক গৃহিণীপনার অভিনয়, না পড়বার যে অসংখ্য অজুহাত হাসির খোরাক জুগিয়েছে, তারমধ্যে করুণ রসও বিদ্যমান। মেজকাকার সঙ্গে বিদায়বেলায় প্রথম ভাগ নিয়ে যে কথোপকথন হাসির হালকা হাওয়ায় অশ্রুর আর্দ্রতা মনে তীরের মত বিদ্ধ করেছে।

"রাণু বুকের কাছ হইতে তাহার সুপ্রচুর বস্ত্রের মধ্য হইতে লাল ফিতায় যত্ন করিয়া বাঁধা দশ-বারোখানি প্রথম ভাগের একটা বাণ্ডিল বাহির করিল। অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল 'পেরথোম ভাগগুলো হারাই নি মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।...সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি মেজকা, খু-ব লক্ষ্মী হয়ে পড়ে পড়ে এবার শিখে ফেললে তারপরে তোমায় রোজ রোজ চিঠি লিখব। তুমি কিছু ভেবো না মেজকা।"

"দাঁতের আলো" "স্বয়ম্বরা" প্রভৃতি গল্পে আসল মাতৃত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বের অভিনয় আরও কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শিশুচিত্তের নানা বিস্ময়কর খেয়াল ও কল্পনার বর্ণনা দেখা যায়। তবে আর্টের দিক দিয়ে 'রাণুর প্রথম ভাগে'র সমকক্ষ হয়নি আর কিছু।

'পৃথ্বীরাজ' ও 'কাব্যের মূলতত্ত্ব' গল্পে অতিক্রান্ত-শৈশব কৈশোরের চিন্তা ও উদ্ভট কল্পনায় হাস্যরসের উপাদান রয়েছে। উভয় রচনাতে বিদ্যালয়ের গুরুগম্ভীর আবেষ্টনে শিক্ষাদান পদ্ধতির অসঙ্গতি, ছাত্রের বিকৃত অর্থবোধ প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্ভট হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। "বিয়ের ফুল"-এ দীর্ঘপোষিত আশাভঙ্গ ও "মোটর দুর্ঘটনায় বিবাহ বিপত্তি" গল্পে কৌমার্যপালনের প্রতিজ্ঞাচ্যুতি নির্মল হাস্যরসের নিদর্শন।

'মেঘদূত', 'বিপন্ন', 'বসন্তে' গল্পে নববিবাহিতের প্রণয়াবেশে কাহিনীর মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

'নোংরা', 'হোমিওপ্যাথি', 'অব্যবহিতা, 'মধুলিড়', 'তীর্থফেরত', 'পূর্ণচাঁদের নষ্টামি' প্রভৃতি গল্পে হাস্যকৌতুকের মধ্যে গভীরতার সুর শোনা যায়। গভীর সুরে লেখা গল্পগুলির মধ্যে 'ননীচোরা', 'প্রশ্ন', 'মাতৃপূজা', 'আশা' প্রভৃতি গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু গল্প কেন হাস্যরসাত্মক উপন্যাসের মধ্যে "কাঞ্চনমূল্য" উল্লেখযোগ্য।

'নির্মল হাস্যরস' রচনায় তিনি অদ্বিতীয় সন্দেহ নেই কিন্তু লেখক হিসেবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আরও অনেক বড়।

তিনি একজন অসাধারণ ভাষাশিল্পী। এমন সাহিত্যগুণান্বিত ভাষা তাঁর সমসাময়িক অনেকের ছিল না। হাসির গল্প, রোমান্টিক গল্প অনেক লিখেছেন। কিন্তু যখন 'দুয়ার হতে অদূরে' ধারাবাহিক বার হতে থাকে তখন তাঁর প্রতিভার আর একদিক উদ্ভাসিত হয়। লোমহর্ষক কাহিনী বাদ দিয়েও পৃথিবীতে অনেক গল্প উপন্যাস লেখার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ভ্রমণকাহিনীর পটভূমিকা সর্বদাই অচেনা দূরদেশ বা বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থান হয়। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছেন—

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু এক পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

কিন্তু এই একজন লেখক ঐ ঘাস ও শিশিরবিন্দু নিয়েই অসামান্য গ্রন্থ লিখেছেন। এই একটি রচনার জন্যই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হতে পারতেন। তাঁর 'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি' ঐ জাতীয় আর একখানি রচনা।

তাঁর রচনা কখনও একইরকম বিষয়বস্তুতে থেমে থাকেনি। প্রতিভাবান লেখকরা বার বার নিজেকে বদলান।

প্রেম নিয়ে লেখা 'নীলাঙ্গুরীয়'তে লেখকের বাৎসল্য মধুর রস ফুটে উঠেছে। রাণুর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে আবার 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' উপন্যাসে সেই একই লেখক একজন গভীর দার্শনিক ও যুগের ব্যাখ্যাতা।

রচনার মধ্যে যাঁর এত রসের ফোয়ারা, এত কৌতুকধারা তিনি ব্যক্তিগত জীবনে রাশভারি আত্মমুখিন ছিলেন।

একেবারে শেষ জীবনে তিনি লিখেছেন আত্মজীবনী 'জীবনতীর্থ'। সেখানেও তিনি অতি বিনীত, নিজের পরিবর্তে অন্যদের কথাই বেশি বলেছেন।

বিহার প্রবাসী বেশ কয়েকজন লেখকই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্ভবতঃ তাঁদের মধ্যে শেষ লেখক।

গত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সর্বদাই সমসাময়িক লেখক ছিলেন। নব্বই বছর পার হয়েও তিনি আধুনিক থাকতে পেরেছিলেন।

মর্মবেদনায় বিভূতিভূষণ

শঙ্কর ভট্টাচার্য

কথাশিল্পী, রসস্রষ্টা ও মানবদরদী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক গোপাল হালদার বলেছেন, "বিভূতিভূষণ হাসির মধ্যে মানুষকে চিনতে শিখিয়েছেন। এ হাসি শুধু হাসি নয়। অনেকখানি গভীর মর্মবেদনা থেকে সৃষ্টি করেছেন। যাঁকে নিয়ে হাসির সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিও সমান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। আমরা মানুষকে তুচ্ছ করে না হাসি, সেই শিক্ষাই তিনি দিয়েছেন।"[১] গোপাল হালদারের মন্তব্যে "গভীর মর্মবেদনা" শব্দটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় হাস্যরসস্রষ্টা বলে পরিচিত। একথা স্বীকার করতেই হয় যে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের তুচ্ছ ও অবহেলিত উপকরণগুলির মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ যে মাধুর্য ও অনাবিল হাসির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছেন তা এককথায় অনবদ্য। সহজ সরল উপাদানের অবলম্বনে এমন প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে বিরল। কোথাও তীক্ষ্ণ কশাঘাত নেই, হৃদয়হীন প্রখরতা নেই, আছে শুধু চন্দ্রাতপের স্নিগ্ধ মাধুর্য। বাঙালী পাঠক এবং সমালোচকের কাছে এই পরিচয়টি অজ্ঞাত নয়। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'বরযাত্রী' বা 'দোলগোবিন্দের কড়চা'র বিভূতিভূষণকে কে না জানে? এর ফলে বিভূতিভূষণের সিরিয়াস রচনাগুলি পাঠক সমাজে ও সমালোচক মহলে অনাদৃত থেকে গেছে। এ' প্রসঙ্গে লেখক বিভূতিভূষণের নিজের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মর্তব্য—

"আমার সাহিত্যের সমালোচকেরা দুটো দিক ধরেন। একটা কৌতুক রসের, হাস্যরসের; একটা গভীর রসের। সিরিয়াস রসের সাহিত্য সৃজনে কৌতুকরসটা আমার মধ্যে যে কী করে এসে পড়েছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারিনা। কৌতুকরস দিয়ে আমি আমার সাহিত্য আরম্ভ করিনি। আমি দুঃখ দিয়েই আমার সাহিত্য আরম্ভ করেছি। আমি এটা বিশ্বাস করি,

মানুষকে ভগবান অনুভূতির মধ্যে যে সম্পদ দিয়েছেন, তার মধ্যে হাসিই সবথেকে বড়ো সম্পদ। সেই হিসেবে হাসির একটা মস্ত বড়ো জায়গা রয়েছে মানবজীবনে। মানবজীবন বলছি এই জন্যে যে, এই সুন্দর, কোমল মধুর জিনিষটা ভগবান আমাদের মধ্যে যেরকমভাবে বণ্টন করেছেন, সৃষ্টির অন্য জীবের মধ্যে তা বণ্টন করেছেন কিনা জানিনা। জানিনা যে, ঘোড়া হাসে কিনা; বাঘ হাসে কিনা জানিনা। যদি কখনও আমরা ঘোড়া বা বাঘ হয়ে জন্মাই, সেদিন বুঝব হাসছি কিনা।

আনন্দের যে বহিঃপ্রকাশ সেটা আমি অন্যান্য জীবের মধ্যে খুব কম দেখেছি, অন্তত চক্ষুকে আয়ত করে যে হাসি, সেটা আমি অন্য জীবের মধ্যে দেখিনি। ভগবান যে আমাকে এই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি দিয়েছেন এবং আমি যে কিছুমাত্র আনন্দ পাঠকদের পরিবেশন করতে পেরেছি, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা কথা বলি। আমার বাইরে হাসি আছে। আমার ভেতরে হাসি নেই। আমার হাসি আমার অশ্রুকে চাপা দিয়ে রেখেছে। আমার ভেতরটা অশ্রুতে ভরা।

আমার গল্পে হাসি এসে পড়ে, কিন্তু বোধহয় দু'তিনটে নভেল ছাড়া আমি সম্পূর্ণভাবে হাসির নভেল লিখতে পারিনি। আমার যা কিছু নভেল, সব দুঃখের। সব সমস্যার। সব অন্য অন্য রসের। হাসির জন্য পাঠকেরা আমাকে ক্রেডিট দেন, যশ দেন কিন্তু হাসিটা আমার জীবনের মূল জিনিষ নয়। হাসিটা আমার অপকার করেছে। আমার যা বলবার ছিল, আমার যা অশ্রু, আমার হাসি চাপা দিয়েছে।"[২]

বিভূতিভূষণের ইদানীংকালের (১৯৮০ পরবর্তী) রচনায় দুটি জিনিষ বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমটি হ'ল ভারতবর্ষে জাতিভেদের সমস্যা এবং আরেকটি হ'ল বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জাতির দুরবস্থা। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে, প্রবন্ধে এবং বক্তৃতামালায় উক্ত দুটি বিষয় বারবার আলোচিত হয়েছে। আত্মজীবনী গ্রন্থ "জীবনতীর্থ" (১৯৮০) প্রকাশিত হবার পরেও তিনি দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন। জাতিভেদ সমস্যাজড়িত উপন্যাস "একটি যুগের জন্মকথা" প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮১ সালে এবং বাংলার সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস "সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে" প্রকাশিত হয়েছে পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে। উক্ত দুটি উপন্যাসে বিভূতিভূষণের সমসাময়িক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। উপন্যাসগুলি আলোচনার পূর্বে বিভূতিভূষণের বক্তৃতাগুলির প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'গভীর মর্মবেদনা'র মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ বারবার এই সমস্যাগুলির প্রতি আলোকপাত করেছেন।

উক্ত সম্বর্ধনা সভায় (নবতিতম জন্মবর্ষ পালন, পাটনা) বিভূতিভূষণ বলেছেন—"বহুদিন থেকে জমগমিয়া হয়েছে একটা ব্যাপার আমাকে খুব বেদনা

দিয়েছে।… …আমাদের এই অভিশপ্ত জাতিভেদ ভারতবর্ষের যে কি অপকার করেছে চিন্তা করা যায় না। ইতিহাসের প্রয়োজনে একসময় দরকার ছিল, এখন কি দরকার? পরশুরাম আঠারো বার নিঃক্ষত্রিয় করলেন পৃথিবীকে। দ্বিতীয়বার করবার লোক পেলেন কোথায়? বর্তমান যুগে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে ভাবতে গেলে অবাক্ হতে হয়। বিহারে দেখুন, ক্ষত্রিয়রা চাঁড়ালের গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিলে। এ' অবস্থা থেকে না বেরিয়ে কেন ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা নিলেম? কি অধিকার ছিল?

এরপরে যে শিশু জন্মাবে ডারউইন এর থিওরি অফ ইভল্যুশনের মতে এক মানুষ হয়ে যাবে।……"[৩]। বিভিন্ন বক্তৃতামালা এবং প্রবন্ধ হতে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে কিন্তু স্থানাভাবের কথা স্মরণ রেখে তা' থেকে বঞ্চিত থাকলাম। "একটি যুগের জন্মকথা" উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানে আলোচ্য বিষয়। "একটি যুগের জন্মকথা" নায়ক বীরেশ এবং নায়িকা বিপাশার রোমান্টিক কাহিনী। উভয়ের প্রেম-ভালবাসা বিবাহের কাছে এসে একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্ন চিহ্ন সামাজিক রীতি-নীতির। সামাজিক এই সমস্যার মধ্য দিয়ে কাহিনীর আরম্ভ। রোমান্টিকতা এসে দাঁড়িয়েছে বাস্তবের মুখোমুখি। নায়িকা বিপাশা বাড়ির লোকের অজ্ঞাতে তার মনের মানুষ বীরেশের কাছে এসেছে রেজিষ্ট্রি বিবাহের উদ্দেশ্যে, পূ্র্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিপাশা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই প্রচণ্ড সাহস ও উদ্বেগের কাছে দেখল সামাজিক রীতি-নীতি ভাঙতে দ্বিধাগ্রস্ত তার প্রেমিক বীরেশ। বিপাশার আর্তনাদ, "আপনিই আমায় এগিয়ে নিয়ে এসে আজ মাঝপথে এমন করে একা ফেলে যাবেন না · · · "[৪] বীরেশ জানায় যে সর্বনাশ বাঁচাতে তার এই মত পরিবর্তন এবং 'যুগের দুর্বলতার' জন্য সে ক্ষমাপ্রার্থী। বীরেশের এই উক্তিতে কঠিন হয়ে ওঠে বিপাশা, "কিসের দুর্বলতা!…বামুন-কায়েৎ, এই তো? আমি জাত খোওয়াতে বসেছি, তাই না? কিন্তু জিজ্ঞেস করি, জাত ছাড়া মানুষের আর কিছু নেই?……আমাদের বংশে ন'বছরের মেয়েকে সত্তর বছরের বুড়োর হাতে সঁপে দিয়ে জাত-মানে কুলীনত্ব বজায় রাখা হয়েছিল। · "[৫]

বীরেশ ও বিপাশার প্রেম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'নীলাঙ্গুরীয়'র নায়ক শৈলেন ও নায়িকা মীরার কথা। তবে দুটি উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। 'নীলাঙ্গুরীয়'র লেখক বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। "একটি যুগের জন্মকথা'য় লেখক সেই নির্দিষ্ট পারিবারিক সীমানা অতিক্রম করে জাতিগত ও বৃহত্তর মানব সমাজগত সমস্যার আশ্রয় নিয়েছেন। 'নীলাঙ্গুরীয়'র নায়ক শৈলেন ও নায়িকা মীরা যখন পাঠকের মন ও মস্তিষ্কের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে, সেই সময় বিপাশা ও বীরেশের কাহিনী পাঠকের মনকে কতখানি নাড়া দেবে সে বিষয়ে

অবশ্য সন্দেহ আছে। "একটি যুগের জন্মকথায়" কিছু পংক্তি অবশ্যই দাগ কাটে, যেমন—"ভালবাসার একটা নিবিড় একান্ত প্রদেশ আছে যেখানে সুখেই হোক বা বেদনাতেই হোক, কেউ সঙ্গী ডেকে নিতে চায়না। বিপাশার চিঠির যে চরম আঘাত, তারও কথা ধরণীকে বলেনি বীরেশ।..."[৬] উপন্যাসের একস্থানে লেখকের মন্তব্য—"...প্রণয়ীর বিচারশক্তি একদিকে যেমন মূঢ়, অন্যদিকে তেমনি কুশলী। একজন পাকা ডিটেকটিভের মতোই অসম্ভবের দিকটা কমাতে কমাতে সম্ভাবনাটা প্রায় কেন্দ্রীভূত করে নিয়ে এল বীরেশ।"[৭] আরেকটি উল্লেখযোগ্য উক্তি দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না—"প্রত্যাখ্যান আকর্ষণই বাড়ায়। প্রায় সবক্ষেত্রেই এই নিয়ম তবে ভালবাসার ক্ষেত্রে আরো বেশি করেই। প্রত্যাখ্যান যেখানে আত্মসম্মানে ঘা দেয় সেখানে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে। ভালবাসার অনেককিছুর সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে আত্মসম্মানও খুইয়ে বসে লোকে।"[৮] উক্ত উদ্ধৃতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা এই যে, এ'কথা মেনে নেওয়া কঠিন যে বিভূতিভূষণের ইদানীংকালের রচনা অপাঠ্য। উজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গী, স্বকীয় বিশিষ্টতা এবং রচনাশৈলীতে সমৃদ্ধ 'একটি যুগের জন্মকথা'য় শুধুমাত্র রোমান্টিক ভাবাবেগ নেই। 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসের আরম্ভে বিবাহ সম্বন্ধে লেখক যে তির্যক ও শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত করেছেন, বর্তমান উপন্যাসের আরম্ভে তা এক গভীর সমস্যার রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উপলব্ধি ও অনুভূতিতে এখানে আর এক বলিষ্ঠ বিভূতিভূষণ।

বিপাশার চরিত্রটি সহজেই পাঠককে আকর্ষণ করে। বুদ্ধির দীপ্তি ও মননশীলতায় নায়িকা বিপাশা দৃপ্ত হয়ে উঠেছে। সমাজের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তাঁর মনে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সুর বেজে উঠেছে। কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহতায় শিউরে ওঠে বিপাশা। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

বিভূতিভূষণের নিজস্ব চিন্তাধারা এবং উপন্যাসের চরিত্রগুলির চিন্তাধারায় কোন তফাৎ নেই। নারীর ওপর অত্যাচার এবং বর্তমানে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন—"এ পাপ কবে স্খালন হবে জানি না। তাঁদের উপর কি অত্যাচারই না হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীকে ত' বলিদানই দেওয়া হয়েছে। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিই যেটা চিন্তা করলেও মন বিমূঢ় হয়ে যায়। ভাবুন আঠাত্তর বছরের বৃদ্ধের কাছে একটি ন'দশ বছরের মেয়েকে সমর্পণ করা হয়েছে ন্যায়সংস্কারের কৌলীন্য বজায় রাখবার জন্য। মুখে মুখে বলি, মৈত্রেয়ী, গার্গী, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁদের নিরক্ষর করে রেখেছি। মুক্ত জীবন থেকে বঞ্চিত করেছি। এখন কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু সে পরিবর্তনে যেন কল্যাণ নেই। একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই হচ্ছে যে এটা পরিবর্তনের সময়। যুগান্তর বা transition এর period. এই যুগান্তরের সময় অনেক ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগে আত্মপ্রতিষ্ঠা

করতে গিয়ে নারী অনেক ভুলও করছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্যে আধুনিক যুগ যেন অভিশাপ হয়ে উঠেছে। এটা বাড়তে বাড়তে সে দেশে এমন একটা জায়গায় পৌঁচেছে যে নাক ডাকার কারণে স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে। আমরা যেন এই চরম পথে না চলে যাই।... আমাদের মুনি ঋষিরা যে tradition সৃষ্টি করেছেন, কোর্টে গেলে তা ধ্বংস হয়ে যাবে।...সাম্য আমাদের কাম্য। কিন্তু সাম্যের পরে যেন সর্ব্বনাশের দিকে চলে না যাই।"[৯]

এই সর্বনাশের কথা চিন্তা করেই কি বীরেশ তার মত পরিবর্তন করে? এই tradition-এর কথা স্মরণ রেখেই কি লেখক বিপাশা এবং বীরেশের রেজিষ্ট্রি বিবাহের সম্ভাবনাটুকু নস্যাৎ করে দিয়েছেন? বিপাশার মাধ্যমে লেখক তাঁর অন্তরের কথাটি উপস্থাপন করেছেন প্রতিবাদের মাধ্যমে কিন্তু ঐ বিষয়ে তাঁর শেষ কথা বা Conclusion জানিয়েছেন সামগ্রিক কল্যাণে বিশ্বাসী বীরেশের উক্তির মধ্য দিয়ে—"ইতিহাস যে-পথ ধরে যাচ্ছে'—যুগধর্মেই—আমি তার কথাই বলছিলাম, ইতিহাসের পরিণতির কথা বলিনি। সেটা আমরা দেখতে পাবনা; কেননা সেই শেষ পরিণতি, সেই শেষ অধ্যায় ভালো করে এসে পড়তে এখনও অন্ততঃ একটা শতাব্দী লাগবে। দেখতে পাবন', কিন্তু কল্পনায় তার একটা চিত্র এঁকে নিলে হয়তো ভুল হবে না। আমি জাতপাত-বিড়ম্বিত এই ভারতবর্ষের কথাই বলছি। একটা উজ্জ্বল চিত্র, বিপু! যুগ-যুগব্যাপী অন্ধকারের পর বলে আরও বেশি উজ্জ্বল। বুদ্ধ পারেননি, চৈতন্যদেব পারেননি, অর্থাৎ ধর্ম যাতে ব্যর্থকাম হয়েছে, সেদিন কিন্তু বিনা আয়াসে, মাত্র কালের গতিতে হয়ে গেছে। সেদিনের শিশু যে ঘরেই জন্মাক—ফেলে আসা দিনের—ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল, যে ঘরেই হোক, সে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অ-জাতিশুদ্ধ মানুষের ঘরে জন্মাবে, বিপু। তার অন্য কোন পরিচয় থাকবে না।"[১০]

উপন্যাসের শেষে বীরেশের নববধূ মল্লিকা একটা খাম স্বামীর হাতে দিয়ে বলল—"আজকের ডাকে এসেছে।"

ত্রস্ত হাতে খামটা ছিঁড়ে বীরেশ দেখল তাতে লেখা রয়েছে—"আমার স্বামী উদার মতের মানুষ। একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছি, যা আমাদের জীবনে হোল না। আমাদের সন্তান, যেদিকে যেমন হোক, বিবাহ সূত্রে দুটি পরিবার বেঁধে ফেলবে। ততদিনেও যদি যুগের হাওয়া না বদলায় তো আর কতদিন অপেক্ষা ক'রে থাকব!

সম্মতি দিয়ে একটা চিঠি দেবেন। এই আমাদের শেষ চিঠি।

বিপাশা"[১১]

উপন্যাস হিসেবে "একটি যুগের জন্মকথা"র আধুনিকতা এবং সার্থকতা কতখানি সে বিষয়ে সমালোচকেরা যথেষ্ট আলোচনা করতে পারেন নিঃসন্দেহে, তবে নিঃসংশয়েএকটা কথা স্বীকার করতে হয় যে লেখক বিভূতিভূষণ তাঁর সারা-

জীবনের অভিজ্ঞতার সারতত্ত্বটুকু যেভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। সোশ্যাল কমিটমেন্ট বা সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা উত্থাপন করলে হাস্যরসস্রষ্টা বিভূতিভূষণের পরিধি আরও খানিকটা বিস্তৃতি লাভ করতেই পারে।

"সেই তীর্থে বরদবঙ্গে" বিভূতিভূষণের সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। মৃত্যুর (জুলাই '৮৭) ঠিক একবছর পূর্বে এই উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করেছে॥

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে, আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদবঙ্গে" কবিতার পংক্তি থেকে উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন—"বাংলার কথা বলতে গেলেই তার বর্তমান দীনমূর্তিটি সর্বাগ্রে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যে বাংলা স্বাধীনতার কথা প্রথমে ভাবল, এই মহাযজ্ঞে যার আত্মাহুতি সবচেয়ে বেশি, সে-ই আজ হীন-বল, খণ্ডিত-বিখণ্ডিত, অবহেলিত, হৃতগৌরব, সর্বাংশে বিপর্যস্ত।..."[১২] বিভূতিভূষণের এই মন্তব্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচক, প্রাবন্ধিক এবং কবি মোহিতলাল মজুমদারের কথা। এই দুই লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্র আলাদা হলেও এক বিশেষ জায়গায় তাঁদের মিল ছিল অসামান্য। তৎকালীন বাঙালীর সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং দুর্দশায় তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশবিভাগের সময় বাঙালি জাতি যখন চরম দুর্দশায় কবলিত সেই সময় মোহিতলালের সঙ্গে বিভূতিভূষণের যোগাযোগ হয়। মোহিতলালের তখন ভারতচেতনা বা বিশ্বচেতনা নয়, একমাত্র চেতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্গচেতনা। এ' প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের বক্তব্য বিশেষভাবে স্মর্তব্য—"...তাঁর মতামতের সঙ্গে আমার মনের সমতা আমাকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। সেটা এইখানে সবিস্তারে আলোচনা করবার ঠিক অবসর ও স্থান নয়। এইটুকুই বলতে পারি তৎকালীন বাঙালী জাতির রাজনৈতিক এবং তজ্জনিত সামাজিক অবস্থা আমার মতনই তাঁর গভীর বেদনার বিষয় ছিল। স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালীর দান এবং ভারতের নতুন ঐতিহ্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বাঙালার দান সম্বন্ধে আমাদের কোন মতভেদ ছিল না। অন্যান্য প্রদেশীয়দের অবহেলা, অনেক ক্ষেত্রে বৈরীভাব আমাদের উভয়কেই ক্ষুব্ধ করত। এবিষয়ে আলোচনা উঠলে তাঁর ভাষা এত উগ্র হয়ে উঠত যে নিজের অভিমত মনের মধ্যে চেপে তাঁকে শান্ত করতে হত ...।"[১৩] মানুষের মূল্যবোধ যখন শেষ হতে চলেছে, অন্যদিকে দেশ ও জাতির অবক্ষয় যখন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে, সেই সময় নিঃসঙ্গতার মধ্যে মোহিতলাল, বিভূতিভূষণের মধ্যে এক পরম আত্মীয়কে খুঁজে পেয়েছিলেন।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যক্ষেত্র বাঙলা এবং বাঙালির জীবন হলেও তাঁর

কর্মক্ষেত্র ছিল বহির্বঙ্গ। বহির্বঙ্গের বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিরাট কর্মযজ্ঞে। বিহারের তিরিশ লক্ষ বাঙালির মুখের ভাষা রক্ষার জন্য ব্রত গ্রহণ করলেন। এখানে বিভূতিভূষণের "জীবন তীর্থ" গ্রন্থ হতে কিছু উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিভূতিভূষণ লিখেছেন—"...ইংরাজ আমলের কথা, শেষদিকে বাঙালি চক্ষুশূল হয়ে গিয়ে তাকেই আগে খতম করা যখন ইংরাজ শাসনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।...বাঙ্গালী 'স্বদেশী' আন্দোলনের পর আর একবার 'রাখী বন্ধনের' ব্রত নিল। এবার অবশ্য পরস্পরের মণিবন্ধে নয়, অন্তরে অন্তরে। অদৃষ্টের পরিহাস, যে-পলিটিক্সকে বিদেশীর শাসনের দিনে পরিহার করে গেছি, জীবনের মধ্যাহ্নে, নিজেদের দেশের লোকেদের কাছ থেকে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা আদায় করে নিতে জীবনের সায়াহ্নে সেই পলিটিক্সে নামতে হোল। সুখের বিষয় যে এতবড় বিপদেও আমাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারায়নি, বাঙ্গালীর যা ট্র্যাডিশন, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙ্গালীর যা লক্ষ্য ছিল তা থেকে বিচ্যুত হব না।..."[১৪]

বিভূতিভূষণের সারাজীবনের কার্যকলাপের প্রকৃতি বিচার করলে বোঝা যায় তাঁর ওপর বাঙালীর শিক্ষার আদর্শ ছিল কতখানি গভীর। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বাঙালী জাতি ক্রমশঃই আত্মবিস্মৃত হয়ে চলেছে। ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জাতির মধ্যে বঙ্গ সংস্কৃতি চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে এবং আত্মগরিমা সঞ্চার করতে বিভূতিভূষণ সব্যসাচীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। "সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে" বিভূতিভূষণের বঙ্গচেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, লেখকের সারাজীবনের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার আশ্চর্য ফসল।

উপন্যাসের পটভূমি বাংলা এবং শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাংলার সন্ত্রাসবাদের শেষ প্রহর। প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতায় ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ এবং সন্দেহ চরম আকার ধারণ করেছে। বাংলার দুই প্রান্তে বরিশাল এবং মেদিনীপুরে মাঝে মাঝেই বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠছে। এমন সময় মেদিনীপুর গ্রামের একটি যুবক পুরন্দর ভৌমিক প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পড়তে আসে কিন্তু মেদিনীপুরের নাম শুনতেই কাউন্টারের সহকারী চমকে ওঠেন এবং বলাবাহুল্য তালিকা থেকে পুরন্দরের নামটি বাতিল হয়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত ঐ কলেজের অধ্যাপক বোসের সাহায্যে পুরন্দরের 'এ্যাডমিশন' সম্ভব হয় এবং তাঁর আশ্রয়ে হুগলী জেলার চর্ণাক গ্রামে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয়। কাহিনীর মূল সুর শুধুমাত্র বিপ্লববাদ নয়, একথা স্বয়ং লেখক জানিয়ে দিয়েছেন—"নানা উত্থান-পতন, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সব দেশ-উপদেশের মতোই, বাংলারও এক শাশ্বত রূপ আছে। তার জিনিয়াস অর্থাৎ সহজাত চিন্তাধারা, সেই-ধারা-সম্মত ঐতিহ্য, তার নদী-মাতৃক শান্ত

নৈসর্গিক পরিবেশ—সব মিলিয়ে যে রূপটি ফুটে উঠেছে তাকে এক তীর্থ-রূপ বলে তার কবি অভিনন্দিত করেছেন। আমার মনে হোল এই রূপটিকে পূর্ণ মহিমায় তুলে ধরতে হলে তার শৌর্য-বীর্য-মনীষার সবচেয়ে যা বিস্ময়কর স্ফুরণ সম্প্রতিকালে দেখা গেছে তার কথাটা একটু স্পষ্ট ও বিস্তারিত করে দিতে হয়। বাংলার "অগ্নিযুগ"—সাহিত্যে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' থেকে নিয়ে, সাধনায় উনিশশত-বিয়াল্লিশের "কুইট ইণ্ডিয়া" বা "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন পর্য্যন্ত"...।[১৫]

উপন্যাসে বাংলার পল্লীগ্রাম চর্ণাকের অপূর্ব সৌন্দর্য উপস্থাপিত করেছেন লেখক—"নিবিড় গাছপালা আর ছোটবড় জলাশয়ের মাঝখানে তার যে রূপটি ফোটে তার সঙ্গে তার আধঘোমটা-টানা শ্যামলী বধূর একটি চমৎকার মিল আছে। ছোট নদী হলে, তীরে নুয়ে-পড়া গাছপালা লতাগুল্মের মাঝে আরও স্পষ্ট করে দেয়। পল্লীবধূর সলজ্জ এই সঞ্চালন নদীর মন্থর প্রবাহের অচপল বীচিভঙ্গের সঙ্গে মিলে চিত্রটি পূর্ণ করে তোলে। চর্ণাক এইরকম একটি গ্রাম।" বিষণ্ণ পুরন্দর হঠাৎ তাঁর জীবনে বৈচিত্র্য আবিষ্কার করে। অধ্যাপক বোসের যুবতী কন্যা সুলতার মুক্ত চপলতা পুরন্দরের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সন্ধ্যাবেলায় অধ্যাপক বোস নদীতীরে কন্যাদের এবং পুরন্দরকে নিয়ে নানা ধরণের আলোচনা করেন। অবশ্য আলোচনায় রাজনীতির বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ তাঁর রাজনৈতিক চেতনার অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন অধ্যাপক বোসের মাধ্যমে—"বাংলা হয়তো দৈহিক শক্তিতে ভারতে সবচেয়ে দুর্বল। কিন্তু ওদের চোখ আছে, ওরা দেখছে—গত শতাব্দীর একরকম গোড়া থেকেই এই দুর্বল জাতটাই ভারতের দেশ-নায়ক, ধর্মে, সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কারে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে—কিসে নয়?...এ জাতকে নিষ্ক্রিয়, পঙ্গু করে না দিলে বৃটিশের কল্যাণ নেই।...রাজনীতির ক্ষেত্রে ভেদনীতির মতন এমন সার্থক সাধন কমই আছে। অস্ত্র নয়, শস্ত্র নয়, শুধু একটা কলমের আঁচড়। আধা-আধি হিন্দু-মুসলমানের দেশে এ আবার মস্ত-বড় সুযোগ। রক্তপাত নয়, কিছু নয়, সূক্ষ্ম কলমের খোঁচায় দেশটা দ্বিখণ্ডিত করে দিল। বাঙালী 'স্বদেশী' আর রাখীবন্ধনের এমন একটা বিপুল আন্দোলন জাগিয়ে তুলল, যেমনটি আঠারোশ সাতান্ন-র সশস্ত্র সিপাহী বিদ্রোহের পর আর ভারতে হয়নি। তফাৎ এই যে, নিঃশব্দ কলম চালনার নিরীহ উত্তর ...।"[১৬] বিপ্লবের আবেগ এবং উন্মাদনায় হঠাৎ একদিন জড়িয়ে পড়ে পুরন্দর। অধ্যাপক বোসের প্রথমা কন্যা সন্ধ্যার গয়নার বিনিময়ে পুরন্দরকে মুক্ত করার ঘটনা রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"র নায়িকা বিমলার কথা মনে করিয়ে দেয়। উপরোক্ত ঘটনাকে অতি স্বাভাবিকভাবে অধ্যাপক বোসের মেনে নেওয়ার মাধ্যমে উপন্যাসের যবনিকা টেনেছেন লেখক।

"সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে" উপন্যাস বাংলার সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় রচিত

হলেও কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা নেই, বৈপ্লবিক বিস্ফোরণে রক্তক্ষরণ নেই। একটা সুন্দর, সরল ও স্নিগ্ধ গল্প আছে উপন্যাসটিতে। "ডিটেল্ড ন্যারেটিভ"-এর মাধ্যমে বিস্তার পেয়েছে বাংলার বিপ্লব, ঘটনার মধ্য দিয়ে নয়। ঘটনাবহুল না হলেও বিভূতিভূষণের মননশীলতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা এবং 'গভীর মর্মবেদনা'য় আপ্লুত।

বিহার পটভূমিকার শিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কাকলি সর্বাধিকারী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ ৺মধুসূদন মুখোপাধ্যায় জীবিকা অর্জনের সূত্রে দ্বারভাঙ্গা জেলার পাণ্ডুলে আসেন। বিভূতিভূষণ এই অঞ্চলে মানুষ হয়েছেন। সুতরাং তাঁর রচনায় বিহারের এই অঞ্চলের ব্যাপক সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যদিও তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ ভিন্নতর।

বাঙালী পাঠক ও বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য যে বিভূতিবাবুর পিতামহ মিথিলা অঞ্চলে এসেছিলেন এবং বিভূতিবাবু লেখনী ধারণ করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে মিথিলাকে অমর করেছেন এবং এর ফলে বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। মিথিলার সঙ্গে বাংলার নৈকট্য ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। সুদূর অতীতে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করেছিলেন সেইরূপ মিথিলা ও তার মানুষ বিভূতিবাবুর সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বিহারের পটভূমিকায় রচিত তাঁর সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনীসদৃশ উপন্যাস, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। এই উপন্যাসে বাংলার সঙ্গে মিথিলার তদানীন্তন সমাজের যে অন্তরঙ্গ চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

সুদূর বাংলার বেলে-প্রতাপপুর গ্রামের কন্যা গিরিবালার বিবাহ হয়েছে বিহারের মিথিলা অঞ্চলের পাণ্ডুলের নীলকুঠির সর্বোচ্চ আমলা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বিপিনবিহারীর সাথে এখানে এ কেবল বাঙালীর পুত্রের বিবাহোৎসব নয়, 'বড় মানুষের' বাড়ির উৎসবে পরিণত গিরিবালার কাছে মিথিলা 'মা-জানকীর দেশ'। এখানকার মোহনা চাকর, জীবছ নদী তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। পথে গঙ্গার বিশালতা তাঁকে বিহ্বল করেছে।

বধূবরণ অনুষ্ঠানে বাঙালী প্রথার সঙ্গে এদেশীয় প্রথাও মিশেছে। বাঙালীর শঙ্খ ও হুলুধ্বনির সাথে মিথিলার চিরাচরিত প্রথা গান স্থান করে নিয়েছে। এ নিয়ে বাঙালী ও মৈথিল নারীর মধ্যে অম্ল-মধুর দ্বন্দ্ব হয়েছে। মৈথিল কন্যারা

দলে দলে গান গেয়ে বধূ দেখেছে। এই উপলক্ষে নাটুয়ার নাচও বাদ যায়নি। ভাটরা হরগৌরীর বিবাহ, জনকপুরের রামায়ণী বিবাহের গান গেয়েছে। এই ভাটরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও এরা বিশেষ সুরে দেব-দেবীর বন্দনা ও বিবাহ বিষয়ক গান গেয়ে থাকে।

বৌভাতে দু-তিনটি বাঙালী পরিবার নিয়ে যে অনুষ্ঠান তা উল্লেখযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় লোকেদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান সেটাই প্রধান। একদিন চিঁড়ে, দই, চিনি আর আচার ও অপরদিন পুরি, জিলিপি ও তরকারির আয়োজন। বিস্ময়কর ব্রাহ্মণ ভোজনে লোটন ঝার ভোজন।

মৈথিলীদের বুদ্ধি, রহস্যপ্রিয়তা, হাস্যমুখর স্বভাব সুন্দর ফুটেছে জানকী, লছমী, দুলারমন্, কৌশল্যা, রামপিয়ারী প্রভৃতি কন্যাদের ব্যবহারে। মৈথিল কন্যাদের সহজ, সরল ভঙ্গী আমাদের মুগ্ধ করে। তারা গিরিবালাকে অবিলম্বে মৈথিলী শিখবার অনুরোধ করেছে। এরা বাঙালীর লাউ-কুমড়া ডাঁটার চচ্চড়ি ও তাদের লুচি খাবার অক্ষমতা নিয়ে রসিকতা করেছে। এই কন্যারা তাঁকে বেলে-প্রতাপপুরের গর্ব বিস্মৃত হতে বলেছে। গিরিবালাও এই রসিকতায় যোগ দিয়েছেন ও তাদেরও পাণ্ডুলের গর্ব ছাড়তে বলেছেন।

এই উপন্যাসে বিভূতিবাবু তৎকালীন পাণ্ডুলের একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। মিথিলার মাঝখানে পাণ্ডুল, তার নীলকুঠি, নীলকুঠির কর্মচারীদের বাসস্থান, ব্রাহ্মণপাড়া, গয়লাপাড়া, দুসাদপাড়া প্রভৃতির ও এখানকার প্রকৃতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তখন অবরোধ প্রথা অত্যন্ত কড়া ছিল। বাঙালীর খোপাবাঁধা, ইংরেজী পড়া এদের সমাজে নিন্দনীয় ছিল। মেয়েদের বৈশিষ্ট্য সারা গায়ে উল্কি ও রূপার গহনা, ছোট ছেলেদের কোমরে ঘুনসি ও গলায় 'বদ্ধি' অর্থাৎ শাদা জরি জড়ানো একটা কালো সুতোর মালা। মৈথিলদের সহজ, সরল আচরণের মধ্যে কুঠির মুন্সী পাটনা, গয়া অঞ্চলের কায়স্থ কুলদীপ সহায়ের স্ত্রী-পুত্রবধূর দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ সহজেই চোখে পড়ে।

মধুসূদন বাবুর উপস্থিতিতে তাঁর বাসায় সান্ধ্যকালীন মজলিস বসত। এদেশের কায়স্থদের মত মৈথিলরাও উর্দু-ফার্সিতে পণ্ডিত ছিলেন। সেইজন্য এই সভায় সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে সাহিত্যের আলোচনাও হত।

পাণ্ডুলে নিস্তারিণী দেবীর প্রধানা ঝি খঞ্জনীকে ভোলা যায় না। এ বাড়ির সমস্ত শিশু তার কাছে মানুষ। এদের জন্য সে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে পারে না।

দুলারমনের আখ্যান এই উপন্যাসের একটি প্রধান অংশ। সে বাংলার গল্প, কলকাতার গল্প গিরিবালার কাছে শুনতে চায়। কারণ তার স্বামী কলকাতায় গিয়ে ইংরেজী পড়তে চায়। দ্বিরাগমনের সময় সে যখন নিজের মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে তখন স্থানকাল ও জাতের পার্থক্য মুছে বিবাহিতা

কন্যার পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহ যাবার চিরন্তন রূপটি ফুটে উঠেছে। তার বিদায়-কালীন রূপের মধ্যে গিরিবালা সীতার রূপ কল্পনা করেছেন।

দীর্ঘ সত্তর বৎসর সুখে-দুঃখে পাণ্ডুলে অতিবাহিত করবার পর 'মধু' বাবুর পরিবার দ্বারভাঙ্গা চলে যাচ্ছে। সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত। দুলারমনের ঠাকুমার কাছে নিস্তারিণী দেবী 'দুলহীন'। গিরিবালা এখানকার 'নয়কী দুলহীন'। এতদিনে পাণ্ডুল তাঁদেরও দেশ হয়ে গেছে। দীর্ঘপ্রবাসে তাঁদের ভাষায় ও আচার-আচরণে এ অঞ্চলের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। বন্ধুবৎসল ফণীন্দ্র ঝাকে মনে পড়ে। সে বন্ধুর বিপদে স্ত্রীর রূপার গহনা দিয়ে সাহায্য করতে এসেছে।

এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ে তৎকালীন দ্বারভাঙ্গার বৈশিষ্ট্য, বিরাটত্ব, ঐশ্বর্যের বর্ণনা আমাদের মুগ্ধ করে। ১৯৩৪ সালে বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের বর্ণনাও এই উপন্যাসে বাদ যায়নি।

'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসে মীরার পিতা ব্যারিস্টার রায় একটি কেসের সূত্রে পূর্ণিয়া এসেছেন।

রাঁচীতে এই উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঘটেছে। ভুটানীর মৃত্যুর পর ক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে অপর্ণা দেবী রাঁচি এসেছেন। সঙ্গে এসেছে মীরা, তরু। শৈলেনের কাছে মীরার পত্রে রাঁচি-হাজারিবাগ রোড হয়ে হাজারিবাগ যাবার সুন্দর পথের কথা আছে। মোরাবাদী পাহাড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ও পাহাড়ের শীর্ষদেশে উপাসনাগৃহের বর্ণনা আছে। এই উপন্যাসে রাঁচির উল্লেখযোগ্য স্থান হুড্রু, জোন্‌হা-প্রপাত, রাঁচি-হাজারিবাগ রোড, জগন্নাথপুরের মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

ব্যারিস্টার রায়ের বাগানের মালী ওঁরাও যুবক ইমানুলের বাড়ি রাঁচির নিকট জোন্‌হা-প্রপাতের কাছে।

'উত্তরায়ণ' উপন্যাসটি বিহারের পটভূমিকায় রচিত। ঝাঝা ও শিমূলতলার মাঝামাঝি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এই ট্রেনের যাত্রী সংসারে বীতস্পৃহ ডাক্তার সুকুমার ও সিনেমা-স্টার অরুণা। উভয়ে উভয়ের অপরিচিত। সস্ত্রীক জমিদার বীরেন্দ্র সিং ঐ ট্রেনেই আগত পুত্র-পুত্রবধূকে নিতে এসেছেন। সুকুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঝাঝার বিশ্রামগৃহে। সুকুমার ট্রেন দুর্ঘটনার সংবাদে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছাহত বীরেন্দ্র সিংয়ের পত্নীর চিকিৎসা করেছে। এই দুর্ঘটনায় অরুণা পূর্বস্মৃতিলোপের অভিনয় করেছে। সুকুমার তাকে সরমা বলে জেনেছে এবং তার নিরাপত্তার কথা ভেবে বীরেন্দ্র সিং-এর নিকট তাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্ত বীরেন্দ্র সিং উভয়কে নিজের গ্রামে নিয়ে যান এবং তাঁর শিক্ষাশ্রমের পাশের হাসপাতালে সুকুমারকে ডাক্তার নিযুক্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হন্টম্যানের চরিত্রটি। সে বিপদের মধ্যেও অবিচল। সে তার কর্তব্য করে সব 'ভগবানের মর্জি' জেনে রামায়ণ পাঠে একাগ্রচিত্ত হয়েছে। সুকুমারের মনে হয়েছে এই শ্রেণীর লোক বিনা দ্বিধায় রাজত্ব ছেড়ে বনবাস করতে পারে। এরকম দার্শনিকতা এদেশের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সহজলভ্য।

শিক্ষিত জমিদার বীরেন্দ্র সিং-এর অধীনে সমস্ত লখমিনিয়া শহর ও 'নূর-বেগম' পরগণা। আদর্শবাদী এই জমিদারের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এ অঞ্চলের উন্নতি ও কল্যাণ। তিনি বাংলা সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী। এখানে সরমা বীরেন্দ্র সিং-এর কন্যা হয়েছে ও সিং দম্পতি সরমার বাবা-মা হয়েছেন। স্টেশন থেকে বীরেন্দ্র সিং-এর বাড়ির পথের বর্ণনায় বিহারের পাহাড়ী অঞ্চলের ছবি ফুটে উঠেছে।

স্থানীয় সাঁওতাল সর্দার বৃদ্ধ ঝংড়ু ও তার তরুণী পত্নী রুম্মা এই উপন্যাসে এক প্রধান স্থান গ্রহণ করে আছে। এদের অসুস্থ পুত্র বুধাইকে সুকুমার সুস্থ করেছে। এদের শিশুকন্যা ডুলার চরিত্রও উল্লেখযোগ্য। রুম্মার সৌন্দর্যে সরমা অভিভূত। এদের কৃতজ্ঞতাবোধ, আত্মসম্মানজ্ঞান, সাহস বিভূতিবাবু চিত্রিত করেছেন। বৃদ্ধ ঝংড়ু সাঁওতালদের দলপতি এবং নিজের পদের গুরুত্ব, মর্যাদা ও কর্তব্য সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সচেতন।

বিভূতিবাবু বিহারের খনি-জীবন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি 'নব-সন্ন্যাস' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড অর্থাৎ 'ঝরিয়া বরাকর পর্ব'।

তাঁর বহু ছোটগল্প বিহারের পটভূমিকায় ও বিহারের মানুষকে নিয়ে রচিত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'বিয়ের ফুল' গল্পের পশ্চিমাচকের রামটহলবা, 'পৃথ্বীরাজ' গল্পের রাম ভজু বারোয়ান, 'গঙ্গভূক্ত' গল্পের রামবৃক্ষ দুবে।

'শিক্ষা-সংকট'-এ সুচারুর বিবাহ হয়েছে বিহারের বি-এন-ডব্লিউ-আর'র একটি ছোট স্টেশনের এক বুকিং ক্লার্কের সঙ্গে। এখানে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা নগণ্য। এখানে তার কোয়ার্টারের আশেপাশে এদেশীয় দশাই, নবাবজান, বুধনী, তেতরী, দুখিয়ার মার মত দরিদ্র লোকের বাস। দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে থেকে এ অঞ্চলের অনেক ভদ্রঘরের মহিলার মত বাঙালী মহিলারাও তামাকু সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং বাংলাদেশে গিয়ে এর অভাবে তিন দিনও থাকা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

'রংলাল' গল্পে লেখক মিথিলার একটি কুঠির বড়বাবু হয়ে এসেছেন। এখানে তিনি 'টহলু' অর্থাৎ চাকর হিসেবে পেয়েছেন লোটনাকে। সে কোনও এক সময়ে 'নৈহট্ট' অর্থাৎ নৈহাটিতে ছিল বলে অত্যন্ত গর্বিত ও যে কোন প্রসঙ্গে সে এর উল্লেখ করবার সুযোগ ছাড়ে না।

'কলতলার কাব্য' সুনরা ও লছিয়ার আখ্যানকে কেন্দ্র করে রচিত।

টিটাগড় স্টেশন ও কোম্পানীর চটকলের মধ্যবর্তী একটি কলতলা এর পটভূমি। এখানে জল নিতে আসে পশ্চিমা স্ত্রী-পুরুষ। তারা প্রত্যহ বাংলার দুঃখকষ্ট ও নিজ নিজ মুলুকের সুখৈশ্বর্যের গল্প করে। এদের ভাষা, আচার-আচরণ, দোল উৎসব, পঞ্চায়েতের বিচার-ব্যবস্থা বর্ণনায় লেখকের অনায়াস দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

'বন ও বন্যা' গল্পটি এদেশের পটভূমিকায় রচিত। ব্যক্তিগত ভৃত্য বাসদেওয়ার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। সে বছরে মাত্র চারদিন স্নান করে—নন্দ মহারাজের মেলার দিন, পৌষ-পার্বণের আগের দিন অর্থাৎ তিলসঁকরাৎ, ছট অর্থাৎ কার্তিকমাসের ষষ্ঠীর দিন ও হোলির দিন রঙ খেলবার পর। গ্রাম সম্পর্কেও কেউ মারা গেলে সে মাথা নেড়া করে। এ জাতীয় চরিত্র এদেশে সহজেই চোখে পড়ে। রবিয়া এ দেশীয় বালিকা। তার চরিত্রের মধ্যে এদেশে এই শ্রেণীর বালিকাদের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে।

'কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার' এর গল্পত্রয়ের মধ্যে 'সত্যাগ্রহী' গল্পটির পটভূমি বিহার। ১৯৪৬এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কি রূপ নিয়েছিল, তা এই গল্পে চম্পারণ জেলার পার্শ্ববর্তী সারণ জেলার নারায়ণী নদীর পাশে স্বরূপগড়ের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত।

'কুইট ইণ্ডিয়া' গল্পে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞাতি রাজপুত বরপক্ষীয়ের দ্বন্দ্বে অধিকারসচেতন মিস গ্রেসের মানসিক চিন্তাধারা পরিবর্তনের সরস বর্ণনা আছে। ছাপরার কাছাকাছি কোন এক স্থানে মিস্টার ট্রেভারের কিছু জমিদারি আছে। সদ্য বিলেত থেকে আগত, দেরাদুনের কাছে এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মিস ফ্লোরা গ্রেস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাঁর একমাত্র সহযাত্রী মিলিটারি পোশাক পরিহিত লেখক। ট্রেন সিমরি গ্রামের নিকট থামলে দু দল বরপক্ষ কামরায় উঠেছে। এক পক্ষের প্রধান পাত্রের বাবা বাবু গুলজার সিং, অপর পক্ষের প্রধান পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলবন্ত সিং। তাদের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধং দেহি মনোভাব। দুই দলের বরকর্তার নির্দেশে জুন মাসের অসহ্য গরমে বাজনদাররা এক হাতে হ্যাণ্ডেল বা জানলার ফ্রেম ধরে অপর হাতে বাজনা বাজাতে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে ঢাকঢোলের অভাব এক দলের বরকর্তাকে পীড়িত করেছে। তাঁর মতে, "বাজনায় ঢাক নেই, বিয়েতে তো তাহলে কনে না থাকলেও চলে।" এর পরে দুই দলের বাজনদাররা গাড়ির ছাদে উঠে বাজাতে আরম্ভ করেছে। মিস গ্রেস নিরুপায় হয়ে গন্তব্যস্থলের আগেই অবতরণ করেছেন।

এ গল্পে এদেশে রাজপুত সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিপত্তি, অহমিকা, মর্যাদা-জ্ঞানের যথার্থ ছবি ফুটে উঠেছে।

'বসন্ত' গল্পটি বিহারের পটভূমিকায় রচিত বলে অনুমান করতে পারি।

শীতের শেষে বসন্তের আগমনে প্রকৃতির পরিবর্তন, পাহাড়ী পরিবেশ, ওরাও যুবক-যুবতীর দল বিহারের দক্ষিণাঞ্চলকেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। প্যারিসফেরত ইঞ্জিনিয়ার প্রতুল ও তার স্ত্রী শীলা এখানে চেঞ্জে এসেছে। তাদের সঙ্গে এসেছে ঝি ও তার স্বামী রামলগন। শীলা ও প্রতুল দোল পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উপভোগ করতে বেরিয়েছে। এই অবসরে সম্ভবত বসন্তের উন্মাদনায় ঝি ও তার স্বামী প্রভু ও প্রভুপত্নীর অনুকরণে সাহেব-মেম সেজে প্রভুর ঘরে বসে আছে। অন্ধকারে পাচক ব্রাহ্মণ এবং শীলা ও প্রতুল কেউই তাদের চিনতে পারে নি। কিন্তু তাদের কণ্ঠনিঃসৃত দোলের ছাপরেয়ে বা ভোজ-পুরীদের গান,

> "ওহো, ফাগুনাকে রাতিংযামে পিয়া
>
> কাঁহ্ ম্যা হো—
>
> ফাগুনাকে রাতিয়ামে পিয়ারা—আ-আ-আ…"

শুনে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

'রূপান্তর' গল্পে সহযাত্রী বাঙালী ভদ্রলোককে বৈদ্যনাথগামী মৈথিলী তীর্থযাত্রীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য লেখক তাঁকে 'পাওহারী বাবা'-তে রূপান্তরিত করেছেন। দ্রুত পট পরিবর্তন হয়েছে। আক্রমণোদ্যত যাত্রীরা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে এই 'প্রচ্ছন্ন সাধু'কে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তৎপর হয়েছে। এই গল্পটিতে সাধারণ মৈথিলীদের সহজ, সরল, ধর্মভীরু স্বভাবটি ফুটে উঠেছে।

'ডোমিসাইল্ড্' গল্পে বিহারবাসী বাঙালী পরিবারের দুরবস্থার চিত্র দেখি। চারপুরুষের বাসিন্দা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ললিতমোহনের বিবাহ স্থির হয়েছে কলকাতার ব্যবসায়ী মিহিরবাবুর একমাত্র কন্যা অরুণার সঙ্গে। ডোমিসাইল্ডের এই একটি সর্তের সামান্য বিচ্যুতির ফলে সে ডেপুটির চাকুরী থেকে বঞ্চিত হল। দীর্ঘ প্রবাসে বাঙালী পরিবারের অসুবিধে ও পরিবর্তনগুলি বিভূতিবাবু সকৌতুকে লক্ষ্য করেছেন।

'শহুরে' গল্পটি বিহারের পটভূমিকায় রচিত। বিহারের কোন এক শহরের প্রান্তদেশের কন্যা সোনিয়ার বিবাহ হয়েছে গ্রাম্য কিশোর মিঠুয়ার সাথে। বিবাহের ছয়-সাত বৎসর পর সোনিয়ার স্বামীর সঙ্গে প্রথম পতিগৃহ যাবার আখ্যানকে কেন্দ্র করে এই সমাজের রীতি-রেওয়াজ এই গল্পে বিভূতিবাবু নিখুঁত-ভাবে বর্ণনা করেছেন।

সোনিয়া মিঠুয়ার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় এবং এটা তাদের সমাজে নিন্দনীয় নয়। চঞ্চলা সোনিয়া চরিত্রটি হাস্য-রঙ্গে উজ্জ্বল। শহরে থাকবার জন্য সে গর্বিত। শহরে কোন এক বাঙালীর ঘরে সে ঘুঁটে দিতে গিয়েছিল। বাঙালী কন্যা তার নামকরণ করেছিল সোনামণী। একথা সে ভোলেনি।

অপরদিকে মিঠুয়া লেখকের ভাষায়, "এক কথায় বলা চলে ছোঁড়াটা 'মাথায় বাড়িয়াছে', কিন্তু মাথার ভিতরে বাড়ে নাই।"

মিঠুয়ার পিতা বুধন মন্ডর সোনিয়ার পিতা রৌদি মহতোর কাছে দ্বিরাগমনের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। শহর থেকে আসবার সময় পুত্রবধূর আচরণ তাকে ক্রুদ্ধ করেছে। দ্বিরাগমনের প্রসঙ্গে দুই 'ইজ্জতদার' বেহাইয়ে তুমুল তর্কাতর্কি হয়েছে। অবশেষে নেশার ঝোঁকে উভয়ের দার্শনিকতার উন্মেষ ঘটেছে।

জামাতা কন্যাকে নিতে এসেছে। তার সম্মানে পাড়ার বর্ষীয়সীরা এসে রাত বারটা পর্যন্ত গান গেয়েছে। সোনিয়ার সখীদের রসিকতায় অপদস্থ মিঠুয়া তার হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করেছে এবং রৌদির অনুরোধ অগ্রাহ্য করে পরদিনই স্ত্রীকে নিয়ে গৃহ অভিমুখে যাত্রা করেছে। সোনিয়া কেঁদে তার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে যাত্রা আরম্ভ করেছে।

এর পর চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। সোনিয়া সমস্ত পথ হাসিতে, খুশীতে, গল্প করতে করতে চলেছে, সে পদে পদে মিঠুয়াকে অপদস্থ করেছে। বিভূতিবাবু অত্যন্ত নিপুণতায় কিশোর পাত্রের সঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠা পাত্রীর বিবাহের অসঙ্গতি দেখিয়েছেন।

পুনরায় পতিগৃহের কাছে এসে সোনিয়া স্বামীকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গতি মন্থর করেছে লোক দেখিয়ে।

'বরযাত্রী' ও 'বাসর' গল্পগ্রন্থদ্বয়ের ছয় বন্ধুর অন্যতম কে. গুপ্তর বাড়ি বিহারের ছাপরা জেলায়। সে ছাপরার এক মহকুমার স্কুল থেকে পাশ করে কলকাতার এক কলেজে পড়তে গিয়ে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ, রাজেন, গণশা ও ত্রিলোচনকে। পাঁচ বন্ধু তাকে নিয়ে রসিকতা করেছে। এই রসিকতার অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'বরযাত্রী' গল্পে গণশা কে. গুপ্তকে ছাতুর দেশের লোক বলে তিরস্কার করেছে। 'অবশেষে' গল্পে গণশার ছেলের অন্নপ্রাশনে কে. গুপ্তর দেওয়া জাঙিয়া দেখে গণশার স্ত্রী পুঁটুরাণী বলেছে, "দিব্যি ছাপরেয়ে-ছাপরেয়ে হয়েছে।"

বিভূতিভূষণের বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি' বিহারের মাটি ও মানুষকে নিয়ে রচিত। কুশী বন্দনার সঙ্গে তিনি এর দুই তীরবর্তী যেসব মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন তারই মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

তিনি মুঙ্গের থেকে সাহরসা আসছেন। পথে মান্‌সী নদী। স্টেশন ও নদীর একই নাম। বাদলাঘাট থেকে কুশীর এলাকা আরম্ভ এবং কুশীর এলাকা থেকে মিথিলা আরম্ভ। একে একে বাদলঘাট, ধামারঘাট, কোপারিয়া প্রভৃতি তিনি অতিক্রম করেছেন। পথের চারপাশে কুশীর বিস্তীর্ণ এলাকা।

মান্‌সীতে গাড়ী পরিবর্তন করবার পর সহযাত্রী পেয়েছেন বাঙালীর ম্লেচ্ছত্ববিদ্বেষী, আলাপপ্রিয় মৈথিলী পণ্ডিতজীকে। অশীতিপর এই বৃদ্ধ মান্‌সী

থেকে গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন। তিনি লেখককে কৌশিকী ও কমলার পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়েছেন। বাঙালী নারী সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য, "যতই বলুন, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন আপনারা একটু বেশী রকমই বাঙালীবাবু, একথা আমি বলবই। তবে ধর্মবল, আপনাদের স্ত্রীলোকরা খুব নিষ্ঠাবতী, তাইতেই চলে যাচ্ছে আপনাদের।"

এই ভ্রমণকাহিনীতে বিভূতিবাবু ভাগলপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহারসার সাব-ডিস্ট্রিক্টে পরিণত হবার কাহিনী শুনিয়েছেন ও তৎকালীন সাহারসার বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে চার হাজার বর্গমাইলের কিছু অধিক স্থান নিয়ে কুশী প্রাঙ্গণের বিস্তার।

তিনি সাহারসার বৈশাখ দেখতে এসেছেন। বাংলোর সামনে কুশী প্রাঙ্গণে ঘূর্ণি ঝড়ের প্রচণ্ডতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সাহারসা একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নাম। এর নামেই সাহারসার নামকরণ হয়েছে। এসব অঞ্চলের বাঙালীদের জীবন-যাত্রা দেখে তিনি স্বীকার করেছেন যে ভারতবর্ষের যে কোন দুটি উপজাতির তুলনায় বাঙালী-মৈথিলীতে মিল সর্বাপেক্ষা অধিক।

বিভূতিবাবু বার বার কুশীর রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। বাদলাঘাট অঞ্চল, সাহারসা থেকে মাধেপুরা অঞ্চলে কুশীর রূপ দর্শনের পর তিনি মেহসী বনগাঁও এলাকায় গিয়েছেন। প্রাচীন মিথিলার সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল একদিকে মধুবাণী ও অপরদিকে মাহিস্মতী-বনগ্রাম অর্থাৎ আজকের মেহসী-বনগাঁও। এই প্রসঙ্গে তিনি মেহসীর মণ্ডন মিশ্র-উভয়ভারতী ও মধুবাণীর পক্ষধর মিশ্রের উদাহরণ দিয়েছেন। দিগ্বিজয়ে বার হয়ে শঙ্করাচার্যের বিজয়রথ এই মেহসী ও বনগাঁওতে মণ্ডনমিশ্রের পত্নীর কাছে প্রতিহত হয়েছিল।

বিভূতিবাবু মৈথিলী ভাষার সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করেছেন ও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, "আর শুধু মৈথিলভাষা শোনাও তো সঙ্গীত শোনাই। বাংলার সহোদরা,—ঐরকম নরম, ঐরকম মিষ্টি; শুধু সহোদরাই নয়, সংস্কৃত মায়ের যমজ মেয়ে দুটি; এক মুখ, এক চোখ, এক গড়ন, এক চলন।"

কুশী ও কমলার ভয়ঙ্কর বন্যা দেখে তিনি সেই পৌরাণিক কাহিনী স্মরণ করেছেন যাতে ঋষি এই দুই ভগিনীর শাপের ভার লাঘব করে শত বৎসর পর পর মিলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুই ভগিনী যেন মিলনের আশায় কূল ছাপিয়ে, সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

কুশীর সর্বনাশা বন্যায় বিপর্যস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের বংশের মর্যাদা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু এই বন্যা কারও কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। রিলিফের কাজে নিযুক্ত এ অঞ্চলের প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক যতটা সম্ভব সুযোগ নেন এবং এই বন্যার জন্য প্রতি বৎসর কুশীকে জোড়া পাঁঠা মানত করেন।

এই ভ্রমণকাহিনীতে উল্লেখযোগ্য চরিত্র পাণ্ডুলের পাগ-বিক্রেতা হায়দার মিঞা। ঘটক-চূড়ামণি ঢুন্‌মুন্‌ ঝা পাঁজিয়ারের কাহিনী ভ্রমণ কাহিনীটিকে সরসতর করেছে।

বিভূতিবাবু এই ভ্রমণকাহিনীতে বহু বাঙালী পরিবারের পরিবর্তনের কাহিনী শুনিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বৈজনাথপুর গ্রামের বাগচী মশাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ প্রবাসে এখানে এমন বহু বাঙালী পরিবার আছেন যাঁরা সম্পূর্ণভাবে এদেশীয় হয়েছেন। বাঙালী ভদ্রলোক পরিচয় দেন এইভাবে, "দেবেন্দর নাথ—উর সাথে মুকুর্জিভি আছে।"

একদিকে যেমন এই পরিবারগুলি অপরদিকে তেমন আছে মুর্শিদাবাদের মৈথিলী ব্রাহ্মণ বিনয় ঝা। লেখক স্বীকার করেছেন, "—বাঙলা আমার চেয়ে বেশি করে বিনয় ঝার বাঙলা ; মিথিলা ওর চেয়ে বেশি করে আমার মিথিলা।" এই বিনয় ঝা চাকুরির সন্ধানে দ্বারভাঙ্গায় এসে বাংলা ছেড়ে অধিক দিন থাকতে না পেরে আবার ফিরে গেছে।

এই ভ্রমণকাহিনীর একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র আরদালি লছমী সিং। লেখক এই কল্পনাবিলাসী, গল্পপ্রিয় ব্যক্তিটিকে কুশী প্রাঙ্গণের মেহের আলি নামে অভিহিত করেছেন।

কুশীর বন্যায় অসহায় মানুষের হাহাকারের চিত্র তিনি সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। আবার কুশী প্রাঙ্গণের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাত তাঁর কাছে ঋষি-কন্যা কৌশিকীর অন্তরের বেদনার প্রকাশ বলে মনে হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বিহারকে বিশেষ করে মিথিলাকে আপনার করে নিয়েছিলেন। মিথিলার সমাজ জীবন, মৈথিল চরিত্র, মৈথিল উচ্চারণ, সেখানকার নিম্নবর্ণের মানুষ, তাদের সমগ্র জীবনধারার সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রচনার অকৃত্রিম সারল্যের মধ্যে দিয়ে জটিল জীবনের বৈচিত্র্যময় রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখনীর বাঁকে বাঁকে যেমন নূতন নূতন দিগন্তের সন্ধান মেলে তেমনি অম্লান হাসির শুভ্রতা তাদের অপরূপত্বে মণ্ডিত করে তুলেছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে আছে বিমল বিশুদ্ধ হাস্যের নির্মল জ্যোতি, যা চিরদিন সাহিত্যামোদীদের নির্মল রস পরিবেশন করবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, 'সেই কলমে আছে মিশে ভাদ্রমাসের কাশের হাসি।' বাংলা সাহিত্যে এই রস আজ বিরল।

বাংলা সাহিত্যের আকাশে একসময় দুই বিভূতি জাজ্বল্যমান ছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা অপূরণীয় ঠিকই কিন্তু কবি কালিদাস রায় সেই শূন্যতার দিনে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে পরম আস্থায় বলেছিলেন—

এক বিভূতি চলে গেছে, দাগা দিয়ে আমার প্রাণে।
আর বিভূতি তুমি আছ, চেয়ে আছি তোমার পানে।

তার পর অনেক কাল তিনি বাংলা সাহিত্যের আকাশ উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। বিশেষ করে তিনি বাংলা ভাষার এমন এক সাহিত্যিক ছিলেন যিনি বাংলার প্রতিবেশী রাজ্যকে একান্ত আপনার করে নিয়েছিলেন এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছিলেন। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভাবনা-চিন্তা সবকিছু তিনি এক স্মিত হাস্যের পরিবেষ্টনে পরিবেশন করেছেন। যিনি যথার্থ জীবনরসিক ছিলেন। সে রসের ছটার পরিচয় আমরা কী সাহিত্যে, কী জীবনে সর্বত্র পাই।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—জীবনবার্তা

সুজলা চট্টোপাধ্যায়

মানুষ আয়ুতে দীর্ঘজীবী এবং কর্মে চিরজীবী হতে পারে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন, পেছনে রেখে গেলেন তাঁর কর্মময় জীবন ও অজস্র রচনাসম্ভার। আমাদের দায়িত্ব তাঁর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার, জ্ঞানের ক্ষীণ পরিধিতে তাঁর বিরাট জীবনের অবয়ব আঁকার চেষ্টা।

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে আলোচনার শুরুতে তাঁর মোটামুটি পরিচয় আমাদের জানা দরকার। তবে সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁর হস্তরেখা এবং ঠিকুজী দেখে যে জন্মসময় নির্ধারণ করেছেন মোটামুটিভাবে আমরা সেটাই মেনে নিচ্ছি এবং বিভূতিভূষণও সেটাই সত্য বলে জানিয়েছেন (সাক্ষাৎকার, মজঃফরপুর. ২১.১২.৮৬)। বিভূতিভূষণের জন্ম হয়েছিল উত্তরবিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে বারো মাইল উত্তরপূর্বে পাণ্ডুল গ্রামে ১৮৯৪ সালের ২৪শে অক্টোবর। তাঁর পিতা বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় পাণ্ডুল গ্রামে, মাতা গিরিবালা দেবী, হাওড়া-আমতা লাইনের বেলে-প্রতাপপুর গ্রামের রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে। বিভূতিভূষণের পিতামহ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নীলকুঠির চাকরী সূত্রে পাণ্ডুলে আসেন, বিভূতিভূষণেরা নয় ভাই এবং দুই বোন, অবশ্য এক ভাই (তৃতীয়) অহিভূষণ শৈশবেই মারা যায়। বিভূতিভূষণ মাতাপিতার দ্বিতীয় সন্তান।

বিভূতিভূষণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উত্তরজীবনে তার এই ভবঘুরে বৃত্তি এ যেন শৈশবেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। শৈশবে দুরন্ত বিভূতিভূষণের একবার একটি তম্বুরা নিয়ে নৃত্য যেন উত্তরজীবনে বৈরাগ্যের অর্থাৎ অকৃতদার ও ভ্রমণ নেশার ইঙ্গিতবহ। প্রথম কৈশোরে পাণ্ডুলে খঞ্জনীর সঙ্গ ছাড়া বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই, খঞ্জনী ছিল বাড়ির দাসী, শৈশবে তার কোলে পিঠেই বিভূতিভূষণ মানুষ হয়েছেন, কুরূপা এই খঞ্জনীর প্রতি তাঁর ছিল এক অদ্ভুত আকর্ষণ। তার হাতের মরুয়াব রুটি আর চুনোমাছের ঝাল

কিংবা শাক্ খাওয়ার জন্য লাঞ্ছনা ও শাস্তি পেলেও বেড়ালের আড়াই পায়ের মত ঘটনাটি পুনরাবৃত্ত হত।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে পাণ্ডুল বিশেষ সুবিধার জায়গা ছিল না। তাছাড়া বিশেষতঃ কথাবার্তায়, বাংলা ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ভাষার প্রয়োগাধিক্য সম্ভাবনার জন্য তাঁর পিতা বড় এবং মেজছেলেকে শ্রীরামপুর চাতরায় পাঠিয়ে দেন, তখন বিভূতিভূষণের বয়স ছয়-সাত বছর। চাতরায় যাওয়ার সময় ট্রেনে যেতে যেতে কিশোর বিভূতিভূষণ দেখতে পেলেন বিহারের রুক্ষ প্রকৃতি কিভাবে বাংলায় এসে শস্য শ্যামলা হয়ে গেল। এমনকি বাংলাদেশে সবাই বাংলায় কথা বলছে, এটা যেন একটা বিরাট আশ্চর্য। মনে হয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের জন্ম এখান থেকেই। প্রকৃতির মধ্যে সবুজের সমারোহ তাঁকে অভিভূত করেছিল। চাতরায় একা একা ঘুরে বেড়ান, প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হওয়া উত্তরজীবনের "কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি", "অযাত্রায় জয়যাত্রা", "দুয়ার হতে অদূরে" প্রভৃতি প্রকৃতিবিশিষ্ট ভ্রমণবৃত্তান্তের সূচনা বলা যেতে পারে। তিনি যে ভবিষ্যতে ভবঘুরে হবেন তারও ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণের ছাত্রজীবন চাতরায় মহাদেব মাষ্টারের পাঠশালা থেকে শুরু হয়। চাতরায় অভিভাবিকা ছিলেন ঠাকুমা, পাঠশালা ছিল সকালে এবং বিকেলে। বিকেলের পাঠশালায় প্রায়ই গরহাজির থাকতেন, আর সেই সময় চলত বাউণ্ডুলেপনা। অবশ্য তিনি এই স্বভাবকে তাঁর জীবনে আশীর্বাদ বলেই মনে করতেন। "তাঁকে ভূত বলব না পরী বলব, না আমার গার্জেন-এঞ্জেল বলব তা তো এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি, একটা পাঠশালা পালানো ছেলের যা প্রাপ্য—সাজা, ধিক্কার, উপদেশ হলেও তিক্ত উপদেশ—সব পেয়েছি, তবু উত্তর-জীবনে সামান্য যা কিছু পেয়েছি সে তো ঐ ভূত বা এঞ্জেলের কৃপাতেই।" (জীবনতীর্থ / ২৬ পৃ) নানা কারণে চাতরায় পড়াশোনা স্থায়ী হয় না। তাঁর দাদা শশিভূষণকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য পাণ্ডুল নিয়ে আসার পর বিভূতিভূষণের পাণ্ডুল চলে আসার উদগ্র জিদ্ চাপে এবং বিপিনবিহারী তাঁকেও পাণ্ডুল নিয়ে চলে আসেন। পাণ্ডুলের দ্বিতীয় পর্বেও কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। তবে নীলকুঠির অডিটর অরবিন্দবাবুর সান্ধ্য মজলিসে নবীনচন্দ্রের "রৈবতক" কাব্য পাঠ, তাছাড়া বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির লেখা নিয়ে আলোচনা তিনি শুনতেন যা উত্তরজীবনে হয়ত লেখক হওয়ার আংশিক প্রেরণা যুগিয়েছে। এরপরই বিভূতিভূষণ ও শশিভূষণ দ্বারভাঙ্গার রাজস্কুলের একটি শাখা যার নাম "দি পীতাম্বরী বেঙ্গলী মিডিল স্কুল" সেখানে ভর্তি হন, ১৯০৩ সালের ৩রা জুলাই, বয়স আট থেকে নয়। যদিও তিনি শৈশবে খুবই দুরন্ত ছিলেন কিন্তু ক্লাসে বরাবরই প্রথম স্থানটি দখল করে এসেছেন। দ্বারভাঙ্গার বিদ্যালয়ের শিক্ষা

সুরু হয় অষ্টমমান থেকে এবং সমাপ্তি রাজস্কুল থেকে প্রবেশিকায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত, ১৯১২ সালে বয়স আঠার বছর। এই স্কুলজীবনে দুজনের প্রভাব বিশেষভাবে তাঁর উপর পড়েছিল যার রেশ উত্তরজীবনেও দেখতে পাওয়া যায়, প্রথম হেডমাষ্টার সুধীরবাবু এবং আর একজন তাঁর (জ্ঞাতি) মেজদা গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। সুধীরবাবুর কাছ থেকে শিখেছিলেন প্রকৃত মানুষ কিভাবে হতে হবে, আর গোষ্ঠবিহারী মেজদা, তাঁর কাছ থেকে আংশিক প্রেরণা পেয়েছেন wit ও humour-এর। তাঁর স্কুলজীবনের আর একটি বিশেষ দিক ছিল ফুটবল খেলা। তিনি স্কুলের 'বী' টিম থেকে 'এ' টিমে উঠেছিলেন। এই ফুটবলপ্রীতি তাঁর উত্তরজীবনেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, মোহনবাগান, এরিয়ান্স, ইষ্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি টিমের খেলার ফলাফল শোনার জন্য তিনি সর্বদাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন।

তাঁর এই বাল্যজীবনেই একটা বিরাট সাংসারিক বিপর্যয় এসেছিল, হঠাৎ বাবা ও জেঠার পাণ্ডুলের চাকরীচ্যুত হওয়া, তারপর দ্বারভাঙ্গায় কয়লার ব্যবসায় আংশিক সফল হয়েও পূর্ণ বিপর্যয় প্লেগের মহামারীতে। শেষপর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে দ্বারভাঙ্গারই সবচেয়ে বড় পুকুর "হড়হির" পাশে একটি বাড়িতে অবস্থান। সবকিছু মিলিয়ে এমন অবস্থায় আসতে হয় যাতে দৈনন্দিন আহারেও অনটন দেখা যায়। এমনকি মায়ের গহনা বিক্রী, অবশেষে বাড়ি বন্ধক দেবার মত পরিস্থিতি দেখা দেয়। সেইসঙ্গে মায়ের চরম অসুস্থতা। এই কয়েকটা বছর বিভূতিভূষণের জীবনে মনে হয় একটা বিপন্নতার স্তম্ভিত মুহূর্ত।

১৯১২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে দ্বিতীয়-বার এলেন বাংলার শিবপুরে। শিবপুর তাঁর জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, তাঁর সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস অবশ্য বিহারেই স্কুলজীবনে। যদিও তাঁর প্রথম দুটি গল্প রচনার প্রয়াস সফল হয়নি। কিন্তু কৈশোরে সাহিত্যের যে বীজ বিহারের মাটিতে বপন করেছিলেন, উত্তরজীবনে তা মহীরূহ হয়ে বাংলা সাহিত্যাকাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর কৈশোরে দ্বারভাঙ্গার জমি এমন ছিল না যেখানে তিনি সাহিত্যের ফসল ফলাতে পারতেন। শিবপুর এই জন্যই তাঁর জীবনে অনেকখানি জুড়ে আছে যে, সাহিত্য রচনার অনুকূল পরিবেশে তিনি এসে পড়তে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি বাংলাকে প্রথম পরিচয়ের ফ্রেশনেশ আর মুগ্ধ বিস্ময়ের আলোয় পেয়েছি দুবার চাতরায় আমি বাংলাকে দেখি, শিবপুরে আমি বাংলাকে প্রকৃতই পেলাম" (জীবনতীর্থ / ১২৮ পৃ.)। শুরু হল বাংলায় ছাত্রজীবন। বিহারের ছেলে স্বাভাবিকভাবেই যেন কিছুটা সংকুচিত, রিপন কলেজে আই. এ.তে তিনি নাম লেখালেন, মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মিডিল বেঞ্চারই হয়ে গেলেন। 'জীবনতীর্থ' গ্রন্থে বলেছেন "আমার অবস্থা অনেকটা কে. গুপ্তের মত।" তবে কলকাতায় এসে তাঁর

পরিভ্রমণ বৃত্তিটি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিভূতিভূষণ সাধারণত হাঁটতে ভালবাসতেন, ফেরিঘাট পার হওয়ার পর তিনি কলেজে নানারকম গলিপথ দিয়ে হেঁটে আসতেন এবং হেঁটেই যেতেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের বহু চরিত্র ও ঘটনা এই চলাচলের সাক্ষ্য হয়ে আছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস নীলাঙ্গুরীয়র মীরা, গলিপথের একটি বাড়ির মেয়ে শীলা, তাঁর হাস্যরসের নায়কদের চরিত্র তিনি শিবপুরের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকেই চয়ন করে নিয়েছিলেন। এরকম বহু চরিত্রই তাঁর অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ, 'বিপন্ন' গল্পের মণিহারী দোকানে যুবক ক্রেতাটি যে বাঙ্গালীবাবু এবং বাংলা cultureকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল মনে এই হয় এই চরিত্রটিও তিনি বাস্তব থেকেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। শুধু চরিত্রই নয়, প্রকৃতিও যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত, কলকাতার ইডেনগার্ডেনস তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন "প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া ইডেন"। অপ্রয়োজনীয় সময়টুকু প্রয়োজনে লাগাতেন ইডেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসুধা পান করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রথম স্বীকৃতি কলকাতায়, সেখানে ছোট ছোট সাহিত্য গোষ্ঠীতে নানারকম সভা হত, সেইসব সভাতে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য পিতার কর্মস্থল উত্তর বিহারে মহম্মদপুরে এসে থাকতেন। ১৯১৪ সালে রিপন কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। এরপর তিনি আবার বিহারে পাটনায় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন বি. এন. কলেজে। এই সময় তাঁর প্রথম গল্প "অবিচার" প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয়। পাটনার বিখ্যাত উকিল শরদিন্দু গুপ্তের বাড়িতে (বাড়িটির নাম স্বর্ণাসন) গৃহশিক্ষকতা করতেন এবং ওই বাড়িতেই থাকতেন, ১৯১৬ সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন।

এরপর থেকে শুরু হয় তার কর্মজীবন। কর্মজীবনের পঁচিশটা বছর তাঁর জীবনে নানারকম উত্থান পতন হয়েছে—এর মধ্যে তিনি একবার প্রায় এক বছরের জন্য অন্তর্ধানও হয়েছিলেন। বি.এ. পাশ করার পর বেশ কয়েক-মাস তিনি কোথাও চাকরী পাননি। ১৯১৭ সালে দ্বারভাঙ্গায় মাড়োয়ারী স্কুলে সহকারী শিক্ষকরূপে জীবনের প্রথম চাকরী পান। প্রায় এক বছর স্কুলে শিক্ষকতা করার পর সেই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি থেকে এক বছর অন্তর্ধান হন। তারপর ১৯২০ সালে অস্থায়ী শিক্ষকরূপে মজঃফরপুরে "মুখার্জীস সেমিনারী"তে শিক্ষকতা করেন, প্রায় আট-নয় মাস। এরপরই তাঁর বছর তিনেকের শিক্ষকতা দ্বারভাঙ্গার রাজ স্কুলে, এই সময়টি হল ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত। কোন জায়গাতেই তিনি দীর্ঘ মেয়াদে স্থির থাকতে পারেননি, ১৯২৪-২৫ তিনি দ্বারভাঙ্গা মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপরে তিনি চলে যান রঘুনন্দন সিংয়ের ছেলের গৃহশিক্ষক হয়ে প্রায় বছর তিনেকের জন্য ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত। তারপর আবার তিনি ফিরে

আসেন মজঃফরপুরে বি. বি. কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক হয়ে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি মজঃফরপুরেই ছিলেন, এরপর তিনি পাণ্ডুল স্কুলে শিক্ষকতা করেন, ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৪-এর প্রারম্ভ পর্যন্ত। বিহারের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর তিনি পাণ্ডুল ছেড়ে চলে আসেন দ্বারভাঙ্গা রাজের গৃহশিক্ষকতা করতে। এখানে তিনি রাজার ভাগ্নে কনৈহাজীর গৃহশিক্ষক হয়ে ছিলেন আড়াই বছর থেকে তিন বছর অর্থাৎ ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত। ১৯৩৭-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৩৯-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গায় রাজপ্রেসের ম্যানেজারী করেন। ১৯৩৯-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গার রাজস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। তাঁর সর্বশেষ চাকরী পাটনায় 'ইণ্ডিয়ান নেশন' সংবাদপত্রের ম্যানেজারী। ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের পরই তাঁর কর্মজীবনের বিরতি। এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের চাকরী জীবনের সময় নির্ণয় করা হয়েছে তাঁর জীবন তীর্থ গ্রন্থ এবং একটি সাক্ষাৎকারের (২১শে ডিসেম্বর ১৯৮৬, মজঃফরপুর) ভিত্তিতে। তাঁর চাকরী জীবনে একটা জিনিস দেখা যায় তিনি মোট এগারবার চাকরী ছেড়েছেন কিন্তু বিহারের বাইরে কোনদিনই তিনি কোন চাকরী করেননি।

মহারাজের সেক্রেটারীর পদ থেকে পদত্যাগ ১৯২৬ সাল, ১৯৩৪ সালে পাণ্ডুল স্কুলের চাকরী ত্যাগ এবং ১৯৪২-এ চাকরী জীবন থেকে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ। এই তিনটি সাল-এর উল্লেখ আমরা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রামাণ্য জীবনীতে পাই। এছাড়া এই নিবন্ধে তাঁর বিভিন্ন চাকরীতে প্রবেশ এবং প্রস্থানের যে সাল-তারিখগুলি দেওয়া হল তা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অন্য কোন জীবনী আলোচনায় গ্রথিত হয়নি।

চল্লিশের দশক বিভূতিভূষণের জীবনে শোকের দশক বলা যেতে পারে। তিনি চাকরী ছেড়েছেন ১৯৪২ সালে, তাঁকে ছেড়েছেন তাঁর মা, বাবা এবং প্রিয় দাদা শশিভূষণ। ১৯৪২-এর ২১শে অক্টোবর মাতৃবিয়োগ, এই শোকাকুল অবস্থার জের যেতে না যেতে পিতা মারা গেলেন ১৯৪৪ সালের ১৫ই জুলাই, তারপরই তাঁর দাদা শশিভূষণ মারা গেলেন ১৯৪৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী।

বিভূতিভূষণ মোটামুটি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কর্মজীবন থেকে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খৃ. "রাণুর প্রথমভাগ"। তিনি চিরদিনই ছিলেন সহজ সরল, ছল কপট তিনি বুঝতেন না, বুঝতে চাইতেন না, সেইজন্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে খল বিরল, সজনীবাবুকে দুশো টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশটি গল্পবিক্রীর হঠকারিতায় বিভূতিভূষণের মনে আক্ষেপ হলেও, সজনীবাবু সম্বন্ধে কোনরকম কটূক্তি তিনি করেননি। এইখানেই তাঁর চরিত্রের মহত্বটুকু বোঝা যায়। সামাজিক বিভিন্ন কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন ঠিকই কিন্তু রাজনীতিতে কোনদিন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি।

পুরস্কার, মানপত্র, সম্বর্ধনা জীবনে তিনি বহুবার পেয়েছেন। ১৯১৫ সালে প্রবাসী পত্রিকাগোষ্ঠীর তরফ থেকে জীবনের প্রথম পুরস্কার পান 'অবিচার' গল্পটির জন্য। ১৯৫৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সুরেশচন্দ্র স্মৃতিপুরস্কার (আনন্দ) পান। ওই বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শরৎচন্দ্র স্মৃতি স্বর্ণপদক প্রদান করে। ১৯৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে শরৎস্মৃতি বক্তৃতা দেন, বিষয় "সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার"। এই বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুণিজন সম্বর্ধনা সভায় বিভূতিভূষণ সম্বর্ধিত হন। ১৯৬৯-এ বিহার বাংলা সমিতির ভাগলপুর অধিবেশনে তিনি সম্বর্ধিত হন। ১৯৭২ সালে "এবার প্রিয়ংবদা" উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। ঐ উপলক্ষে ঐ বছর বিহারের বারোটি সাংস্কৃতিক সংস্থা তাঁকে মিলিত-ভাবে সম্বর্ধনা জানায়। ১৯৭৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক দিয়ে সম্মানিত করেন, ১৯৭৪-৭৫ সালের "ডি এল রায় রীডারশিপ বক্তৃতা" দেওয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানায়—বিষয় "বঙ্গ সংস্কৃতির ত্রিধারা"। ১৯৭৪ সালে বিহার-বাঙ্গালী সমিতির মজঃফরপুর বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জানান হয়। ১৯৭৮ সালে শরৎসমিতি তাঁকে শরৎ পুরস্কারে ভূষিত করেন। ১৯৭৮ সালেই বারাণসীতে অনুষ্ঠিত "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের" সুবর্ণজয়ন্তী পদক পান। ১৯৮২তে হাওড়া বিবেকানন্দ আশ্রম তাঁকে তারাচরণ বসু স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৮৪ সালে পাটনায় বেঙ্গলী একাডেমী ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জানায়। ১৯৮৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করেন। ১০ই জানুয়ারী ১৯৮৭ সালে বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়া বিহারের সাহিত্যিক বিভূতিভূষণকে বিহার সরকার তাঁর সাহিত্য সাধনার জন্য ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মাসিক তিনশো টাকার একটি দক্ষিণা আমৃত্যু দিয়ে-ছিলেন।

নিরলস কর্মী বিভূতিভূষণ আজীবন বাংলা সাহিত্য প্রসারে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। বিশেষতঃ বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রচেষ্টা সারাজীবন চালিয়ে গেছেন। বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের প্রতীক চিহ্নটি তাঁরই নির্ধারিত—মৈত্রীতে নিবদ্ধ দুটি হাত করমর্দনের ভঙ্গিতে। যার তাৎপর্য তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন "সংহতি ও সমন্বয়"। বিভূতিভূষণের স্বপ্ন ভারত হবে অখণ্ড, জাতিতে জাতিতে থাকবে না কোন ভেদাভেদ। দ্বারভাঙ্গায় বাঙ্গালী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, পত্রিকাটির নাম দিয়েছিলেন "অপ্রবাসী" অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন প্রান্তেই যে কোন রাজ্যের লোক থাক না কেন সমগ্র ভারতই যখন একটা দেশ তখন

প্রবাসী কেউই নন। বৃদ্ধ অবস্থায় শারীরিক কারণে পর্যটন আর বিশেষ সম্ভব না হলেও সাধ্যমত তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। মৃত্যুর দশদিন পূর্বে তিনি পাটনা যাত্রা করেন এবং সেখান থেকে ২৩শে জুলাই কলকাতায় পৌঁছে ২৪শে জুলাই রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য আর সম্ভব হয়ে উঠল না। বিহার বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে (ভারতে রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী সর্বপ্রথম বিহারেই ১৯৮৩ সালে স্থাপিত হয়) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ই আমৃত্যু থেকে গেলেন তার অবৈতনিক চেয়ারম্যান।

এই মানুষটির মধ্যে আর একটি চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়—কখনও কোনরকম কমপ্লেক্স তাঁর মধ্যে ছিল না। লোকের সঙ্গে মেলামেশায় ধনী-দরিদ্র বা জাতিগত কোন বিচার করেননি। ফলতা-কালীঘাট লাইনের মাঝেরহাট স্টেশনে গ্রাম্যচাষী বদনের সঙ্গে বসে অম্লানবদনে মুড়ি খেতে খেতে গল্প করতে যেমন অসুবিধা হয়নি তেমনি আবার মহারাজা, ধনী ও গুণীজনের পংক্তিতে বসে অবাধ মেলামেশায় কুণ্ঠাবোধ করেননি, কারণ যতবারই চাকরী ছেড়েছেন প্রত্যেকবারই অন্যায়ের প্রতিবাদে। এদিকে আবার কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যের অবহেলা করেননি কখন।

যদিও স্বল্পপরিসর জায়গায় বিভূতিভূষণের জীবনকাহিনী আলোচনা করা সম্ভব নয় তবুও চেষ্টা করছি তাঁর কিছু বিশেষ দিক তুলে ধরার। প্রথমেই বিভূতিভূষণের কর্মজীবন, শুধু কর্মজীবনই কেন শৈশব থেকে কর্মজীবনের শেষ দিনটির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে স্পষ্টতই ভেসে ওঠে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন সংগ্রামের ছবি। যদিও পূর্ণ লেখকজীবন কর্মজীবনের পর থেকেই শুরু হয় তবুও স্বর্গাদপি গরীয়সীর ব্যক্তিজীবন ছেড়ে দিলে তাঁর গল্প বা উপন্যাসে জীবন সংগ্রামের সেরকম কোন ছবি দেখতে পাওয়া যায় না যা তাঁর দৈনন্দিন জীবন ছিল। লেখক বিভূতিভূষণ ও ব্যক্তি বিভূতিভূষণ-এর মধ্যে আরও কয়েক-জায়গায় গরমিল চোখে পড়ে। ধরা যাক তিনি হাস্যরসের স্রষ্টা হিসেবেই বিশেষ পরিচিতিলাভ করেছেন কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ বাক্যালাপে কিছুতেই বোঝা যায় না তিনি অত বড় হাস্যরসস্রষ্টা। তাঁর কর্মজীবন মানেই শিক্ষক জীবন, শিক্ষকতাকেই তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আলাপে এটুকু অন্ততঃ বোঝা গিয়েছে ব্যক্তিজীবনে তিনি রসিক ছিলেন না, হতে পারে পেশার জন্য এটা। তবে যাঁরা তাঁকে চাক্ষুষ দেখেন নি বা তাঁর সঙ্গে আলাপ করেননি তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, গনশা, ঘোৎনা, ত্রিলোচন, রাজেন, গোরাচাঁদ, কে. গুপ্ত প্রভৃতির চরিত্র স্রষ্টা দৈনন্দিন জীবনে একজন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বিভূতিভূষণের হাস্যরসসৃষ্টির একটি

বিশেষ দিক হল তিনি কাউকে খোঁচা মেরে হাস্যরসের সৃষ্টি করেননি। তাঁর রচনা পড়তে পড়তে এক অনাবিল হাসি যেন এসে পড়তে বাধ্য। বর্তমানযুগের এই প্রাচীন লেখক নির্মল শুভ্র হাস্যরস পরিবেশনে যথার্থই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণকে বলা হয় এযুগের পরিবার রস স্রষ্টার শেষ নায়ক। তবে মনে হয় যৌথপরিবার নিয়ে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে ব্যক্তি বিভূতিভূষণ উঁকি মারছেন। যদিও তাঁর জীবন ছিল ভ্রাম্যমাণ। ঘুরে বেড়াতেই তিনি ভালবাসতেন, স্থায়ী বসবাস ছিল যৌথ পরিবারের মধ্যে তাই যৌথ পরিবারের খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুই তিনি লেখকের দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং রচনাতেও অবিকল তা পরিবেশন করেছেন। যৌথ পরিবারের তাঁর শিশু-চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল করে আছে। রাণু তাঁর রচনার অনবদ্য সৃষ্টি। রাণুর সংলাপগুলি বাঙালী ঘরে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বই ছেঁড়ার কথায় ভাইকে শাসন করতে বললে, রাণু বলে, "কি করে শাসন করব বল মেজকা? আমার কি নিশ্বেস ফেলবার সময় আছে খালি কাজ—কাজ—আর কাজ" (রাণুর প্রথম ভাগ / ব. ভ. ম. রচনা ১ম খণ্ড / ২২৭ পৃ.)। তাঁর পরিবার রসের গল্প-উপন্যাসগুলি পড়লে দেখা যায় পরিবারের মধ্যে খুঁটিনাটি সব বিষয়ই তিনি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ব্যক্তি বিভূতিভূষণ নিজের জীবনে ছিলেন অকৃতদার কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি নিজে জীবনে অনেকবার ভালবেসেছি, এক এক করে গুণে দেওয়া শক্ত হবে, চিঠিও যাবে অনর্থক বেড়ে; ···নিজে কৈশোর থেকে নিয়ে যৌবন পর্যন্ত এত ভালোবেসেছি, ভালোবাসার পরিভাষায় এত জনকে "মনে-প্রাণে" চেয়েছি যে যদি ক্ষমতা থাকত তো মোগল হারেমের মতো অত না হোক, অন্তত জন কুড়ি-পঁচিশ ভালোবাসার পাত্রীর জীবন দুঃসহ ক'রে তুলতাম। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য, জানি না অপরের ক্ষেত্রেও কিনা। আর, আশ্চর্য, যখনই যাকে ভালোবেসেছি, তার জীবনের কথা খতিয়ে দেখিনি বড় একটা, শুধু মনে হয়েছে, না পেলে আমার জীবনটা 'মরুভূমি হয়ে যাবে'—···শুধু এইটুকু রক্ষা যে, একসঙ্গে নয়। একজনকে না পাওয়ার পর আর একজনকে ঘিরে। সময়ের অন্তরাল কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘ" (আমার সাহিত্য জীবন / ব. ভ. ম. রচ-১ম খণ্ড)। নিজের জীবনে নারী সম্বন্ধে তিনি যাই বলুন না কেন তাঁর রচনায় আমরা ঠিক তার বিপরীত রূপটি দেখতে পাই। বেশীর ভাগ রচনাতেই তিনি নারীকে মাতৃরূপেই দেখেছেন। নারী স্নেহময়ী করুণার আধার এই ছায়াই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্র যেমন—সৌদামিনী (নীলাঙ্গুরীয়), চম্পা (নব-সন্ন্যাস), হেনা (দুইকন্যা),

ডোরা (তোমরাই ভরসা) ইত্যাদি চরিত্রগুলি মাতৃরূপা নয় বটে, তবে মনে হয় এই বিপরীতের পটভূমিকায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মূল বক্তব্যটি যেন আরও স্পষ্ট হয়েছে। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নারী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "আমার সাহিত্য সাধনার মূল প্রেরণা নারী সৌন্দর্য, নারী মাধুর্য, নারী বিস্ময়" (জীবনতীর্থ / ৮৫ পৃ.)।

বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রকৃতই প্রেমিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি গ্রন্থে আমরা তাঁর প্রকৃতি প্রেমকে অনুভব করতে পারি। সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় বেশীর ভাগ লেখক প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপটি নানা ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলেন কিন্তু বিভূতিভূষণ প্রকৃতির রুদ্র রূপটিকেও স্নিগ্ধ দৃষ্টির তুলি বুলিয়ে মনোরম করে তুলেছেন। সাহারসায় কুশীর তীরবর্তী জনপ্রাণীহীন মরু অঞ্চলে ভ্রমণকালে প্রচণ্ড সূর্যের দাবদাহকেও স্বাগত জানিয়েছেন। প্রকৃতির রুদ্র রুক্ষ রূপকে নৃত্যরত ক্ষ্যাপাশিবের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কোথাও ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত কুশীনদীকে শিবের বিরহে তপস্বিনী ক্ষীণতনু উমার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এছাড়াও বহুজায়গায় দেবদেবীর সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের তুলনা করার একটা প্রবণতা বিভূতিভূষণের মধ্যে দেখা যায়।

বিভূতিভূষণ তিরানব্বই বছর বয়সে যেরকম স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারতেন তা সত্যি আশ্চর্যের বিষয়। জীবনীশক্তিতে ভরপুর এই মানুষটি আকস্মিক একটি আঘাতজনিত শারীরিক অসুস্থতার জন্য ২৩শে জুলাই কলকাতা যাওয়া স্থগিত রেখে ২৮শে জুলাই পাটনা থেকে স্বেচ্ছায়, একরকম জোর করে দ্বারভাঙ্গা ফিরে আসেন মোটরে। ৩০শে জুলাই ১৯৮৭ বেলা ১টা ১০ মিনিটে সজ্ঞানে তাঁর জীবনাবসান হয়।